মজলিসী মুজতবা

১৩৯৫

প্রকাশক · কোরক
পোঃ দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, কলকাতা-৫৯
ফোন · ৫৭৬-১৮৮৯

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ :
ঘোষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৯এইচ/এইচ/১২, গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৬
ফোন : ৩৫৪- ৪১১৬

প্রচ্ছদ : সঞ্জয়গোপাল সরকার

সম্পাদকীয়

'মজলিসী মুজতবা' 'কোরক' প্রকাশনের দ্বিতীয় সম্পাদিত গ্রন্থ। 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা' বছর সাতেক আগে সৈয়দ মুজতবা আলী সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। মুজতবা আলীর সাহিত্যকীর্তি ও জীবন সম্পর্কিত সমস্ত দিক নিয়ে আলোকিত সংখ্যাটি পাঠক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠকদের ক্রমাগত তাগিদেই সেই সংখ্যাটিকে কিছু গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এই গ্রন্থে নতুন রূপ দেওয়া হল।

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী এমন একটি সরস-মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য-ধারার প্রবর্তন করেন—যা সম্পূর্ণভাবে মৌলিকতায় ভাস্বর। ভাষাতত্ত্বে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন—রচনার ভঙ্গি যেমন বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ, স্বতন্ত্র মেজাজে মাতিয়ে রাখে—তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচারে এই উপমহাদেশের স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের তিনি ছিলেন অন্যতম। ছিলেন রবীন্দ্র-সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুরাগী।

ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্ত মনের এই বনেদী মানুষটি জীবনযাপনে বরাবরই ছিলেন অগোছালো। মর্জিমাফিক চলনে অভ্যস্ত। সংজ্ঞানির্মিত পথে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি। ফলে তা বিশ্লেষণে আমাদের অসুবিধায় ফেলে দেয়। সে কারণেই হয়তো তাঁর সাহিত্য আলোচনা আজও সেইভাবে করা হয় না।

এই সংকলনটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে মুজতবা আলীর রচনা বৈশিষ্ট্যের নানাদিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে স্মৃতিচারণ। তাঁর অন্তরঙ্গজনেরা লিখেছেন তাঁকে দেখা-চেনার গৌরবময় অভিজ্ঞতা। তৃতীয় পর্বে রয়েছে মুজতবা আলীর জীবনী ও গ্রন্থতালিকা।

এই গুণী লেখকটিকে আজকের বাঙালী পাঠক, গবেষকরা যেন প্রায় ভুলতে বসেছেন। অথচ এত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হবার জন্য তিনি আসেন নি। মনে হয় এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক একজন প্রকৃত পণ্ডিত, মুক্ত মনের সজ্জন স্রষ্টার যথাযথ পরিচয় পাবেন।

এই প্রয়াসে অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেল। তবু আজকের পাঠক যদি মুজতবা আলীর রচনার প্রতি আগ্রহী হন, তাঁকে যদি আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে বা বুঝতে শেখেন তবেই যেন এই সংকলনের প্রকৃত সার্থকতা মিলবে।

সূচী

।। প্রথম পর্ব।।

।। দ্বিতীয় পর্ব।।

।। তৃতীয় পর্ব ।।

প্রথম পর্ব

দেশে-বিদেশে

ডাক্তার সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' বইখানির প্রকাশনকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমি একটি লক্ষণীয় ঘটনা বলে মনে করি। এই বই সপ্তাহে সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় এক এক অধ্যায় করে যখন প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আমি অধীব আগ্রহে যখনই 'দেশ' বেরিয়েছে এই বই পড়ে আসছিলুম। সম্পূর্ণ বইখানি এখন বেরিয়ে যাওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত। কারণ এই বই বাংলা ভাষায় দেশভ্রমর্ণকে অবলম্বন করে রচিত আর গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যতম রসসৃষ্টি রূপে চিরকাল বিবাজ করবে। প্রথম পড়বাব সময় লেখকের রসবোধ, গভীর জ্ঞান, আর সমীক্ষা, মাতৃভাষার প্রতি দরদ, আর সহজ সাবলীল রসপূর্ণ ভঙ্গিতে তাঁর নিজের চোখে দেখা জিনিস আমাদেব চোখের সামনে ফুটিযে তোলবার শক্তি, এই সমস্ত, আর এ ছাড়া আবও অন্যান্য অনেক গুণ, আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ কবেছিল। মনে প্রাণে তাঁর প্রশস্তি কবেছি, পাঁচজনকে ডেকে তাঁব এই লেখার তাবিফ কবেছি আর পড়ে শুনিযেছি। আর তাঁর সঙ্গে স্বল্প পবিচযের সুযোগ নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পত্রযোগে পাঠক-হিসাবে আমাব সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার মতন আরও অনেক পাঠক তাঁর এই বই পড়ে প্রশংসায পঞ্চমুখ হয়েছেন দেখে আমি বিশেষ খুশী হয়েছি।

বিভিন্ন ধর্ম (অর্থাৎ শেয কথায, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস) পোষণ করায় মানুষ যে তার সমজাতি আর সমভাষী, ভাষায় আর রক্তে যার সঙ্গে সে এক, তার কাছ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যায়—এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ফলে যখন ভারতে Two Nation Theory, অর্থাৎ ভারতের হিন্দু আর মুসলমান হচ্ছে দুইটি পৃথক জাতি এই ধারণা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রবল দল দেখা দিলে, আর যখন দেশব্যাপী রক্তারক্তি, খুনোখুনি,

নরহত্যা, জাতিহত্যা, দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের বহিষ্করণ প্রভৃতি অনর্থ ও অনাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, তখন, আর কতকগুলি উদার মনোভাবের মুসলমান সজ্জনের সঙ্গে একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষায় এই অপূর্ব বইখানি লিখে, নীরবে উপর্য্যুক্ত দলের মতবাদের আর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ জানালেন, আর প্রমাণ করে দিলেন যে, ধর্ম আলাদা হলেও বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান একই মানসিক সংস্কৃতির মানুষ, একই জাতির মানুষ। বৃহত্তর ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বাঙালী জাতির মধ্যে যে ধর্ম এসে অনপনেয় পার্থক্য ঘটাতে পারে না, ভারত আর পাকিস্তান, রাজনীতির দিক থেকে পৃথক হলেও ভাব ও চিন্তায় দুটি রাজ্য বা রাষ্ট্র নয় আর দুটি রাষ্ট্র হওয়াও যে কঠিন, একথা তাঁর বইয়ের মারফৎ ডাক্তার মুজতবা আলী দেখিযে দিলেন।

ডাক্তার মুজতবা আলী দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ পণ্ডিত, আর তা ছাড়া তিনি ইংরেজি, ফরাসী আর জারমান এই ক'টা ইউরোপীয় ভাষারও পণ্ডিত। ফারসীর কাজ চালানো জ্ঞান তাঁর ছিল, মিশরে অল্-কাহিরা বা কাইরোর আল্-আজ-হার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাঠ করার দরুন তিনি প্রাচীন সাহিত্যিক আরবী আর আধুনিক আরবী এই দুইয়ের সঙ্গেও পরিচিত। এখনকার পাকিস্তানের অধীন শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর বাড়ি, নবী মোহম্মদের বংশের মুসলমান ধর্মগুরু সৈয়দ ঘরের ছেলে তিনি; কিন্তু কৈশোর ও প্রথম যৌবনে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চরণতলে তাঁর মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, সত্যকার হাস্য-রসোজ্জ্বল, লঘুশৈলীর অথচ ভাবগম্ভীর চল্‌তি বাংলা ভাষায় তিনি যে অসাধারণ দখল তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন, সেটি তাঁর মনের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রসাদ উভয়ের গঙ্গাযমুনা-মিলনের ফল।

বইখানি পড়তে আরম্ভ করলে, বাংলা ভাষার সত্যকার প্রেমী লেখকের এই ভাষার প্রয়োগ দেখে কেউ সাধুবাদ না করে পারবেন না। বাংলা চলতি ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য তার বাচনক্ষমতা আর ভাবপ্রাচুর্য, আবার তার অজস্রতা আর বৈচিত্র্য—এককথায়, চল্‌তি বাংলা যে কত জোরদার ভাষা, তা ইনি নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বা ঢঙে নোতুন ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। এই রকম ভাষা

পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চ'ল্‌তে পারে, তাতে আর সন্দেহ নেই। অন্তর্নিহিত শক্তিকে টেনে বার করাতেই মুন্‌শিয়ানা—ডাক্তার মুজতবা আলী সে মুন্‌শিয়ানার অধিকারী। সহজাত কবচের মত সুন্দর শক্তিশালী ভাষার বর্ম তার লেখার ভাবদেহকে ঘাতসহ ক'রে রেখেছে।

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লাহ্‌ নিজের দেশে রাতারাতি miracle বা কেরামৎ জাহির করবার দুরাশা করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন আফগানিস্থানের ঈরানী আর পষ্‌তানা বা পখ্‌তানা অর্থাৎ পাঠান জাতির মানুষকে মধ্যযুগের ইস্লামী আবহাওয়া থেকে এক হেঁচকা টানে দুদিনে অতি-আধুনিক ক'রে তুলবেন, এমন কি বোরখা ঢাকা বিবিসাহেবাদের কয়েকমাসের মধ্যে আলোকপ্রাপ্তা ক'রে parisienne-এ পরিণত ক'রবেন। শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি পশ্চিমের দুনিয়ার নোতুন হাওয়া পূর্বের পুরাতন দেশে বহাতে চেয়েছিলেন। নানা দেশ থেকে বিভিন্ন বিদ্যার পণ্ডিত এনে পাঠান ছেলেঁমেয়েদের মানসিক উন্নতি তিনি করতে চেষ্টিত হন—কাবুলের কলেজে বা ইস্কুলে ফরাসী রুশ জরমান আর ভারতীয় শিক্ষকের মেলা ব'সে গিয়েছিল। এই আফগান-জাগৃতির শুভ দিনে জ্ঞান-যজ্ঞে অন্যতম পুরোহিত হবার জন্য ডাক প'ড়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে এই মুসলমান বঙ্গ-সন্তান ডাক্তার সৈয়দ মুজতবা আলীরও—মুখ্যত বিদেশীয় নানা ভাষা আর তাদের সাহিত্য পাঠান আর ঈরানী ছেলেদের পড়াবার জন্য, আর তাও আফগানিস্থানের শিক্ষার ভাষা, ভদ্রসমাজের ভাষা ফরাসীর মাধ্যমে। শিক্ষক রূপে তাঁর কলকাতা থেকে রেলে আর বাসে কাবুল পর্যন্ত যাত্রা, কাবুলে তাঁর থাকবার কথা, সেখানে তাঁর নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা (এঁরা বেশীর ভাগই ছিলেন তাঁর সহকর্মী, আর তা ছাড়া তাঁর ভৃত্য, আর রুশ দূতাবাসের বন্ধুরা)—এই-সব কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। তার পরে, কাবুলে থাকতে-থাকতে দেখা দিলে আমানুল্লাহের অতি উৎসাহের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—ধর্মবিষয়ে রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—ক্ষমতালোলুপ লুঠেরা আর ধর্মধ্বজী মোল্লা এই দুইয়ের ত্বরিত গতি এক দিকে, আর সংস্কার-বিলাসী, আদর্শবাদী, মানুষের উদার প্রকৃতিতে আস্থাশীল রাজার অলস মন্থর গতি অন্যদিকে। আমানুল্লাহ বিতাড়িত হ'লেন, নানা গোপন ষড়যন্ত্রের পরে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আর রাজার অক্ষমতা একসঙ্গে দেখা দিলে, শেষে ঘটল দেশের মধ্যে

রাষ্ট্রবিপ্লব, বাচ্চা-ই-সক্কার সিংহাসন অধিকার, আমানুল্লাহের পলায়ন। ঘটনাবলী অতি দ্রুত ঘ'টে গেল; কিন্তু তার মধ্যে নিরীহ বিদেশী ভারতীয় অধিবাসীদের সমস্যা, বিশেষ কষ্ট আর উদ্বেগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। ডাক্তার মুজতবা আলী আর তাঁর সহকর্মী আর শান্তিনিকেতনের সুহৃদ আর সতীর্থ মৌলানা জিয়াউদ্দীনকেও এই অনপেক্ষিত রাষ্ট্র বিপ্লবে যথেষ্ট ভুগ্‌তে হ'ল। এই-সব কথা, চমৎকার রসপূর্ণ ভঙ্গীতে বাঙালী পাঠকদেব জন্য গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে, আফগানিস্থানে ভারতবাসীর প্রদত্ত বেতনে পুষ্ট ইংরেজ-জাতীয় ভারতের রাজদূতের ভাবতীয়দের সম্বন্ধে নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনতা ও দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার কথা-ও এসে গিয়েছে।

ডাক্তার আলী কতদিন বা কত মাস বা কয় বৎসর কাবুলে ছিলেন, তা স্পষ্ট ক'রে কোথাও জানিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। একটিও তাবিখ নেই তাঁর এই অপূর্ব বিদেশ-দর্শনের কথায়। আফগানিস্থানে বাচ্চ-ই-সক্কাব বিদ্রোহ আর আমানুল্লাহের পতন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে তাঁর কাবুল-বাসের শেষের দিকে অন্যতম পটভূমিকা। সে-সব ঘটনার তাবিখ, পেশাদারী সন-তাবিখ দেওযা ইতিহাসেব কেতাবে পাওযা যাবে। সন-তাবিখ না দেওয়াটা-ই যেন ডাক্তার আলীর বইয়ের পক্ষে একটি Symbolic বা প্রতীক-স্থানীয় অথবা deliberate বা সচেতন উদ্দেশ্য-মূলক ব্যাপার। কারণ, বিষয়ের দরুণ বিশেষ দেশ-নিবদ্ধ থাকতে বাধ্য হ'লেও যথার্থ রসসৃষ্টির ফলে তাঁর বই কাল-নিবপেক্ষ হ'যে নির্দিষ্ট কালেব ঊর্ধ্বে গিয়ে পৌঁচেছে।

লেখকের সজীব মন, তাঁর সঙ্গে আব তাঁব চাব পাশে যে-সব মানুষ ব'য়েছে, চ'লছে-ফিরছে, শুযে ব'সে আছে তাদেব সম্বন্ধে তাঁর দবদপূর্ণ কৌতূহল, তাঁকে কতটা না ফুর্তিযুক্ত ক'বে বেখেছে! যত লোকেব তিনি সংস্পর্শে এসেছেন, তা তাঁর রেলগাড়ীর ক'লকাতার তালতলার ফিরিঙ্গী রেলেব-গার্ড সহযাত্রীটি থেকে আবম্ভ ক'বে পেশাওব কাবুল-পথের বাসের শিখ মোটবচালক পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিটি, তা সে পথ-চলতি সঙ্গীই হোক, তাঁর কাবুলের ভৃত্য অদ্ভুত চরিত্রের আবদুর-রহমানই হোক্, নানা মনোভাবের তাঁর সহকর্মী আফগান শিক্ষকেরাই হোক্, সকলের মধ্যে তিনি দেখেছেন তাদের সহজ মানবিকতা, তাদের প্রাণ। আর তিনি যা দেখেছেন তা জীবন্ত ক'রে তুলেছেন তাঁব বর্ণনার নৈপুণ্যে।

এটি একটি কম গুণ নয়।

ডাক্তার মুজতবা আলীর হাস্য বা ব্যঙ্গরস অতি স্নিগ্ধ বস্তু। সেটি এক সংস্কৃতি-পূত মানবপ্রেমীরই পরিচায়ক, তার মধ্যে রুক্ষতা বা কর্কশতা অথবা নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র নেই। সব কথা, গুরু গম্ভীর কথাও তিনি সরস ক'রে হাসিয়ে-হাসিয়ে শোনাতে পারেন, এটি বড় অপূর্ব জিনিস। বই খুলে প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেই চোখে পড়ে— 'চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম।' এই রকম হাল্কা ভাবে শুরু হ'ল যে কেতাবের, তা প'ড়ে যেতে কোথাও বাধে না, গ্রন্থকারের পরিহাস-রসিকতা সদা বিদ্যমান থেকে, জটিল সমস্যা, বড় বড় গুরুপাক আন্তর্জাতিক কথা, সাংস্কৃতিক বিচার, সমস্তই লঘুপাক ক'বে দেয়। তাঁর হাস্যরসেব ভাণ্ড তিনি একেবারে উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন; তাঁর এই দানশৌণ্ডতা কিন্তু অনেককে একটু বিব্রত ক'বে তুলবে।

যে মানুষগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন তারা প্রত্যেককেই জীবন্ত, প্রত্যেকেই বিশিষ্টতা-যুক্ত। ডাক্তার আলীর চোখে দেখে তাদের সঙ্গে আমাদেরও দোস্তি হ'য়ে যায়—মনে হয়, তারাও আমাদেব চেনা, আমাদের পরিচিত। যাত্রা পথে বা কাবুলে অবস্থানকালে, চলচ্চিত্রের মত তাঁর কথার যন্ত্রে যাদের ছবি তিনি নিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই প্রাণ পেয়েছে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে পাঠকের হৃদয়ে তারা অমর হ'য়ে থাকবে। ক'লকাতার ট্রেনের সেই তালতলার মেটে ফিরিঙ্গী সহযাত্রী, পাঞ্জাবে পেশাওরের পথে শিখ সরদারজী আর পাঠান সহযাত্রী, পেশাওরে তাঁর পাঠান বন্ধু আহমদ আলী যার ঘরে তিনি অতিথি হয়েছিলেন, বুড়ো শিখ বাস-চালক যে ছিল একটি যাকে বলে character, আফগান রেডিও কর্মচারী যিনি একই বাসের যাত্রী ছিলেন; কাবুলে তাঁর চাকর আবদুর রহমান, বরফের দেশ পান্‌শির থেকে তার বিরাট বপু আর তার কুসুম-কোমল হৃদয় নিযে লেখকের সেবা ক'রে তার হৃদয় জয় ক'রে নেয় যে, আমাদেরও হৃদয় জয় করে নিয়েছে সে—লেখকের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বইয়ের শেষ কথা আমরাও প্রতিধ্বনিত করি—'মনে হ'ল, চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর-রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর-রহমানের হৃদয়'; রসিক-প্রবর মীর আসলাম, যিনি লেখককে তাঁর অজ্ঞাতসারে তালিম দিয়ে ফারসীতে পোক্ত ক'রে দেবার জন্য ছাপার হরফের ভাষায় শক্ত শক্ত আরবী কথায় ভরা ফারসী প্রথমটায়

ব'লতেন, পারে সহজ চল্‌তি ফারসীতে তাঁর লঘু স্বরূপ প্রকাশ করেন; অধ্যাপক সাইফুল আলম, অধ্যাপক দোস্ত মোহম্মদ; ফারসী অধ্যাপক আমাদের পূর্ব-পরিচিত শান্তিনিকেতনের বোনোআ সাহেব, আর রুশ অধ্যাপক বাগ্‌দানফ; রুশ রাষ্ট্রদূতাবাসের বন্ধুগণ—দেমিদফ, বলশফ, আরও অন্য অন্য ভদ্রসন্তান ও মহিলা; লেখকের ছাত্র, বাচ্চা-ই-সক্কার আত্মীয় যে উনিশ বছর বয়সেই সক্কার ফৌজে 'কর্ণাইল' হ'য়ে, বিপ্লবের মধ্যে দুঃখের দিনে deus ex machina অর্থাৎ ভাগ্যবিধাতার মত আচমকা উদিত হ'য়ে লেখক আর তাঁর সহকর্মী, সতীর্থ ও সুহৃৎ জিয়াউদ্দীন সাহেবের জীবন-ধারণ সমস্যার সুসার করে দেয়; অজাতশত্রু সর্বজনপ্রিয় জিয়াউদ্দীন সাহেব, শান্তিনিকেতনে যাঁর বন্ধুত্ব লাভের সুযোগ আমারও হ'য়েছিল, আর যাঁর অকালমৃত্যু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ব্যথিত করেছিল ও যাঁর স্মৃতিতে কবি তাঁর এক অমর কবিতায় নিজের স্নেহ নিবেদন করেছিলেন; কত নাম করা যায়? এর উপর, তাঁর অননুকরণীয় রসপূর্ণ ভাষায় ও ঢঙে তিনি আফগানিস্থানের রাজান্তঃপুরের পলিটিক্স-এর এমন সুন্দর ইতিহাস জীবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে তার তুলনা হয় না। আমরা আমানুল্লাহের মাতার নামও শুনিনি, কিন্তু তাঁর কীর্তিকাহিনী, তাঁর 'কারনামা' এমন রসসিক্ত ক'রে কে লিখতে পেরেছে? আমানুল্লাহের বড় ভাই মুইনুস্ সুলতানে যিনি একটি মেয়ের ভালোবাসায় প'ড়ে, হেলায়, লোকে ব'লবে নির্বোধের মত, সিংহাসন ত্যাগ ক'রলেন, সেই মেয়েটির মহীয়সী প্রকৃতি, পরবর্তীকালে তাঁর নারী-সুলভ স্নেহশীল হৃদয়, আমরা লেখকের সঙ্গেও অনুভব ক'রেছি;—বিদেশী, সুন্দর চেহারার তরুণ অধ্যাপকটিকে একা-একা দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় তার সম্বন্ধে সহানুভূতিতে ভ'রে যায়—তিনি স্বামীকে যে ব'লেছিলেন—'বাচ্চা গম মীখুরদ্—ছেলেটার মনে সুখ নেই'—একথা প'ড়ে আমরাও তাঁর উদ্দেশ্যে নীচু হ'য়ে লেখকের মতন আদাব তস্‌লিমাত জানাচ্ছি।

বইখানির documentary value বেশ আছে—প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, কি ভাবে কোন্ ঘটনা-পরম্পরার ফলে আমানুল্লাহ বিতাড়িত হ'লেন, বাচ্চা-ই-সক্কাকে আশ্রয় ক'বে গোঁড়ার দল বিজয়ী হ'ল। বইখানিতে ঘটনার আলোচনা আছে; কিন্তু এর মুখ্য মূল্য হ'চ্ছে যে এতে কতকগুলি মানুষের মনের পর্দা খুলে আসল মানুষগুলিকে চিরকালের জন্য ধ'রে দেওয়া হয়েছে। বই প'ড়ে বিস্ময়ে আর

খুশীতে মন ভরে যায়—মীর আসলম, সাইফুল আলম, দোস্ত মোহম্মদের মত এমন সংস্কৃতিপূর্ণ মানুষ আফগানিস্থানে আবার দেখা দিচ্ছে—এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছা হয়; মনে এক-একবার প্রশ্নও জাগে, সত্যই কি এরা এত বিদগ্ধ, এত সুসংস্কৃত ব্যক্তি? না এখানে লেখকের মুন্‌শিয়ানা আছে—চোখে রঙীন চশমা প'রে তিনি সব দেখেছেন, তদনুসারে তাঁর বর্ণনাতেও গোলাপী রঙ এসে গিয়েছে? কিন্তু সমস্ত বইখানা প'ড়লে, তার sincerity বা ভাবশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সংস্কৃতিপূত উদার মনের দৃষ্টিভঙ্গী, যাতে লোহা-ও সোনা হয়ে যায়।

একটা কথা বলবো। লেখকের পাঠ আর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে তিনি অবলীলাক্রমে স্বদেশী বিদেশী পাঁচটা ভাষা আর সাহিত্য থেকে নানা কথা নানা সাহিত্যিক প্রসঙ্গ এনেছেন, তার সমস্তের সঙ্গে পরিচয় রাখেন এমন বাঙালী খুব কমই আছেন। কিন্তু সে সবে বইয়ের বক্তব্যের বাধা হয় না—পার্বত্য নদীর গতিবেগের মধ্যে পাথরের চাবড়ার মত হয়তো মনে হবে তা বাধা সৃষ্টি ক'রছে; কিন্তু কার্যত তা করে না—বইয়ের স্বচ্ছন্দ নৃত্যময় গতিবেগকে আরও সুন্দর আর বিচিত্রতাযুক্ত করে তোলে। তবে ছাপাখানার কারসাজিতে এই সব বিদেশী ভাষার নামের আর বাক্যের বাংলা প্রতিবর্ণে একটু-আধটু ভুল চুক মাঝে মাঝে এসে গিয়েছে।

লেখকের ব্যক্তিত্ব যা তাঁর বইয়ে ধরা যাচ্ছে তার মধ্যে আর দুটি জিনিস লক্ষণীয়। তিনি একদিকে যেমন international, বিশ্বের একজন, বিশ্ব-মানবিকতায় ভরপুর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় আর ইসলামীয় তিনটি সভ্যতার বাহ্য ইতিহাস আর রূপ আর তার ভিতরের কথা সব নখ-দর্পণে রাখেন,—তিনি ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজি, ফারসী, জরমান, বাংলা (প্রাচীন আর আধুনিক), সংস্কৃত, ফারসী, আরবী আর তা ছাড়া অন্য কতকগুলি সাহিত্যের হাওয়া আর তার মহাকাব্য আর বচন তাঁর মনের ফুলবাগানে সৌরভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে—তাঁর কাছে গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই;—আর অন্যদিকে তিনি হচ্ছেন তেমনি খাঁটি বাঙালী—কেবল খাঁটি বাঙালী নন, খাঁটি মুসলমান বাঙালী; তিনি নিজে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্মের গৌরবে, 'স্বে মহিম্নি', নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁর আন্তর্জাতিকতা, বাঙালী

মুসলমান জাতীয়তার ভিত্তিব উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁর আন্তর্জাতিকতা এত পাকা ঃ কারণ এই কথাটা অতি সত্য কথা—he alone is truly international who is most intensely national. মাঝে মাঝে যখন তিনি দুই-চার বার তাঁর মনের গভীরতম প্রদেশের বাতায়নপথ একটু-আধটু উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন, তখন মুসলমানী রঙে রাঙানো অনুভূতির বা রসোপলব্ধির ঝলক চোখে লেগেছে। আমি বাঙালী হিন্দু ঘরের ছেলে, এতে খুশীই হয়েছি, কারণ আমি এককে তো চাই-ই, বহু আব বিচিত্র সেই একেরই প্রকাশ ব'লে পৃথক পৃথক ভাবে এই বহু ও বিচিত্রকেও আমি চাই।

বইখানি থেকে বহু বহু অংশ প'ড়ে শোনাবার বা উদ্ধার করে দেবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ক'রবো না। 'দেশে-বিদেশে'-তে অপূর্ব ভোজ্যসম্ভার সংস্কৃতিকামী বাংলা-পড়িয়ে মানুষেব জন্য পরিবেশিত হ'য়ে র'য়েছে; আমি সকলকে তাতে ব'সে যেতে আহ্বান করি।

'দেশে-বিদেশে' : ফিরে পড়ার বই

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মানুষ তার মন ও চোখ দিয়ে অনেক জিনিস দেখে, বোঝে। তার কিছু কিছু মনে রাখার মতো। যে ব্যক্তি প্রকৃতির বা সাহিত্যের বিচিত্র সৌন্দর্য অভিনিবিষ্ট হয়ে দেখেন ও বুঝে নেন, তার অনেক অংশ অস্পষ্ট ও ধূসর হয়ে গেলেও সব অনুভূতি, উপলব্ধি মুছে যায় না। কল্পনা ও স্মৃতিরসে জারিত হয়ে পরে আবার মনকে উজ্জীবিত করে, যে-কথা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'ইয়ারো' কবিতাগুচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। জীবনে এমন ঘটনা ঘটে, এমন দৃশ্য দেখা যায়, যার অভিঘাত, সাময়িক হয়েও ব্যক্তি-মনে ও সত্তায় মিশে গিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির সহায় হয়।

তেমনি বই। দৃশ্য বা ঘটনাব মতো বই অতটা পলাতক নয়। সময়ের দূরত্ব কাটিয়ে কোনও একখানা বই পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতাকে ফিবে দেখা চলে। যাঁবা অনেক বই কেনেন-পড়েন, তাঁর কতগুলিকে মনে রাখেন বা রাখতে পারেন? শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অজস্র চিত্র-চরিত্র ঘটনা তালগোল পাকিয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। আর ছায়ারূপে কিছু কিছু স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, বাকি সব শূন্যতায় বিলীন। অনেকেরই অবশ্য প্রিয় গ্রন্থকার আছেন কিন্তু প্রিয় গ্রন্থের সংখ্যা কয়টি? মহাকাব্য আর ক্লাসিক বা চিরায়ত সাহিত্য বাদ দিলে, তার মধ্যে মনের উপর গভীর রেখা অঙ্কিত করে গেছে—এমন বই-এর সংখ্যা বেশি নয়।

তার প্রধান কারণ, অনেক তথাকথিত নাম-করা বই নতুনত্বের চমক আনে, মনকে সাময়িক নাড়াও দেয় কিন্তু অন্তরে তেমন করে সাড়া জাগায় না। যে পরিবেশে বইটি লেখা, যে ধরনের আবেদন ও বিশিষ্ট স্বাদ বহন করে এনে মনকে তৃপ্ত করে, কিছুকাল পরে দেখা যায়, সে-বইটি আবার পড়ে তেমন আনন্দ আর পাওয়া গেল না। তার যাদু যেন ফুরিয়ে গেছে।

অনেক পাঠকেরই এমন অভিজ্ঞতা আছে। দেশী-বিদেশী সাহিত্যে এমন অনেক বই-এর নাম করা যায়, যার আবেদন তাৎক্ষণিক। কিছু দিন খুব জনপ্রিয় থেকে মিলিয়ে যায় বিস্মৃতির মধ্যে। যাকে বলা যায়, 'নাইন ডে'জ ওয়ান্ডার'। বিশের দশকে এমনি আলোড়ন এনেছিল এক ইংরেজি উপন্যাস 'ইফ উইন্টার কামস্'। এইচ জি ওয়েলসের ধাঁচে লেখা এই বইখানার কথা অল্পকাল পরেই আর কেউ মনে রাখেনি।

তবু এমন কিছু বই অবশ্যই আছে ও থাকবে যা শুধু পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেই ক্ষান্ত হয় না, পাঠক-চিত্তে একটা মোটা দাগ কাটে। তখন ইচ্ছা হয় পরখ করতে, সেই চেতনা ও কম্পন জাগে কিনা। যদি প্রথম অনুভূতির রেশ তখনও ধরা যায়, তাহলে 'কম্যুনিকেশন' সার্থক হয়েছে মানতেই হবে। সমকালীন পরিবেশ, ঘটনার গুরুত্ব, চরিত্রের নাটকীয়ত্ব কমে এলেও সে-বই-এর আকর্ষণ অর্থাৎ মৌলিক উৎকর্ষ বজায় থাকে।

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন তাঁর একদা-বিখ্যাত গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে' লিখে। তারপর আরও অনেক বই লিখে তিনি আসর জমিয়ে রাখেন এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি—বইখানির নাম 'দেশ-বিদেশে' নয়, 'দেশে-বিদেশে'। প্রথম খণ্ডে আছে দেশের কথা অর্থাৎ কলকাতা থেকে ভারতের সীমান্তরেখা হল তার চৌহদ্দি। এই দীর্ঘ রেলপথে তাঁর যাত্রা একটি উৎকৃষ্ট 'ট্রাভেলগ'। এ ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁর অভিজ্ঞতা বিচিত্র কৌতুক রসে পূর্ণ, মানবিকতায় উজ্জ্বল। পথে যে কয়টি মানুষের সংস্পর্শে তিনি এলেন, তাঁরা 'টাইপ' নন, যথার্থই 'ইনডিভিডুয়াল' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত এক এক ব্যক্তি। তাঁদের চরিত্রচিত্রণে মুজতবা আলীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কথায় আচরণে খেয়ালখুশিতে তাঁরা খুব সজীবভাবে উপস্থাপিত।

দ্বিতীয় খন্ডে আছে তাঁর নতুন কর্মস্থল আফগানিস্তানে প্রবাস-জীবনের কথা। আমীর আমানুল্লার নাটকীয় পতন এবং বাচ্চাই সাকোর আকস্মিক উত্থান ও কাবুল দখল, সেই সময়কার কথা। সম্পূর্ণই আলাদা সে-দেশের বর্তমান কালের ইতিহাস। রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি যতই অনিশ্চিত ও অব্যবস্থিত হোক, কাবুলের মানুষ তাদের ঢিলে-ঢালা চাল-চলনে, খানাপিনায়, গালগল্পে,

সৌজন্যে ও অতিথিবাৎসল্যে তাদের আবহমান ঐতিহ্য থেকে একটুও যে নড়েনি, মুজতবা আলী কয়েকটি চরিত্র আর ঘটনার মাধ্যমে তারই সরস কাহিনী ছবির মতো তুলে ধরেছেন। ছবিটি সহজ-সুন্দর কিন্তু কঠিন শিল্পকর্ম। লেখকের দৃষ্টি যেমন প্রসারিত, অন্তর্দৃষ্টি তেমনি সন্ধানী।

মুজতবা আলী ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ভারত-কাবুলের ঐতিহাসিক সম্পর্কটি ঠিকমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পেরেছেন। এই দুই দেশের মধ্যে একদিন নিকট সম্পর্ক ছিল, কারণ কাবুল-কান্দাহার প্রাচীনকালে মৌর্য আমলে, ভারতেরই অংশ ছিল এবং সে-তথ্য প্রত্নতত্ত্বের কল্যাণে প্রমাণিত। সেই যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল মুঘল যুগেও। গণ্ডগোলটা বাধল যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কূটনৈতিক চাল শুরু হল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। মুজতবা আলী প্রায় চারশ' পৃষ্ঠা ধরে দুটি খণ্ডে তঁর ভ্রমণ ও প্রবাস-কাহিনীর মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়ে চলেছেন সুললিত কথকের ভঙ্গিতে। ব্যাখ্যায় আর লাগসই টিপ্পনীতে আরও সুরসিত হয়ে উঠেছে।

'দেশে-বিদেশে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় পাঠকসমাজে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। অনেকেই বইখানি পড়ে এই শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবকে স্বাগত জানান। আমিও পড়েছি এবং এক নিপুণ সংবেদনশীল লেখকের রচনা হিসেবে তার তারিফও করেছি। এখনও করি, কারণ অনেকদিন পরে আবার পড়ে দেখি-প্রথম উপভোগের আনন্দে কিছু ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু বইটির মৌলিক স্বাদ বজায় আছে। ভিন্নরুচি লোকের কাছে বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো বই সমাদর লাভ করে। কেউ তারিফ করেন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির, কেউ রচনাশৈলীর, কেউ বা লেখকের ভাষা ও শব্দযোজনার ক্ষমতার। খুব অল্প পাঠকই মানুষটির মনের ও মগজের পরিচয় খোঁজেন। এবং সে পরিচয় না পেলে কোনো আলোচনাই আন্তরিক হয় না।

রচনার মাধ্যমে মর্মগ্রাহিতায় পৌঁছুলে, লেখক কি বলতে চাইছেন, কিভাবে তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, কোথায় লেখা রসোত্তীর্ণ হল, কোথায়ই বা ছন্দপতন ঘটল—এগুলি ঠিক্‌মতো চিনে ও বুঝে নিলে উৎকর্ষের বিচার যথার্থ হতে পারে। নইলে শুধু সমাদর উচ্ছ্বাসেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই কথাগুলি প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। যেহেতু আলিসাহেব

একদিকে যেমন উচ্চ-প্রশংসিত, অন্যদিকে তেমনি তাঁর রচনা বহু-বিতর্কিত। 'দেশে-বিদেশে' ছাড়া তিনি আরও আটাশখানা বই লিখেছেন, যার মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ-সমষ্টি বাদ দিলে, অধিকাংশই মজলিসী ঢং-এর রচনা, প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় 'রম্য রচনা'।

এখানে বলে রাখি—বাংলায় রম্য রচনার যে চেহারা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে 'বেল্‌লেত্তার' শব্দটির ব্যাপক ও প্রকৃত সংজ্ঞা বোঝায় না। এর মধ্যে যে-কোনো বিষয়ের জ্ঞান ও গুণগত আলোচনা বিষয়বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি মনে রেখে তার সরস, সাবলীল ব্যাখ্যান আসতে পার। যে-লেখা সাহিত্যগুণন্বিত রসাশ্রিত, সেটাই রম্য। যা অ-রম্য, তা কদাচ সাহিত্য নয়। আসল কথা হল—মানসোৎকর্ষ। কেবল চিত্তবিনোদন নয়, অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি নয়। মনের গভীরতা ও চিন্তার সঞ্চারী গতি বৃদ্ধিই তার লক্ষ্য। মুজতবা আলীর সমগ্র রচনার বিচরণক্ষেত্র এখানে নয়। তবে তাঁর লেখায় উৎকর্ষ আবার ত্রুটিও আছে। এবং আছে বলেই কোনো রসজ্ঞ সমালোচক বলেছেন, এই জাতীয় রচনায় আলী সাহেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবাব, আব এক বিদগ্ধ রুচিবান পাঠককে বলতে শুনেছি—'মুজতবা আলী আমাব পেট্ অ্যাবমিনেশান' অর্থাৎ প্রিয় অরুচি।

যে যাই বলুন, 'দেশে-বিদেশে' যে সব দিক থেকেই তাঁব শ্রেষ্ঠ বচনা এবং প্রথম ভূমিকায নেমেই তিনি যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর বেখে গেলেন, সে বিষয়ে সমালোচকরা একমত। এখন দেখা যাক, কী কী কারণে এই বইটি পাঠকদের মন কেড়েছিল। প্রথমে এর বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা বলতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে যখন গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য, কবিতা ও প্রবন্ধেরও প্রসার দেখা যাচ্ছিল এবং সাধাবণ পাঠকেব বহু ভোজনে অরুচি জন্মাচ্ছিল, সেই সময় আলী সাহেবের চোস্ত জবান্ আর রসিকতার ঝক্‌ঝকে দীপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ পাঠকসমাজে অভাবনীয় সাড়া জাগাল। ক্রমাগত গল্প উপন্যাস পড়ে আর মাঝে মাঝে কবিতা ও প্রবন্ধের পাতা উল্টিয়ে পাঠক যখন ক্লান্ত, তখন হাতের কাছে সে পেয়ে গেল একাধারে দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা আব স্ফূর্তি সরস গল্পগুজব—আলী সাহেবের ভাষায় 'কেচ্ছা'—ধারালো স্রোতের মতো কাহিনীর একটানা গতি, তার বাঁকে বাঁকে অপ্রত্যাশিত সবুজ জটলা,

আর বর্ণনায় কাব্যের আমেজ। এ সবই মুজবতা আলীর লেখার বৈশিষ্ট্য। আরও কতকগুলি গুণের সমাবেশ ঘটেছে 'দেশে-বিদেশে'। কিছু চপলতা ও সংযমের অভাব সত্ত্বেও, তাঁর বাক্-নৈপুণ্য এবং বাচনভঙ্গি অতি মনোহর। তিনি বিদ্বান, শিক্ষিত। ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্যের বর্ম আঁটা নয়, প্রচুর পড়াশুনো করেও তিনি 'একাডেমিক' নন।

এই বইয়ে তিনি নিজের যে পরিচয় রাখলেন, তা একজন বিদগ্ধ মানুষের, যিনি মুখ্যত সংস্কৃতির ছাত্র এবং সবচেয়ে বড় কথা, যাঁর রচনায় মানবিকতায় ভরপুর। তাঁর মস্ত গুণ যেটি বিশ্বভারতীর দান, তিনি 'কসমোপলিট'—যদিও হাবে-ভাবে তিনি নির্ভেজাল বাঙালি। তিনি বহুবার য়ুরোপ সফর করেছেন, অনেক পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মন সাধারণ মানুষের দিকেই ঝুঁকেছে বারবার। তাই আবদুর রহমানের মতো 'পুরানো ভৃত্যের' চরিত্রটি এত জীবন্ত ও সহজ হতে পেরেছে।

আসলে, বিশ্ব-নাগরিক হয়েও, আলী সাহেব সর্বত্র বাংলাদেশকে খুঁজে পান। তিনি নিখুঁত মজলিশীতাই কাবুলী ইরানী ফরাসী জর্মন মজলিসের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বাঙালি আড্ডার মানুষ। তাঁর কৌতুকপ্রবণতা অদম্য, মুখে-চোখে দুষ্টুমির ভাবটি কলমেও ফুটে ওঠে। তাঁর লেখায় প্রমথ চৌধুরীর 'উইট' এবং উপেন বাঁড়ুজ্যেমশাই-এর 'স্যাটায়ার'-এর মিশেল পাওয়া যাবে—যদিচ সরলতায়, সংযত ভাষণে আর অন্তর্গভীরতায় তিনি ওদের সমকক্ষ নন। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে, স্বগত ভাষণে আর সংলাপের কুশলী মিশ্রণে, আরবী ফার্সী মিশেল গুরুচণ্ডালী শব্দের নিপুণ প্রয়োগে, চলতি ভাষার বহমান স্রোতকে তিনি কলমে এমন সতেজ সঙ্কোচহীনতায় ধরতে পেরেছেন যে তার নজির আমাদের সাহিত্যে প্রায় বিরল। তবে 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে যে গদ্যরীতি উপযুক্ত বিষয়ের টানে বেগবতী হয়ে উঠেছে, মুজতবা আলীর পরবর্তী রচনাগুলিতে অভিজ্ঞতার ও বক্তব্যের একই ধরন এসে যাওয়াতে সেই বেগ যেন হারিয়েছে। ফলে, টেকনিকের বিবর্তন কিংবা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে পড়ল না। এর প্রধান কারণ হল যে, আপাত-বৈচিত্র্য থাকলেও আলী সাহেবের বিষয়বস্তুর

মূল উৎস একটি—সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং তাঁর লেখার ছাঁদ ও ছক মোটামুটি একই রকমের। মজলিসী ঢং এবং এবং বৈঠকী মেজাজে কিছু পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। কোনও বিশেষ গুণ বা কৌশল অতি ব্যবহারে খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। ভাষা ও বলার ভঙ্গিমা 'স্টাইলাইজড্' হলে প্রথম চমক আর ততটা চমৎকৃত করে না। কিন্তু 'দেশে-বিদেশে' এমন একটি বই যা অনেক বছর পরে পড়েও উপভোগ করা চলে।

পড়তে পড়তে মনে হয়, এই বহু-অধীতী মানুষটি তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানদৃষ্টিকে একটি নরমগরম আরামপ্রদ পুরানো পোষাকের মতো পরে লিখতে বসেছেন। সেখানে কড়া ইস্ত্রির জৌলুস নেই। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি কত সুন্দর সাবলীলভাবে বলা যায়, তার উৎকৃষ্ট নমুনা শুধু 'দেশে-বিদেশে'ই নয়, আর একটি গ্রন্থ—'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'। সেখানে তথ্যের ও তত্ত্বের নিপুণ সমাবেশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ও বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায়ের যে যুগ্ম আলেখ্য তিনি এঁকেছেন তা বাঁধিয়ে রাখার মতো।

আলীসাহেব আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সেই 'উদ্ভট শ্লোক'টি আওড়াতেন—

'তয়া কবিতয়া কিমু তয়া বনিতয়া কিমু
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া ন হ্রিয়তে মনঃ'।

অর্থাৎ সেই কবিতায় কি কাজ আর বনিতায় কি কাজ, পদবিন্যাস মাত্রই যে মনোহরণ করতে না পারে। মুজতবা আলী তাঁর 'দেশে-বিদেশে' এই বিন্যাস-গুণেরই স্থায়ী পরিচয় রেখে গেছেন, চরিত্রের ও পরিবেশের, ভাষার ও শব্দের যথাযথ সংস্থাপনে। তিনি আজ থাকলে, আমার এই মন্তব্য শুনে হয়তো বলে উঠতেন, 'ব্রাদার, এটাই হল মোদ্দা কথা'।

ভোরের শিশির কণা ও দিবসের শতদল : আলীর দুই নায়িকা

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাসের মধ্যে 'শবনম' ও 'শহর-ইয়ার' এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভোরের শিশির ('শবনম' নামের অর্থ 'শিশির') সদ্য তরুণী শবনমের প্রথম প্রেম ও ট্রাজেডি আর দিবসের বিকশিত শতদল, পূর্ণ যৌবনা শহর-ইয়ারের জীবন সমস্যা এর উপাদান।

বাংলা সাহিত্যে অনেকদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। জীবনের মত সাহিত্যেও যেন অবরোধের অন্তরালে ছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের শাহজাদি প্রমুখের কথা ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বদ্রাওনের নবাবকন্যা, বঙ্কিম জেবউন্নিসা বা আয়েষাব অবিস্মরণীয় চিত্র অঙ্কন করলেও আধুনিক মুসলমান সমাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র চাষীর মেয়ে আমিনা ও মুসলমান বেদের মেয়ে বিলাসীকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশাল ও বিচিত্র জগতে তারা খুব একটা স্থান অধিকার করেনি। 'আবদুল্লা' উপন্যাসে বা কাজী আবদুল ওদুদের বিভিন্ন রচনায় অবশ্য আমরা মুসলমান নারীর পরিচয় পাই। পরবর্তীকালে গোলাম কুদ্দুস, আশরাফ চৌধুরী, আফসার আমেদ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গৌরকিশোর ঘোষ এবং আরো কোন কোন লেখক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীচরিত্র দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ওপার বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডার ত' আছেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'শবনম' ও 'শহর ইয়ার'কে বিচার করতে হবে। অবশ্য এরা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধি নয়। বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নায়িকাদের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

'শবনম' উপন্যাসের পটভূমিকা, ১৯২৭-৩০ সালের আফগানিস্থানের

রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝা। সংস্কার প্রচেষ্টা ও তার ফলে বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, পটপরিবর্তন। আমানুল্লা সে সময় ছিলেন কাবুলের আমীর। নানা দিক থেকে বিচার করলে তিনি সাধারণ শাসক ছিলেন না। প্রথম যৌবনে পিতা ও সম্ভবত কাকাকে হত্যা করে, বড় ভাইকে সরিয়ে তিনি সিংহাসন দখল করেছিলেন। অবশ্য ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন আমানুল্লা জননী। হয়ত আমানুল্লার প্রত্যক্ষ অপরাধ ছিল না। তবে ক্ষমতা লাভের পর তাঁর ইতিহাস প্রায় অবিচ্ছিন্ন গৌরবের। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। (ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্থানকে একরকম বশংবদ রাষ্ট্র satellite state বানানো।) স্বয়ং স্টালিন মন্তব্য করলেন, অনেক বাঘা মার্কসবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাটের তুলনায় মধ্যযুগীয় কাবুলের আমীর প্রশংসার যোগ্য। কারণ এই তথাকথিত মার্কসবাদীরা যেখানে আত্মসমর্পণ করেছেন, আমানুল্লা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে ছাড়েন নি।

কেবল যুদ্ধ নয়, আমানুল্লার পরিকল্পনা ছিল ব্যাপক সমাজ সংস্কার। পশ্চাৎপদ, প্রায় মধ্যযুগীয় আফগানিস্থানে শিল্পায়ন, পশ্চিমা শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, নারী মুক্তি। বিশের দশকে তুরস্কে কামাল পাশার সংস্কার এশিয়া আফ্রিকা অনেক দেশকে, বিশেষ করে মুসলমান দুনিযাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমানুল্লা সেই পথেব পথিক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর এক প্রধান সহায় ছিলেন তাঁর বেগম, সুরাইয়া। তিনি ছিলেন সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সংস্কারমুক্ত। বহুদিন বিদেশে কাটিয়েছিলেন। সবার সামনে অবগুণ্ঠনমুক্ত হতে তাঁর বাধে নি। কিন্তু কামাল পাশার মত সাফল্য আমানুল্লা অর্জন করতে পারেন নি। সামন্ত ভূস্বামীদের একাংশ ও ধর্ম ব্যবসায়ী আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধলেন; মোল্লারা ফতোযা দিলেন, আমীর কাফের, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা সব মুসলমানদের কর্তব্য। বাচ্চা-ই-সাকা নামে এক ডাকাতের সর্দার (আফগানিস্থানে অবশ্য ডাকাত ও যোদ্ধা, ডাকাত ও গোষ্ঠীপতির মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী ছিল না) কাবুলে ক্ষমতা দখর করল। মোল্লারা তাকেই বাদশা বলে ঘোষণা করল। আমানুল্লা সেনাপতি ও সর্দারদের অসহযোগিতার ফলে বিনা যুদ্ধে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। পরিবার পরিজন নিয়ে আশ্রয় নিলেন বম্বেতে, সেখান থেকে ইতালিতে।

পরে সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে পরাজিত ও হত্যা করে সিংহাসন জয় করলেন। আমানুল্লা যে সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, তার ইতি এখানেই। নারী মুক্তির স্বপ্নও তলিয়ে গেল বোরখার অন্ধকারে। আমানুল্লার বিরুদ্ধে এক প্রধান অভিযোগ ছিল, তাঁর বেগম নাকি অনাবৃত মুখে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে বেশরিয়তি কাজ করেছেন, ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছেন। এমন পত্নীকে ত্যাগ না করলে আমীরের সিংহাসনে বসার হক নেই।

আমানুল্লার সংস্কার প্রচেষ্টা প্রতিবেশী ভারতে সাড়া না তুলে পারেনি। মুসলমান সম্প্রদায় এ ব্যাপারে বিভক্ত ছিল। মুসলীম লীগ ও ধর্মান্ধ আলেম সহ সাম্প্রদায়িক অংশ আমানুল্লার বিপক্ষে ছিল ও তার পতনে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। প্রগতিশীল অংশ দুঃখিত হয়েছিল। বিশেষ করে যে সব ভারতীয় মুসলমান নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল, কামালের মত আমানুল্লা তাদের সামনে আশার প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। বেগম রোকেয়া তাদের অন্যতমা। বোম্বাইয়ে এক শিক্ষিকা পলাতক আমানুল্লার শাশুড়ি বেগম তর্জির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলেন। রোকেয়া সেটি উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে আমানুল্লা ও তাঁর সংস্কার সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর নারীদের মুক্ত করার প্রয়াস রোকেয়ার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, আমানুল্লা কাবুলের একমাত্র বাদশাহ, যিনি একাধিক পত্নী বা রক্ষিতা বর্জন করেছিলেন। দাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন। মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। 'বাদশাহ স্বয়ং প্রত্যেক মেয়েকে রাজকোষ হইতে বৃত্তি দিতেন—যাহাতে লোকে কাপড় ও বৃত্তির লোভে মেয়েদিগকে পাড়ায়'।

> *বাদশাহ আমানুল্লাহ্ প্রাচীনকালের দাসত্ব মোচন করিয়াছেন, বদবখত আফগানিস্তানকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন ও সভ্য করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন।...এমন পুণ্যশ্লোক বাদশাহ্কে কাফের ফতোয়া দেওয়া হইল।*

রোকেয়ার তিক্ত মন্তব্য, এই 'অভিশপ্ত' জাতি আমানুল্লার যোগ্য নয়। বাচ্চার মত দুর্বৃত্ত ডাকাতই তাদের উপযুক্ত শাসক। রোকেয়ার লেখা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, সে যুগে ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের কাছে

কামাল পাশার মত আমানুল্লা হয়ে উঠেছিলেন নারীমুক্তির প্রতীক। তাঁর শোচনীয় পতন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ছিল এক বিরাট অভিযোগ।

মুজতবা আলী ঐ সময় শিক্ষকের কাজ নিয়ে কাবুলে ছিলেন। বাচ্চা পরে সব স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেয়। আমানুল্লার পতন, বাচ্চার সাময়িক ক্ষমতা দখল, সংস্কারের দরুন তামসাচ্ছন্ন দেশে আলোড়ন, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ সবই তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। কেবল যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তা নয়, আগুনের আঁচ তাঁর গায়েও লেগেছিল। অনেক কষ্ট স্বীকার করে, প্রায় অনাহারে দিন কাটিয়ে, কোনমতে প্রাণ হাতে করে তিনি দেশে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। 'দেশে-বিদেশে'তে আমরা তার বর্ণনা দেখি। দুঃখময় অভিজ্ঞতারও সুফল আছে। কাবুল বাস মুজতবাকে অনুপ্রাণিত করেছিল অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনী 'দেশে- বিদেশে' ও সেরা উপন্যাস 'শবনম' লিখতে।

'দেশে-বিদেশে'তে আমরা পাই বিশের দশকেব শেষের দিকে আফগানিস্থানের এক আকর্ষণীয় ছবি। তবে মুজতবার দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক বেগম রোকেয়ার মত নয়। আমানুল্লার প্রতি তঁর সহানুভূতি ছিল। কিন্তু আমীরের 'হাই স্পিড' সংস্কাব প্রচেষ্টা তিনি খুব আন্তরিকভাবে নিতে পারেন নি। ববং কৌতুকের চোখে দেখেছেন। উপব থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের (আমানুল্লা সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের সামিল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ নেই) নিঃসন্দেহে হাস্যকর বাড়াবাড়ির দিক ছিল ঃ আমানুল্লার অত্যধিক বক্তৃতা দেওয়ার প্রবণাতা, দেশ শুদ্ধ সবাইকে জোর করে 'দেরেশি' অর্থাৎ পশ্চিমা পোশাক পরাবার চেষ্টা, কার্পেটের বদলে চেয়ারে বসার হুকুম! মুজতবা এ সবের উপর জোর দিয়েছেন। সমাজ সংস্কার বা নারীমুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নেই। অবশ্য ভ্রমণ কাহিনীর মেজাজে তা প্রত্যাশিতও নয়।

'শবনম' এই পটভূমিকায় বচিত উপন্যাস। নায়ক লেখকের মতই কাবুল প্রবাসী তরুণ বাঙালী শিক্ষক। শবনম ধনী ও সম্ভ্রান্ত সেনাপতি, আওরঙ্গ জেব খানের একমাত্র আদরিণী কন্যা। উনিশ বছরের জীবনের প্রথম দশ বছর প্যারিসে কাটিয়েছে। তার শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি অনেকটাই পশ্চিম, বিশেষ করে ফ্রান্সের ধাঁচের। বেগম সুরাইয়ার মতই সে রূপসী, শিক্ষিতা,

আধুনিকা। সেই সঙ্গে আবার চিরন্তন। কাবুলে তখন আমানুল্লার সংস্কারের ঢেউ উঠেছে। শবনম এমনিতেই পর্দা মানত না। দু'জনের পরিচয়, প্রথম দর্শনে প্রেম ও পূর্বরাগ দিয়ে কাহিনীর সূচনা। দু'জনের বিয়ে হল। কেবল একবার নয়, দু'বার। প্রথমবার গোপনে, দ্বিতীয়বার সামাজিকভাবে। ইতিমধ্যে বাচ্চা কাবুল দখল করল। বাচ্চার এক সেনাপতি শবনমের দিকে লোভের হাত বাড়াল। আওরঙ্গজেব খানের আশা ছিল, ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করার সুবাদে তাঁর মেয়ে ব্রিটিশ লিগেশনের সাহায্য পাবে। কারণ ভারত তখন ব্রিটেনের উপনিবেশ। দেশত্যাগ করাও অসম্ভব হবে না। কিন্তু তার আগেই বাচ্চার লোকেরা শবনমকে ধরে নিয়ে গেল। যে জাফর তাকে কামনা করেছিল, তাকে গুলি করে শবনম নিরুদ্দেশ হল। সর্বত্র খুঁজেও তাকে আর পাওয়া গেল না। নায়ক প্রিয় বিরহে মজনু বা প্রেমোন্মাদ হয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াল শবনমের খোঁজে। একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তাকে সঙ্গ ও সান্ত্বনা দিলেন শবনমের জ্যাঠামশাই। তিনি জ্ঞানী, অন্ধ ও সাধক। অবশেষে নায়কের চেতনার চোখ উন্মিলীত হল। হারিয়ে যাওয়া শবনম জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নিয়ে দেখা দিল তার মানসলোকে। এই তাদের পুনর্মিলন, সত্যিকারের মিলন।

বস্তুত এক নারীর প্রেম নায়ককে নিয়ে গেছে মরমীয়া (Mystical) সাধনার পথে। সব হারিয়ে সে সব পেয়েছে। শূন্যতাই পূর্ণতার পূর্ব শর্ত। নায়ক শবনমকে বাইরে হারিয়ে মনের মধ্যে পেল অন্তরতমা রূপে। জ্যাঠামশাই যেমন চোখের জ্যোতি হারিয়ে অন্তরের বর্ধিত জ্যোতিতে তার ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে/অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে'। মিলন, বিচ্ছেদ, অদৃশ্য লোকে পুনর্মিলন—এই তিন খণ্ড মিলে 'শবনমে'র সম্পূর্ণতা।

'শবনম'কে উপন্যাস হিসেবে এক নিটোল লিরিক কবিতা বললে ভুল হবে না। এখানে যেমন গদ্যে পদ্যের ছন্দ এসেছে, তেমনি ছত্রে ছত্রে এসেছে কবিতার গুচ্ছ। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় প্রেমের ও বিচ্ছেদের, বিদায়ের বিনি সুতোর মালা গেঁথেছে অজস্র কবিতা ও বাক্যের ফুলঝুরি দিয়ে। 'শবনমে' সেই একই ব্যাপার, যদিও এক্ষেত্রে নায়িকা বেশি কথা

বলেছে, নায়ক মুগ্ধ শ্রোতা। 'শেষের কবিতা'র অধিকাংশ কবিতা লেখকের, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। 'শবনমে' ফুলের তোড়ায় এসেছে প্রধানত ফার্সী কবিতা। ফার্সী শবনমের মাতৃভাষা আর ভারতের সঙ্গেও তার নাড়ির যোগ বহুদিনের। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ শুনে জ্যাঠামশাই পেয়েছেন বিচিত্র অথচ পরিচিত রসের স্বাদ। তাছাড়া নায়ক প্রেম সাধনার অঙ্গ হিসেবে ফার্সী কবিতার নিরলস চর্চা চালিয়েছে। হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়ামের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রকাব্য, বৈষ্ণব গীতিকবিতা এমনকি দু'একটি ফরাসী লোকগীতি। মুজতবা 'শহর ইয়ার'-এ তাঁর মানসে বৈষ্ণব কবিতার গভীর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নেই। ফ্রেমের মধ্যে ছবি, হারের মধ্যে লকেটের মত প্রাচীন যুগের প্রেম কাহিনী নায়ক ও শবনমের প্রেমকে ঘিরে রেখেছে, মাধুর্য ও মর্যাদা বাড়িয়েছে। বারবার এসেছে রাধাকৃষ্ণ, লায়লী মজনুর কথা। দুই চির মিলন আর চির বিচ্ছেদের কাহিনী। এমন কি শবনম যেন রাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করেছে, প্রেমিকের মনজগতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। বাসর রাতে শবনম স্বামীকে শুনিয়েছে লায়লী মজনুর কথা। কেবল নায়ক নায়িকা নয়, প্রায় সব চরিত্রই যেন কথার কথায় বয়েৎ আওড়ায়, সাধারণ কথাব মধ্যে কাব্য রস টেনে আনে। অথচ কোথাও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বা আরোপিত মনে হয় না।

শবনম এক অত্যাশ্চর্য চরিত্র। বাংলা সাহিত্যের নাযিকাদের 'গ্যালারি'তে তার প্রথম সারিতে স্থান তর্কাতীত। প্রথমেই ধরা যাক তার রূপ বর্ণনার কথা। লেখক নায়িকার অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নিপুণ তুলিতে প্রেমের স্পর্শ। এ রীতি মনে করিয়ে দেয় সংস্কৃত বা বৈষ্ণব কাব্য অথবা বঙ্কিমী শৈলীর কথা। কয়েকটি উদাহরণ—

> *প্রথমে দেখেছিলাম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা।...বন-মল্লিকার পাপড়ির মত।...।*
>
> *সে কপোল এতই লাল যে আজ যেন কোনও প্রসাধন প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে করা হয়েছে। বদখ্‌শানের রুবি চূর্ণ দিয়ে?*

তাহলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসাল, ফেটে যায় যায়, আঙুরের মত নধর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে?... অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম, তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হাঁ, হাঁ হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হঁ দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফ্ লঙের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্রস্রবণ কুণ্ডের স্থির নীল জলের অতলে সবুজ শ্যাওলা।

শবনম আকৃতি-প্রকৃতিতে নিজেই যেন একগুচ্ছ গীতিকবিতা। সে যে কেবল দিনরাত কবিতা বলে তা নয়, মনের দিক থেকে বাস করে কাব্য লোকে, কল্পলোকে। বাইরের হানাহানি, বিপদ, মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। লোকে তাকে বাস্তব বোধের অভাবের জন্য দোষ দিলে শবনম বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না। সে নায়ককে বলে,

আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমাব প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধাও নি, তুমি বাস্তবে বাস কর, না কাবালোকে। তুমিই একমাত্র যে বুঝেছ কাবালোকে বাস না কবলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, বা দর্শন-লোকে না ডাক্তারদের ছেঁড়া খোঁড়ার শবলোকে? আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না কবি তবে তো নেমে আসব সেই লোকে— গাধা, গরু যেখানে ঘাস চিবোয আব জাবর কাটে।

এখানেই নায়কের সঙ্গে তার মিল। তাই দু'জনে এত সহজে পরস্পরের মধ্যে 'আফিনিটি' খুঁজে পায়। নায়কের মন্তব্য, 'শবনমের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাৎ ছিলনা। না হলে সে আমাকে ভালবাসল কি করে?'

তবে শবনমের সরল, মধুর স্বভাবের অন্যদিকও আছে। তার প্রকৃতি কঠোরে কোমলে মেশানো। সে যে দেশের মেয়ে, সেখানে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই আছে। শবনম তার উনিশ বছরের জীবনে এমন অনেক দেখেছে, তাই বাচ্চার কাবুল দখল বা চারদিকে গোলাগুলি তাকে অত্যধিক বিচলিত করে না। শবনম মনে করিয়ে দেয়, তিমুরের পুত্রবধূ গওহর বেগম হিরাট শহর স্থাপন করেছিলেন। আমানুল্লার জননী পতিহত্যা করে পুত্রকে

তখ্‌তে বসিয়েছিলেন। সেনাপতি আওরঙজেব খানের কন্যা ফ্যাশন দুরস্ত হ্যাণ্ডব্যাগে পিস্তল নিয়ে ঘোরে। বড় রিভলভারও অনায়াসে ব্যবহার করতে জানে। বিপদের বেড়াজাল পেরিয়ে প্রেমিক বা স্বামীর কাছে অভিসারে যেতে এক ধরনের তীব্র আনন্দ উপভোগ করে। এর দরুণ তার ছেলে নাকি জন্মাবে সিংহ হৃদয় নিয়ে। বীরাঙ্গনারাই বীর জননী হয়। তার স্বামীকে কেউ কেড়ে নিতে এলে বা দু'জনের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করলে সে যে ছেড়ে কথা বলবে না, সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়। শেষে ভোরের শিশির বা শিউলি আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। তার দিকে লালসার পঙ্কিল হাত বাড়িয়ে দস্যু সেনাপতি জাফর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এ ধরনের নায়িকা বাংলা সাহিত্যে বিরল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দেবী চৌধুরানী ইত্যাদি বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে এবং জীবনে মেয়েরা চোখের জল ফেলতে যতখানি পটু, গুলি ছুঁড়তে ততটা নয়। অবশ্য বিশ ও ত্রিশের দশকে কিছু বাঙালি মেয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তার উল্লেখ 'শবনম'-এ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের এলা, শরৎচন্দ্রের ভারতী বা সুমিত্রা বীরাঙ্গনা হিসেবে শবনমের কাছাকাছি আসতে পাবে না। সেইসঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস ও কাব্যপ্রীতি মিলে মণিকাঞ্চন যোগ।

শবনম নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্তমনা। সে পর্দা ত' মানেই না, উপরন্তু তার স্বেচ্ছা বিহার আজকের যে কোন মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েরও ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। (শহর-ইয়ারের বিযয় একই কথা বলা যায়।) কিন্তু বৃহত্তর নারী মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে শবনম উদাসীন। আমানুল্লার সংস্কার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তার মত অনেকটা 'দেশে বিদেশে'তে মুজতবা আলীর মত। সহানুভূতির সঙ্গে কৌতুক। শবনমের ধারণা, কাবুলকে দ্বিতীয় প্যারিস বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার বদলে আমানুল্লার উচিত, বেগমকে নিয়ে সত্যিকারের প্যারিসে পাড়ি দেওয়া। রোকেয়া বলেছেন, অবগুণ্ঠন বা অবরোধ বিষাক্ত গ্যাসের মত তিলে তিলে মুসলমান নারীদের হত্যা করে। শবনম ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। সে হাল্কাভাবে মন্তব্য করে, বোরখার আড়ালে তুর্কী রমণীরা সাম্রাজ্য চালাতে বাধা নেই। আর বোরখা পুরুষরা চাপিয়ে দেয় নি। মেয়েরা নিজেরাই বেছে নিয়েছে, ছদ্মবেশে সর্বত্র

যেতে পারবে বলে। শবনম নিজে বোরখার বরতনু আবৃত করে প্রিয়দর্শনে আসে। বোরখার অন্তরালে পিস্তলও লুকিয়ে রাখতে তার বাধে না। আলজিরিয়ার মুক্তি যুদ্ধের সময় আরব নারীরা বোরখার আড়ালে লুকিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করত। বাম তাত্ত্বিক ফ্যাননের মতে, এ ভাবেই বিপ্লব ও নারীমুক্তি একাত্ম হয়ে উঠেছিল। শবনম বিপ্লবী নয়, তবে বোরখা ও পিস্তলের রহস্য জানে।

'শবনম' পড়ে মনে হতে পারে, অন্তত আমার মনে হয়েছে, একটি উপন্যাসের মধ্যে যেন দ্বিতীয় উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে। তার বিষয়বস্তু হতে পারে, পারত ধর্ম ও সমাজের জটিলতা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। রক্ষণশীল বনাম প্রগতিশীলদের দ্বন্দ্ব, নারীবাদী চেতনার উন্মেষ ও তার উপর বরফ জল ঢেলে দেওয়া। অবশ্য আমরা যা পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞ।

সবশেষে 'শবনম' তুলে ধরেছে এক চিরন্তন প্রশ্ন। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়, তবে তাঁর বিশ্বে, একান্তভাবেই তাঁরই সৃষ্টিতে, এত দুঃখ, কষ্ট, অবিচার অন্যায় কেন! নাস্তিকদের কাছে এ জাতীয় প্রশ্ন অর্থহীন। যেখানে কোন অলৌকিক বিচারক নেই, সেখানে নালিশ ফরিয়াদ বৃথা। অভিমানেরও কেউ দাম দেবে না। আবাব কেউ কেউ মনে কবে, বিশ্ব বিধানের পেছনে কোন অলৌকিক, অমোঘ শক্তি কাজ করেছে বটে, তবে সে ক্ষেত্রেও কিছু বলার নেই। কিন্তু 'শবনমে'র তরুণ নায়ক গভীবভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। সে ইসলামের আচার অনুষ্ঠান মানে এবং আক্ষরিক অর্থে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, যদিও তার মরমীয়া চিন্তার তরু সব ধর্মের মাটি থেকে রস গ্রহণ করে। সেদিক থেকে তার মিল আছে জ্ঞানে মন এবং কাহিনীর সুফী সাহেবের সঙ্গে। যে দুঃখ কোন ভাবেই তার বা শবনমের পাওনা নয়, তা নায়ক অন্তর বা বিচারবুদ্ধি দিয়ে মেনে নিতে পারে না। হিন্দু হলে না হয় জন্মান্তরের পাপের দোহাই দিতে পারত। সে পথ তার পক্ষে বন্ধ। জগত মায়া, মিথ্যা, ইহলোকে কোন সুখ দুঃখে কিছু এসে যায় না—এ জাতীয় তত্ত্বও সে মানতে নারাজ।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোন জায়গার প্রকাশ করে

থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাদের নূতন করে বলতে হবে। বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মানুষের হৃদয় ভেঙো না।

প্রবীণ, জ্ঞানী, স্থিতধী জানে মনও ঈশ্বরের উপর অভিমান না করে পারেন না। চোখের জ্যোতি হারানো তিনি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দৃষ্টির চেয়ে প্রিয় শবনমকে হারিয়ে ধৈর্য বজায় রাখতে পারেন নি। সুফী সাহেব নায়ককে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ'। অবশেষে আমরা দেখেছি, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। নায়ক নিজের মনে শবনমকে পেয়ে ঈশ্বরকেও আবার অন্তরে গ্রহণ করতে পারল। সে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কাহিনীর কথা তুলেছে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে প্রথমে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। পরে সেই পার্থিব প্রেম তাকে উত্তীর্ণ করেছিল সাধনার পথে। শবনমকে হারিয়ে নায়কের অবিশ্বাস, অভিমান, তারপর শবনমের মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করে শান্তি, আত্মসমর্পণ। দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। কখনও মিলবে না। তবে কাহিনীর পরিণতি প্রবল আবেগের পর অতল প্রশান্তিতে। পাগমান পাহাড়ের বরফের সৌন্দর্য যে বর্ণহীনতা নয়, শীতের দেশে শুভ্রতাই যে নানা রঙের প্রকাশ, তা নায়কের চোখ এড়ায় নি। উপন্যাসে বেদনা বিধুর রোমাণ্টিকতা যেন সব রূপ ও রঙের মিশ্রণ।

'শবনম' ৬০ সালে ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বছর দশেক পর একই পত্রিকায় 'শহর-ইয়ার' আত্মপ্রকাশ করেছিল। পটভূমিকা, ষাটের দশকের কলকাতা ও শান্তিনিকেতন। লেখকের আলাপ ও ক্রমে অন্তরঙ্গতা হল ডাক্তার জুলফিকর খান ও তার স্ত্রী শহর-ইয়ারের সঙ্গে। ধনী ও খানদানি বংশজাত ডাক্তার নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। সারাদিন ল্যাবরেটরিতে কাটে। শবনম ছিল উনিশ বছরের তরুণী। প্রেমের সিংহদ্বারে উপনীত। শহর-ইয়ার ত্রিশ বছরের পূর্ণ যৌবনা নারী। তার পেছনে দশ বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা। সে উচ্চশিক্ষিতা, চিন্তাশীলা, সুগায়িকা। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার জীবন ও চিন্তার মূলে; যেমন ফার্সী কবিতা শবনমের। ডাক্তার ও ডাক্তার পত্নীর জীবনযাত্রা এক বাঙালি দম্পতির পক্ষে

একটু অস্বাভাবিক। তারা প্রাসাদের মত বাড়িতে থাকে, অনুগত দাসদাসীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে। কোন নিকট আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বা সামাজিক বৃত্ত নেই বললেই চলে। যাইহোক, শহর-ইয়ারের আপাতদৃষ্টিতে কোন দুঃখ বা অভাব নেই, সন্তানহীনতা বাদে। প্রচুর অর্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনোমত ও সমর্পিত প্রাণ স্বামী, সবই তার আছে। তবু মাঝে মাঝে লেখক তার মধ্যে লক্ষ্য করেন কি যেন অতৃপ্তি, অপূর্ণতা।

উপন্যাসের প্রথমার্ধে শহর-ইয়ার ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি উদাসীন। নিয়মিত নামাজ, রোজা পর্যন্ত পালন করে না। এমনকি তার প্রাণপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতেব ধর্মীয় দিকটি তাকে ততখানি আকর্ষণ করে না। অন্যদিকে, ডাক্তাব নিষ্ঠাবান মুসলমান, নামাজ পড়া ও অবসর সময় কোরান অধ্যয়নের প্রতি প্রবল আসক্তি' কিন্তু তিনি নিজের ধ্যান-ধাবণা স্ত্রী বা অন্য কারোর উপর চাপাবার পক্ষপাতী নন। কাহিনীর মাঝামাঝি শহর-ইয়ারের এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে। সে জনৈক পীর সাহেবেব ভক্ত শিষ্যা হয়ে পড়ে আর গুরুব টানে স্বামী, সংসারকে অবহেলা শুরু করে। আলী বিস্মিত, আহত, হয়ত কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সন্দেহ হয়, শহর-ইয়ারের গুরুদেব ভণ্ড, সুযোগসন্ধানী, হয়ত বা লম্পট। সবেজমিনে পবীক্ষা করতে তিনি গুরুব সঙ্গে দেখা করেন, দেখা যায়, পীব সাহেব তাঁবই এক পুবানো বন্ধু এবং খাঁটি মানুষ। পীব আবো জানান, তিনি কাবোকে দীক্ষা দেন না। সেই অর্থে শহর-ইযার তাঁব শিষ্যা নয়।

এবপর আসে দ্বিতীয় চমক। শহর-ইয়ার এক দীর্ঘ চিঠিতে আলীকে তাব জীবনের গোপন অথচ দুঃসহ দুঃখেব কথা জানায়। দুঃখের প্রকৃতি আশ্চর্য সন্দেহ নেই। শহর-ইয়াবের প্রাসাদোপম শ্বশুর বাড়ি যে খানদান বা ঐতিহ্যের প্রতীক, তা যেন পাযাণভারের মত তাব বুকে চেপে বসেছে। মানসিকভাবে তিল তিল করে তাকে শেষ কবে দিয়েছে এক দশক ধরে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কে শহর-ইয়ারকে ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে! কে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। মাথার উপব কোন গুরুজন নেই, যার আদেশ নির্দেশ মানতে হবে। শহর-ইয়ারের স্বামী নিজের খানদান সম্বন্ধে উদাসীন, এমনকি বিরূপ। স্ত্রীকে তাব গন্ডীর মধ্যে রাখার প্রশ্নই নেই। বাধা

বা দায় বাইরের নয়, মানসিক। বাড়ি যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণের' শাহী মঞ্জিলের মত বাসিন্দাদের মোহগ্রস্ত করে, রক্ত শুষে নেয়। তার উপর আছে পুরাতন ভৃত্যের দল। পরম ভক্তি ও আনুগত্যের মাধ্যমে তারা গৃহিণীকে পরিচালনা করে। তার দৈনন্দিন রুটিন, এমনকি রান্না খাওয়া বেঁধে দেয়। নতুন কাজের লোকেরা অল্পদিনের মধ্যে সেই দলে যোগ নেয়। ক্রমে শহর-ইয়ারের মনে জন্মায় সবচেয়ে বড় ভয়। সে ক্রমে এই ঐতিহ্যের, পাষাণপুরীর অংশে পরিণত হবে। হারিয়ে ফেলবে নিজস্ব সত্তা, স্বাতন্ত্র্য।

> *সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-খাজনা দিতে রাজী ছিলুম না। তার কারণ এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে, আমাব ধর্ম আমার ইমান যাবে।*

এই ভয়, এই মানসিক বন্দীদশা শহর-ইয়ারকে *ঠেলে* দিয়েছিল ধর্মের, গুরুর দিকে। শেষে সে সিদ্ধান্ত নিল, স্বামী, সংসাব ছেড়ে যাবে। রাগ অভিমানে নয়, অত্যাচার এড়াতে নয়, পুরুষদের আকর্ষণে নয়। নিজের অন্তরতম সত্যকে খুঁজে পেতে বা বক্ষা করতে। সে যুগের মীরাবাই বা আধুনিক সাহিত্যে ইবসেনের নোরার মত[১]।

এরপর আসে তৃতীয় চমক। শহর-ইয়ার তার সংকল্প কাজে পরিণত করার আগেই একসঙ্গে তিনটি ঘটনা ঘটল। যে বাড়ি চিরন্তন মনে হত, তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। (দুর্ঘটনার পেছনে কি কোন মানুষের হাত ছিল?) ডাক্তার গবেষণার কাজে সস্ত্রীক অনিদিষ্ট কালের জন্য সুইডেনে বাস করা স্থির করলেন। আর শহর-ইয়ারের দেহের অভ্যন্তরে দেখা দিল নতুন জীবনের বীজ। বাড়ি নামক শৃঙ্খলের অবসান, বিদেশ যাত্রা বা আসন্ন মাতৃত্ব শহর-ইয়ারের জীবন বদলে দিল। সংসার ত্যাগের আর দরকার হল না। নতুন জীবন কি তাকে সার্থক করবে, পূর্ণতা দেবে? এ প্রশ্নের সঙ্গেই কাহিনী শেষ।

শবনম প্রথম প্রেমের আনন্দের তরঙ্গে ভেসে চলেছিল। বাইরের হাজার বিপদ তাকে বিচলিত, কক্ষচ্যুত করতে পারেনি। শহর-ইয়ার বিচিত্র, প্রায় অবোধ্য মানসিক যন্ত্রণা গোপন করে বাইরে ভাস্বর, উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছিল। শবনম ছিল নায়কের প্রেমিকা, পরে স্ত্রী, শহর-ইয়ার লেখকের বান্ধবী। বয়সে বেশ খানিকটা ছোট। তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিচিত্র, মধুর, জটিল,একটু যেন ভীরু, ভঙ্গুর। ফরাসী ভাষায় এর নাম, amitie amoureure. নরনারীর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব, যা প্রেম নয়।

তবু প্রেমের স্পর্শমণির সামান্য ছোঁয়া পেয়ে আরো মধুর, দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আলী এই প্রসঙ্গে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'মহাকাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটির কথা। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গ্রন্থে, যুবরাজ চন্দ্রাপীড় ও পত্রলেখার সম্পর্ক নিয়ে। পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সর্ব সময়ের ঘনিষ্ঠ সহচবী কিন্তু তাদের মধ্যে প্রেম, ভালবাসার কোন প্রশ্নই নেই। এক অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের যে সম্বন্ধ হতে পারত, এক্ষেত্রেও তাই। 'পত্নী নয়, প্রণয়িনী নয়, কিংকরী নয়, পুরুষের সহচরী'। আলী চন্দ্রাপীড় পত্রলেখার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন শহর-ইয়ারের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বন্ধুত্বের। উদ্ধৃত করেছেন বাণভট্ট সংক্রান্ত কবিগুরুর লেখা ঃ

> *পত্রলেখা যেখানে আসিয়া যে অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহাব আসিবার কোনপ্রকাব প্রয়োজন ছিলনা। স্থানটি তাহার পক্ষে বড সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা দিলেই সংকট।*

সংকীর্ণতা বা সংকট প্রচলিত অর্থে নয়। নারীপুরুষের, বিশেষত অনাত্মীয যুবক-যুবতীর মধ্যে যে সাধারণ সামাজিক ব্যবধান, পত্রলেখা তা অনায়াসে অগ্রাহ্য করেছে। যুবরাজের সঙ্গে সর্বত্র ঘুরেছে, এমনকি সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে একঘরে রাত কাটিয়েছে। শহর-ইয়ারও এব্যাপারে পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত। লেখক ভেবে আশ্চর্য হন, এই রমণীর মা-দিদিমা পর্দানশিন ছিলেন। শহর-ইয়ার প্রথম বাইরে বেড়িয়েছে। তার শান্ত গৌরবর্ণে যেন বহু যুগের অসূর্যম্পশ্যা নারীর ছাপ। কিন্তু অবরোধের আর কোন চিহ্ন নেই। সে নিঃসংকোচে মাঝরাতে একা শান্তিনিকেতনে আলীর বাড়িতে যায়। তাঁর শোবার ঘরে রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। নির্দোষ অঙ্গস্পর্শেও আপত্তি নেই, লোকনিন্দা তৃণজ্ঞান করে, সঙ্কোচ আছে লেখকের দিক থেকে। শহর-ইয়ার তাঁর পদসেবার প্রস্তাব করলে তিনি প্রাচীন সংস্কারবশত চমকে ওঠেন।

নির্জন শয়নকক্ষে এক বিবাহিতা রমণী পরপুরুষের পদসেবা করবে! হনন্য তিনি প্রিয়, গুরুজন স্থানীয বন্ধু, মাননীয় লেখক। পরমুহূর্তে অবশ্য আলী তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। শহর-ইয়ার যখন পীরের প্রভাবে লেখককে অবহেলা করে (অন্তত আলী তাই মনে করেন) তখন আলীর মন অভিমানে ভরে যায়। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে সে কথা বলতে পারেন না। কেবল আভাস ইঙ্গিত দিতে পারেন। শহর-ইয়ার. লেখকের ভাষায, তাঁর বোন বা প্রিয়ার চেয়ে বেশি হলেও দুজনের মধ্যে কোন স্বীকৃত সম্পর্ক নেই। এইটুকু সান্ত্বনা, প্রেমে যে ক্ষয ও বৃদ্ধির চক্র আছে, বন্ধুর বন্ধুত্ব তার থেকে নিরাপদ।

> *প্রেম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্র-গ্রহণও হয। কিন্তু বন্ধুত্বও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমাব মত রাতে বাতে বাড়ে এবং চতুর্দশীতে এসে থামে। পূর্ণিমাতে পৌঁছয় না। তাই তাব গ্রহণ নেই, ক্ষয়ও নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবে আমাদেব বন্ধুত্বের উপব এ কিসেব করাল ছাযা।*

'শবনমে'র মত এই উপন্যাসেও মরমিযা সাধনাব কথা এসেছে। 'শবনম'-এর নায়ক এ পথে সান্ত্বনা খুঁজেছিল পরম দুঃখের দিনে। শহর-ইয়ার ভরা সুখের পানসি ছেড়ে সাধনা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিল। অবশ্য তার বিচিত্র, গোপন দুঃখের বহস্য ক্রমে জানা যায়। এই সাধনা, গুরু ভজনার ফলে কি শহব-ইযার শান্তি পেযেছিল? না কেবল তাব পরিচিত জনদের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। স্বামী, বন্ধু, এমন কি পরিচাবকদেব দুঃখ দিয়েছিল? লেখকের অনুমান, শহব-ইয়াব তখন স্বপ্নাচ্ছন্না, অথবা মরমিয়া সাধনাব উষর পর্বের মধ্য দিয়ে চলেছে। শূন্যতার পথেই পূর্ণতার সাধনা। শহর-ইয়ারের ধর্মভাবে লেখক বিচলিত। অভিমানাহত, একটু বা ঈর্ষান্বিত। ডাক্তার ত' ভেঙ্গে পড়েন, যেন তিনি সর্বস্ব হারিয়েছেন। শহর-ইয়ারের ধর্ম জগতে প্রবেশ যেন তার মৃত্যুর সামিল। তবু লেখক নিজেকে সান্ত্বনা দেন, সাধনার এই বিশেষ স্তর হয়তো সাময়িক। ক্রমে শহব-ইয়াব আত্মস্থ হবে, মানসিকভাবে প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসবে, ঈশ্বর বা গুরুকে না ভুলেও।

শহর-ইয়ার মরমিয়া সাধনায় এই পর্যায়ে যেন স্রোতে ভাসমান পাতা। যে কোন দিকে ভেসে যেতে পারে। শেষ পরিণতি আমরা দেখেছি। সুদূর

বিদেশে তার সাধনা কোন পথ নেবে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অনুভূতি কিভাবে বিকশিত হবে, সন্তানের দিকে পাল্লা ভারি হলে আর সবকিছু ভুলে যাবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন জেগে থাকে কাহিনীর যবনিকা পতনের পর।

সুফী সাধনার এক অঙ্গ, বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন, অন্তত বিভিন্ন ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণ। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি সেখানে অচল। শহর-ইয়ারের পীর সাহেবের কাছে হিন্দু-মুসলমান সবার অবারিত দ্বার। বস্তুত আমাদের উপমহাদেশে সব সম্প্রদায়ের মানুষ পীরের দরগায় মানত করেছে, ফকিরের কবরে চেরাগ জ্বেলেছে। অন্ধভক্তি বা কুসংস্কার কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে ভাল কিনা, সে প্রশ্ন ভিন্ন। এই নিয়ে শহর-ইয়ারের বিতর্ক বাধে ডাক্তারের দিল্লীবাসী প্রিয় বন্ধু মনসুরের সঙ্গে। মনসুর উর্দুর গর্বে বাংলাকে অবজ্ঞা করে। তার মতে, বাংলা ভাষা হিন্দু চিন্তাব অশুভ প্রভাব বহন করে। খাঁটি মুসলমানের পক্ষে তা বর্জনীয়। শহর-ইযাবেব উত্তর, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি টেগোরের ধর্মীয় সঙ্গীত কোন বিশেষ হিন্দুদের দেবীর বর্ণনা বা বন্দনা নয়। ('ভানুসিংহের পদাবলী' হয়ত ব্যতিক্রম। সে কথা এখানে তোলা হয় নি।) রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সর্বধর্মেব প্রভু। সুফী ও মবমিয়া সাধকদের উপাস্য জ্যোতির্ময় পুরুষ। রবীন্দ্র ভক্তি আব ইসলামের মধ্যে বিরোধিতা নেই।

আলোচনাব বিষয়, আধুনিক হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের অবস্থা, অতীত ও বর্তমান। হিন্দু পাবিবারিক আইনের ফল বা ব্যর্থতা। আইন সব কিছু কবতে পারে না। মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এ ব্যাপারে লেখক ও শহর-ইয়ার একমত। তবে শহর-ইয়াবের মতে, মুসলমান মেয়েদের দু'টি 'প্লাস পয়েণ্ট' আছে। মুসলমান আদর্শ অনুসারে নারীদের পতিব্রতা হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। তবে বর্ণহিন্দু মেয়েরা যে অর্থে পতিব্রতা, ঠিক সে অর্থে নয়। সম্ভবত শহর-ইয়ারের বক্তব্য, মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রী বা বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ নয। বর্ণ হিন্দু নারীদের মত (অন্তত বিদ্যাসাগর বা হিন্দু পারিবারিক বিল পাশ হওয়ার আগে) যেভাবে জীবনে মরণে এক পতির চরণাশ্রিতা ছিল, তাদের মুসলমান বোনদের বেলা সে কথা খাটে না। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের মধ্যে বর্ণ বা লিঙ্গ ভেদ নেই। সবার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, অধিকার ও কর্তব্য এক।

একটি কৌতুকজনক ঘটনা সামাজিক বিবর্তনের সত্য আরো স্পষ্ট করে তোলে। ডাক্তার তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাগনীর বিয়ের ব্যাপারে আলীকে পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন। আলী দেনমোহর, (যে স্ত্রীধন বিয়ের সময় বর কনেকে দেয়) গয়না ও বিয়ের অন্যান্য শর্ত নিয়ে কৌশলে দর কষাকষির জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে পাত্রপক্ষ সবকিছু এক কথায় মেনে নিল। নিজের কৃতিত্বে গর্বিত আলীর কাছে শহর-ইয়ার আসল রহস্য ফাঁস করে দেয়। বিয়ের সম্বন্ধের পেছনে পূর্বরাগ ছিল। পাত্রের আগ্রহাতিশয্যেই ব্যাপারটা এত সহজে মিটল। শহর-ইয়ারের মন্তব্য, স্ত্রী শিক্ষা ও অবাধ মেলামেশার ফলে বিয়ের সমস্যা মিটতে পারে। হিন্দু সমাজ অবশ্য উল্টোটাই প্রমাণ করে। স্ত্রী শিক্ষা, এমন কি প্রেম ঘটিত বিয়ে সাধারণভাবে পণ যৌতুকের ভার লাঘব করেনি।

'শহর-ইয়ার' ঘটনা প্রধান উপন্যাস নয়। 'শবনম'-এর চেয়েও এখানে ঘটনা বা কাহিনীর ভাগ কম। শহর-ইয়ারের বিভিন্ন সময়কার মানসিক অবস্থা ও বিবর্তন, লেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নানা সূক্ষ্ম দিক। আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বিষয় আলোচনা—সময় সময় দীর্ঘ, কিন্তু কখনো ক্লান্তিকর নয়—কাহিনীর উপজীব্য। 'শবনম'-এ যে গীতিকাব্যসুলভ সৌন্দর্য ও আবেগ লক্ষণীয়, স্বাভাবিকভাবেই এখানে তা অনুপস্থিত। তবে তার স্থান নিয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত, বিদগ্ধ ভাষায় কথোপকথন। প্রেম, বন্ধুত্ব, নারী স্বাধীনতা, ধর্ম, মরমিয়া সাধনা—সবই এই ভাষার গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শবনম' ও 'শহর-ইয়ার' দুই ভিন্ন স্বাদের রচনা হিসাবে আলীর শ্রেষ্ঠ লেখার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কাবুলের সদ্য প্রস্ফুটিত কিশোরী আর আমাদের পরিচিত কলকাতার বনেদি বাড়ির বধূ বিশ্বসাহিত্যের নায়িকাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য।

---

(১) শহর-ইয়ার এখানে আশাপূর্ণার এক রচনার কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে বিদ্রোহিনী বউ ক্রমে প্রাচীনপন্থী। অত্যাচারী শাশুড়ির কার্বন কপিতে রূপান্তরিত হল। এখানে আলী অথবা নায়িকা ভুল করেছেন। আসলে এটি সন্তোষ কুমার ঘোষের একটি গল্পের বিষয়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্প

বীরেন্দ্র দত্ত

।। এক।।

ব্যাঙ্কে জমানো মোটা টাকার আসল ও সুদে বাড়ে, বাড়তে থাকে, টাকাটা বেড়েই যায়—যতই তা থেকে অর্থাৎ বাড়তি সুদটা থেকে খরচ করা যাক না কেন! এবং চক্রবৃদ্ধির অঙ্কে তা ফুলে ফেঁপে তাকিয়ে থাকার মতো। মূলধনটা হয়ে ওঠে রহস্যময় গাণিতিক অঙ্কের কাছে এক বিস্ময়কর শিল্প! একজন সচেতন কথাকারের কাছে তাঁর 'অভিজ্ঞতা' অবশ্যই এক মূলধন—যা লেখকের তৃতীয় নয়নের গভীর নিবিষ্টতায় বাস্তবিকই শিল্প হয়ে যায়। ব্যাঙ্কেই টাকা খাটানোর মতো একজন যথার্থ কথাকার গল্পে-উপন্যাসে তাঁর 'অভিজ্ঞতা'কে খাটান তাঁর গড়ে-তোলা চরিত্রকে আধার করেই। কিন্তু শুধুমাত্র 'অভিজ্ঞতা' আর 'চরিত্র' মিলে একজন কথাকারের লক্ষ্য শিল্পের প্রতিমা নির্মাণে অক্ষম যেমন, একজন গায়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি নিখুঁতভাবে বোঝেন, প্রয়োগও করতে পারেন, কিন্তু তিনিই যে একজন শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হবেনই, এমন আগাম প্রতিশ্রুতি কেউই দিতে পারবে না। আসলে কি কথাকার, কবি, নাট্যকার, গায়ক—সকলের ক্ষেত্রেই যেটা প্রধান, তা হ'ল, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের প্রকাশ-মাধ্যমে প্রমাণ রাখবেন স্ব-স্বাতন্ত্র্যের সীমা অতিশায়ী কল্পনাশক্তি।

কথাগুলি মনে হল সৈয়দ মুজতবা আলীব গল্পগুলি নিবিষ্ট হয়ে পড়ে ফেলার পর। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, মুজতবা আলী একজন পড়ুয়া পণ্ডিত, ভ্রমণে বোহেমিয়ান, কিন্তু যথার্থ অর্থেই একজন রসিক শিল্পী, একজন কথাকার, এখানে ছোটগল্প-রচয়িতা। সত্যিকারের একজন শিল্পী ছিলেন, তা না হলে একদা 'পঞ্চতন্ত্রে'র মত রমণীয় রচনার গ্রন্থ, 'দেশে-বিদেশে'র মত ভ্রমণ-রসে দীপ্ত অভিনব স্বাদু রচনাগুলি লিখতে পারতেন না। আর এই সূত্রেই তাঁর ছোটগল্পগুলির কথা মনে পড়ে। মুজতবা আলীর জীবনে অভিজ্ঞতা ছিল অফুরন্ত, পরিচয় ঘটেছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সব পুরুষ-রমণীর সঙ্গে, দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম শিল্পের

টানে অন্তরীণ শিল্পী-আত্মার অভিমুখিন, তাই তাঁর 'চরিত্র' আর 'অভিজ্ঞতা' মিলে মিশে তেল-জল হযনি, হয়েছে ব্যাঙ্কের চক্রবৃদ্ধি-হারের স্থায়ী আমানত।

মুজতবা আলীর গল্পের বাহির ও ভিতর—দুই স্বভাবের ও অস্তিত্বের শিল্পস্বাদ গ্রহণে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভাবনা পাঠক মনে আসেই। যে-সব কথাকারের দেখা বিষয় চোখের নীচে মনেই সীমা পেয়ে যায়, সেখানেই যাঁদের শিল্পেব যাবতীয় কলা-কৌশলের অভিনবত্ব, মুজতবা আলী তাঁদেব দলেব কথাকাব নন। তিনি বাইরেব অভিজ্ঞতাকে চোখের নীচের মন থেকে শিল্পী মনের অধিতল আত্মায় আসন করে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, পরিচিত মানুষজন হয়েছে সেই অধিতল আত্মার অধিবাসী। এর মূলে তাঁব ব্যক্তিজীবন-স্বভাব ও শিল্পী মনেব বীক্ষণ এক।

ব্যক্তিজীবনে মুজতবা আলী জন্মান্তরীণ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই বুঝিবা এক রোমাঞ্চকব অস্থিব জীবন কাটিয়েছেন আমৃত্যু। ফলে প্রধানত এবং প্রথমত একজন ব্রাত্য-কথাকার হয়ে ওঠার মত মানসিকতায় বাধা আসে। তাঁব জন্মটুকুই যা করিমগঞ্জ শহবে, বাল্য, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলি কাটে একে একে সুনামগঞ্জের পাঠশালায়, মৌলবীবাজার ও সিলেটেব সরকাবী হাইস্কুলে। এরপব মাত্র সতের বছর বয়সে সেই যে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন, তারপর থেকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তিনি একটানা বলা যায, বিশ্বপরিভ্রমণ করেছেন। আলিগড়, কাবুল, বার্লিন, বন, কায়রো, বরোদা, জার্মানী, বগুড়া, কলকাতা, ঢাকা, দিল্লী, কটক, পাটনা, ইংলণ্ড সর্বশেষ আবার কলকাতা ও ঢাকা— পেশা ও নেশায় এইসব ভ্রমণের মধ্যেই তাঁর অভিজ্ঞতা সোনার ভাঁড়ার ভর্তি করে দেয়।

এতো গেল তাঁর ব্যক্তিজীবনেবী মূল্যবান সঞ্চয়ের উৎস-সংবাদ। কিন্তু তাঁর মধ্যে মিশেছে নিজ পরিবেশের দায়-দায়িত্ব ও পূর্বসুরী গল্পকারদের ঐতিহ্যেব কোন কোন ধারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবেশ ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তখন অনেক মন্থর—যদিও ভিতরে ভিতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-শুরুর অস্ত্র শাণিত হচ্ছে ঝকমকে দীপ্তিতে। বহির্বিশ্বে নানা ঐতিহাসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া অস্থির। এই পরিবেশে বসে যুবক মুজতবা আলী মানুষকে দেখেছেন, ভেবেছেন লিখতে বসে—কি দেশী, কি বিদেশী—সমস্ত বিষয়ের মানুষ, অভিজ্ঞতাকে

করেছেন ঘবোয়া। প্রকাশভঙ্গি নিয়েছেন বৈঠকী। যেন বা জটিল পরিবেশ থেকে বিপরীত স্বভাবে গল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণকে করেছেন আলাপচারীর ঘরোয়া সভা। যিনি স্বভাবেই আলাপচারী হন, তাঁর কাছে আলাপচারিতা একটা নেশার মতো হয়ে ওঠে একসময়ে। প্রায় সে সময়ে সারা পৃথিবী চযে বেড়ানো মুজতবা আলীর বহু মানুষের মধ্যে এমন আলাপচারী হওয়া ছাড়া বোধহয় অন্য পথ ছিল না।

পেশা এবং নেশাতেও যিনি শিক্ষাবিদ্, সেরকম মানুষ মুজতবা আলী। তাঁব আলাপচারিতায় আছে বৈঠকী ঢঙ্। বাংলাদেশে উনিশ শতকের পরিবেশে গৃহী মানুযের দৈনন্দিন জীবনে বৈঠকখানা বড় ভূমিকা নিত। এইসব বৈঠকখানায় বসত গল্পের আসর, আড্ডার উত্তপ্ত উনুনে জমাট কড়াপাকের বসের ভিয়েন। সেখান থেকেই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পে গালগল্পের, বৈঠকী মেজাজেব সোরগোল তোলাব গল্পের উৎসমুখ খুলে দেন। বিশ শতকে ববীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থেকে প্রথম চৌধুরী তাঁর 'চারইয়ারী কথা'-য় বৈঠকী গল্পের আর এক পালাবদলের সংকেত ধরিয়ে দেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব 'পঞ্চশব' নামের প্রেমেব উপন্যাসে বৈঠকী রীতির দিক অস্বীকার করতে পারি না। সৈযদ মুজতবা আলী এই রীতির ধারায আরও ভিন্নস্বাদী এক মাত্রা যোগ করেন। মূলত হাস্যবসের পরিবেশক হয়েও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের লেখার মধ্যেও বৈঠকী বলার রীতিব একটা ক্ষীণ মেজাজ ধরা পড়ে।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথেব গল্প-বলায় ছিল যেমন আবেগেব আজব স্বভাব ও উতরোল, 'হিউমার,' তেমনি 'শ্লেষ' 'ব্যঙ্গ'ও। বৈঠকখানার গালগল্প বলার ভঙ্গী তিনি ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। প্রথম চৌধুরী বীরবলী ঢঙে যে আড্ডাবাজের নেশার কথা বলেছেন, তাতে গল্প আছে, ঘরোয়া অন্তরঙ্গতা আছে, আছে মনন। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমের গল্প বলেছেন প্রেমিকের আলাপ-চারিতায়। মুজতবা আলীর বলার রীতির স্বাতন্ত্র্য অন্য মাত্রায়। তা হলো, তিনি বীরবলী রীতির বুদ্ধি ও মননকে নিয়ে তার মধ্যে অভিজ্ঞতার ও চরিত্রের জীবন্ত স্বভাবের মিশেল দিযেছেন। তাই মুজতবা আলীর গল্প আলোচনার আগে তাঁর মানসিকতায় যে-পূর্ব ঐতিহ্যের শিল্পভাবনার একটা রীতি সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে এটা নিশ্চয়ই মনে রাখা জরুরী। স্বাদে-গন্ধে তাঁর গল্প বৈঠকখানার হুল্লোড়ে বৈঠকী পরিবেশে বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকরস আর তরতাজা অভিজ্ঞতা ও মানব-সংসর্গের মায়াবী ফল সামনে প্রত্যক্ষ করায়।

// দুই //

ব্যস্ত ও বিস্তৃত জীবনের অভিজ্ঞতা, পেশাকে নেশার মত্ততায় গ্রহণ করা ও বিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে নিগূঢ় অভিজ্ঞতা—তা দিয়েই সৈয়দ মুজতবা আলীর কথাকাব সত্তা তথা গল্প ও উপন্যাসের মাটি নির্মিত হয়ে যায়। তিনি রচনা করেন 'অবিশ্বাস্য', 'শবনমে'র মত উপন্যাস, 'টুমি মেম', 'চাচা-কাহিনী'র মত গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি। 'অভিজ্ঞতা' হয় তাঁর সৃজনশীল মনের মনোরম খাদ্য। তিনি পড়াশুনায়, পড়ানোয়, আড্ডায় রীতিমত বুদ্ধিকে করেছেন মূল ভিত্তি। এর সঙ্গে সহজেই উঠে-আসা কৌতুক-রস গল্পে দিয়েছে লক্ষণীয় লাবণ্য। বুদ্ধি ও মননের রসে যে মনের মাটি সিক্ত, তাতেই জন্ম নেওয়া-গাছে আড্ডা ও আলাপের ফুল ফুটেছে। তাঁর গল্পের যে রীতি, তা বৈঠকখানার চিরাচরিত হাসি-ঠাট্টায় মেশানো গল্প-বলা নয়, তা অভিজ্ঞতা আর চেনা মানুষগুলিকে নিয়ে নিবিষ্ট হযে গল্প-লেখা ও তা শোনানো। বিষয়ের গভীরে যে মনন তা মানবতাকে বোঝায়, বিষয়ের চারপাশে যে স্নিগ্ধ কৌতুকের বলয়, তা পাঠকের হৃদয়কে টানে, কাছের করে। ছোটগল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী পাঠকের আপনজন।

মুজতবা আলীর ছোটগল্প তাঁরই প্রসারিত ছায়া। যেভাবেই হোক, সবসময়েই কায়ার থেকে ছায়া হয বড়ো, বিস্তৃত। শান্তিনিকেতনের সেই ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র শেষ জীবনে তাঁর সমস্ত লেখায যে ছায়াব প্রসার ঘটিয়েছেন, তা অভিনব, নতুন ব্যক্তিত্বের এক স্থায়ী মূর্তিই যেন বা রচনা করে দেয়। মুষ্টিমেয় কিছু গল্প লিখে গেছেন মুজতবা আলী, কিন্তু সেগুলির মধ্যে তিনি একাই একটি রাজ্য তৈরী করেছেন, আবার একাই তিনি তাঁর রাজা।

অর্থাৎ ছোটগল্পে একমাত্র স্ব-ক্ষেত্রেই তাঁর কিছুকাল বিচরণ। তাঁর গল্প গ্রন্থ মোট দুটি— 'টুনি মেম' ও 'চাচাকাহিনী'। 'টুনি মেম' গ্রন্থের দু'টি অংশ—প্রথম অংশ গ্রন্থের নামে বড়গল্প 'টুনি মেম'। এই অংশে নাম-গল্পটি ছাড়া আর আছে 'একপুরুষ' নামের আর একটি বড় গল্প। দ্বিতীয় অংশের নাম 'শেষচিন্তা'। এই অংশ রম্য রচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সংকলন। 'চাচাকাহিনী'তে আছে মোট এগারোটি গল্প। প্রথম পাঁচটি গল্প হল—স্বয়ংবরা, কর্ণেল, মা-জননী, অর্থহীনা, বেল-তলাতে দু'দুবার। এগুলির প্রত্যেকটির কথক হ'ল লেখক কল্পিত, অনেকটা লেখকের প্রতিনিধির 'চাচা' চরিত্র। বাকি ছ'টি গল্প হল—কাফে-দে-জেনি, বিধবা

বিবাহ, রাক্ষসী, পাদটীকা, পুনশ্চ, বেঁচে থাকো, সর্দিকাশি। এগুলির বক্তা চাচা নয়, লেখক স্বয়ং।

আগেই বলেছি, মুজতবা আলীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি আছে, আছে নানা মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অসীম কৌতূহল। তাই তাঁর গল্পগুলি মূলত আধার করেছে বিচিত্র সব চবিত্রকেই। গল্পের যে 'থীম', তাকে রূপ দিয়েছে চরিত্রই কাহিনী ও ঘটনার হাত ধরে। 'টুনি মেম' গল্পের প্রধান দু'টি চরিত্র আইরিশ ম্যান পেট্রিক ও' হারা সাহেব আর টুনি মেম। মূলত প্রেমের গল্প, কিন্তু লেখক একে এক অভিনব আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। সে আঙ্গিক হল রহস্য-রোমাঞ্চের রুদ্ধশ্বাস এক জট। প্রধান দুটি চরিত্রের সঙ্গে একজন পুলিশ এস পি সাহেব লেখকের বন্ধু খান-এর যোগসূত্র আর এক মাত্রা দেয়। গল্পটি নিবিষ্ট পাঠক পড়তে বসার সঙ্গে সঙ্গে যেন গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-লেখক ও তাঁর ট্রেনে-হঠাৎ-দেখা হওয়া তিরিশ বছর আগের পাঠশালার বন্ধু খানের পাশে যাত্রী হয়ে যায়। টুনিমেমের গল্প বলেছে খান, লেখক সেখানে একজন সাহিত্যিক শ্রোতামাত্র!

এমন বড় গল্পের দু'টি দিক লক্ষ্য করার মত। একদিকে গল্পটি তৈরি করার মধ্যেকার রুদ্ধশ্বাস রহস্যময়তার আবহ, আর একদিকে গভীর ভালোবাসার দুই পুরুষ-রমণীর চরিত্র-ব্যক্তিত্বের উদ্ভাস। গল্পটি পড়তে পড়তেই বোঝা যায়, মুজতবা আলীর একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এরা আঁকা। গল্পের শুরুতেই এমন একটা পরিবেশ তৈরী হতে থাকে, যা গল্প-নিহিত চরিত্র ও তার পরিণামী সিদ্ধান্ত ঠিকমত খাপ খেয়ে যায়। শিয়ালদা ও বর্ধমানের মধ্যে একজায়গায় সিগন্যালের গাড়ি যাওয়ার নির্দেশ না থাকায় ট্রেন দাঁড়িয়ে গেলে দুজনেরই চোখে পড়ে মিশকালো, নিটোল দেহ, সুডৌল উন্মুক্ত বুকের এক সাঁওতাল রমণী। এদের প্রসঙ্গ থেকেই বক্তা খান তার আক্রগড়ে থাকাকালীন সেই গয়ার কালো পাথরে কোঁদা মূর্তি টুনি মেমের কথা আনে।

আসে পেট্রিক ও' হারা সাহেবের প্রসঙ্গ। সে সময়ে সাহেবটি পাগলের মতে ভালোবাসত রক্ষিতা, বিবাহিতা টুনি মেমকে। তার স্বামী বিহারী মজুর রামভজন একসময়ে খুন হয়ে যায়। টুনি মেমকে স্বজাতীয়দের কাছে সম্মান দিতে পেট্রিক ও হারা শেষপর্যন্ত জেলে যায়। আর অসহায় টুনি মেম সাহেবের সন্তান গর্ভে নিে প্রায় রাণীর মতো মর্যাদা থেকে বাবুর্চির হাত ঘুরে নেমে আসে চরমতম দারিদ্র্যের

অবহেলাব জীবনে। কিন্তু এই জীবনেও টুনি মেম যে তার গভীর-গোপন ভালোবাসায়, কী পৌরুষে অভিমানী, আভিজাত্যে ও ব্যক্তিত্বে কঠিন, তার অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন লেখক। খান রামভজনের হত্যাকারী খুঁজতে গিয়েছিল, কিন্তু গল্পের শেষে সেই প্রসঙ্গটি এমন সুক্ষ্ম রহস্যের সুতোয ধরেছেন যেখানে পাঠক রোমাঞ্চের শিহরণ, রহস্যটুকু নিয়ে অতৃপ্ত থাকতে বাধ্য হয়। টুনি মেমের পরিণতি চিত্রে রামভজন প্রসঙ্গ অপ্রধান হয়ে যায়। টুনি মেমের বাচ্চা দু'টির অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রসঙ্গ এনে লেখকের পরিণামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টিব প্রয়াস শিল্পরসে ভিন্নস্বাদী।

টুনি মেম মূলত মজুরের বড়, অশিক্ষিত। সে দরিদ্র, খেটে-খাওয়া মানুষের বউ। সাধারণত তার মধ্যে বড় জীবন, বড় আদর্শ অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু টুনিমেমের মধ্যে আছে চিরকালের মানবিক নারীধর্মের এক অবিনশ্বর প্রেমার্তি। তার ভালোবাসায়, আকাঙ্ক্ষায় আছে অভিমান, আভিজাত্য—যা তাকে সমাজের সমস্ত স্তর থেকে তুলে আনে প্রেম-পরিশীলিত নারীত্বে। এই বড় প্রেমের কথাকে মুজতবা আলী এক অদ্ভুত বহস্য-রোমাঞ্চ মেশানো মুক্তোর মতো মূল্যবান প্রেম-বৈভব দান কবেছেন। ট্রেনে দুই বন্ধুর গল্পে আছে বৈঠকী আলাপচারিতার ভঙ্গি , আছে আড্ডাব মীড়-গমক। একসঙ্গে 'হিউমার', 'উইট', 'ফান্', 'স্যাটায়াব' এসব মিলেমিশে যেন বা তাঁব বচনারীতি ও গদ্যভাষাব নামাবলী রচনা করেছে। 'টুনি মেম' গল্পেব দুই বন্ধুব সংলাপ-বিনিময়ে এসবের পবিচয় আছে। যেমন খান পুলিশেব কাছে আদালতের প্রমাণ চাওযার বিষয়কে অডিটের প্রমাণ প্রসঙ্গে বলেছে :

'পেনশন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কী? না হলে যে মার্চ মাসের পেনশনটা পাবেন না।'

আড্ডার বৈশিষ্ট্যেই লেখক-কথক দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রীর বিদেশী ভিজিটরকে ছোট এক শিশুর খুলি দেখানোর প্রসঙ্গ তুলে বলেন :

'মন্ত্রীটি জানান—ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি। ভিজিটর অবাক হয়ে শুধালে, তাঁর খুলি এত ছোট ছিল? মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এটা তাঁর শিশু বয়সের খুলি।

দু'টো কিংবা ছ'টা খুলি যখন হ'তে পারে, তখন দু'টো বা ছ'টা জীবন হবে না কেন?'

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'একপুরুষ' নামের গল্পটি 'টুনি মেমে'র থেকে ভিন্ন জাতের গল্প। যদিও এ গল্পের শেষে আছে প্রেমের আস্বাদ, তবু এ গল্পের ইতিহাস পটভূমি, ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনা অন্য স্বাদ দেয় পাঠকদের। গল্পটির প্রেক্ষিত ১৮৫৭-এর শেষ দিকের বাংলাদেশ। নায়ক সেই বিদ্রোহী সিপাহীদের একজন, যে এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মানসবদার গুলবাহাদুর খান। এই বিদ্রোহীটি পালিয়ে এসে বর্ধমানের কাছে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সেজে বাগ্‌দীদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। এই গুলবাহাদুরকে কেন্দ্র করেই গল্পে আসে শিবু মণ্ডল, তার ছ'বছরের ছেলে আনন্দী, বাতাসী, বুড়ি, ঝিঙে, আর এক সিপাহী ঘোষাল ইত্যাদি। গল্পের সব শেষে আসে নায়িকা-কন্যা মোতি।

'একপুরুষ' এক অভিনব-আস্বাদেব ইতিহাস-বসের গল্প। একে অনায়াসেই এক নতুন ধবনের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রূপ দেওয়া যেতো, কিন্তু লেখক দুর্বল কৈফিযৎ দিয়ে তিনপুরুষের কাহিনীকে এক পুরুষেব কথায় এনে আচমকা যতি টেনে দিয়েছেন। এই 'একপুরুষ' প্রসঙ্গটি উপন্যাস হয়নি, হয়েছে ইতিহাস-ভিত্তিক বড গল্প। কিন্তু বড় গল্পকাবের পাঠক হিসাবে আমরা একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিরকালীন স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এ গল্পেও সেই অভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্রই বড় দায়-দায়িত্ব বহন করেছে শিল্পেব— ছোটগল্পের। এ গল্পে লেখকের নির্মোহ স্বভাব ও নিবাসক্ত মনেই এসেছে চবিত্র, তার গায়ে-গায়ে ঘটনা, চিত্রল হয়েছে প্রকৃতি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শিবু মোড়ল যখন দামোদরেব ওপারে এক সিপাহীর আত্মগোপনের খবব দিতে যায়, তখনকাব বর্ণনা লেখকের ভাষায় এই রকম ঃ

গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পাবলেন না। তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, কোন্ গ্রামে?

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে, যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই, শহরও নেই'।

এমন মৃত্যু বানিয়ে একজন গল্পকারের সংযম, সংক্ষিপ্তিবোধ ও নিরাসক্তি মুজতবা আলীর গল্পকার সত্তারই বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। গল্পটির কাহিনী-বৃত্তে

যে ইতিহাসের ঘননিবিড় জড়িয়ে থেকে গড়িয়ে যাওয়ার সাবলীল স্বভাব তা অবশ্যই অভিনব রসাস্বাদ দেয়। তাব ব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্ত। এতে এই জাতীয় ঐতিহাসিক বড়গল্পে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। 'টুনি মেম' গল্পে নায়িকার মনস্তত্ত্বের চিত্রে মুজতবা আলী যেমন একজন সার্থক রূপকার, 'একপুরুষে'র নায়ক গুলবাহাদুরের মনস্তত্ত্বকে নানা কোণ থেকে তুলে ধরতে তিনি সমান পারঙ্গম। তাঁর বর্তমানের অনুষঙ্গে অতীত ইতিহাসের যোগসূত্র ভাবনা, কখনো 'এ্যানালজি'র মতো, কখনো বা সেই অতীতকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমান্তরালে প্রয়োগ-স্বভাব— গোটা গল্পে ইতিহাসকে প্রেক্ষিত ও কাহিনীবৃত্তে গভীর-নিবিড় করেছে। ইতিহাস এসেছে নিখুঁত শিল্পের অভিনব কৌশলে স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র-ভাবনায়, লেখকের গতানুগতিক বর্ণনায় কখনোই নয়।

তৃতীয় নয়নে দেখা মানুষের একেবারে অজ্ঞাত অথচ সত্য মনোলোককে প্রকাশ করাই হল একজন কথাকার তথা গল্পকারের ধনুর্ধর নিক্ষিপ্ত ধনুকের তীরেরই মতো লক্ষ্য। কিন্তু গল্পকার যা কিছু প্রকাশ করবেন, তার সঙ্গে আরও না-জানার রহস্য সবসময়েই থেকে যাবে। মুজতবা আলী আড্ডা রসিক এবং মূল অর্থে বৈঠকী আড্ডাব বসের ভিয়েন চাপানোয একজন কৃতী শিল্পী-রসুই এবং সেকারণেই চরিত্রের মনোলোক উদঘাটনে একজন যথেষ্ট ক্ষমতাবান বুদ্ধি-সচেতন ব্যক্তিত্বও। 'একপুরুষ' গল্পের প্রায়-নায়িকা মোতির অন্তঃস্বভাবের এমন চিত্র উপহার দিয়েছেন নাযক গুলবাহাদুবের এক নৈরাশ্যময় জিজ্ঞাসার উত্তরে ঃ

'মোতি চিন্তা না কবেই বললে, নিজেই জানিনে কি চাই। কখনো ইচ্ছে কবে মা হয়ে ছেলে নিতে, কখনো বা স্বামী পেতে ইচ্ছে কবে, আর কখনো মনে হয় দুচ্ছাই, এসব দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা-ঠাকুরাণী কেষ্ট-মুরারিকে পেয়েছিলেন। রসের সাযরে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীব ওব শবীরে মিশে যাবে।'

'একপুরুষ' গল্পের একেবারে শেষ দিকে মতির মানস-চিত্র লেখকের লেখনীতে এইরকম :

'মোতি গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল। বললে, মতলব কিছু নয় গোসাঁই। আমি ভেবেছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হবো। এই আমার শরীর,

এই আমার দিল্। ওগুলো যখন কোন কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙেই দেখি, কি হয়। তা আর হলো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।'

মোতি চরিত্রের মনস্তত্ত্বের যে জটিল রূপ, তা চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের মাপে ও স্বভাবে অনবদ্য। মোতি সাধারণ প্রেমিকা নয়, সে নিজেকে চেনে, পুরুষের কাছে নিজের শরীর দিয়ে মনকে যাচাই করার কথা ভাবে। তার অস্তিত্ব বাঁচার উপায়কে খুঁজে বেড়ায়। শরীর আর মনের যৌথ দায়িত্বে মোতির মনস্তত্ত্বের পূর্ণবলয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 'টুনিমেম'-এব মতো নারীর কথাও। নারী চরিত্রকে জটিল মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব ধরে আঁকতে যে মুজতবা আলী কত ক্ষমতাবান টুনিমেম-এর শেষ পরিণামী-স্বভাবে তার প্রমাণ :

'...সেই যে পুলিশ দেখে টুনিমেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুলল না। ঝাড়া দু'টি ঘণ্টা পুলিশ সাহেব তাঁর শেষ চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরুলেন সে কুঁড়ে ঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনিমেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বলেনি'।

'টুনি..একবার আমার দিকে এক লহমাব তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না, শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি'।

মূলত প্রেমের গল্পের মধ্যে গোয়েন্দা রসের সঙ্গে এমন মনস্তত্ত্বের বিস্ময়বসের জটিল-যৌগিক মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা ছোটগল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী নতুন স্বাদে ও আকর্ষণে আমাদের মত পাঠকদের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন স্থায়ী অধিকার দাবি করেই!

'চাচা কাহিনী'ব গল্পগুলিতে প্রধান হযেছে বিচিত্র সব নারী চরিত্র। বচনাগুলির ঘটনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসময়বর্তী। এদের প্রেক্ষিত বাংলাদেশ নয়, সুদূর বার্লিন, আর গল্পের মানুষগুলিও সব বাঙালী নয়, বাঙালীদের সঙ্গে কস্‌মোপলিটান স্বভাবে একাধিক অ-ভারতীয়দের সম্মিলনও চোখে পড়ে। গ্রন্থের মোট ছটি গল্পের মধ্যে নায়ক উত্তমপুরুষের ব্যক্তিত্বে কখনোই লেখক নন, লেখকের এক কল্পিত ব্যক্তিত্ব 'চাচা'। গল্পগুলিতে অন্তঃশীল আছে বৈঠকী গল্পের মেজাজ। বৈঠকী গল্পের সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, একাধিক বক্তা প্রতি-বক্তার সংলাপে আসর জমিয়ে তোলা, আড্ডার মেজাজে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে

বারবার যাতায়াত, উতরোল ও উচ্চকণ্ঠ কৌতুকের পরিবেশ রচনার মাঝে মাঝে একজন আড্ডার প্রধান সভ্য কাহিনী-সূত্র ধরে সমবেত অন্য সভ্যদের নিবিষ্ট করে রাখার মতো একটি কাহিনী বানানোর চেষ্টা, সেই সঙ্গে যে কোন জমাটি গল্পকে একটি আজগুবি বা বাস্তব সত্যে নিয়ে এসে পরিণামী ব্যঞ্জনা দান—এমন সব দিক।

মুজতবা আলীর 'চাচাকাহিনী'র গল্পগুলিতে প্রবাসী বাঙালীদের ভিড়। লেডি কিলার অর্থাৎ নটবর পুলিন সরকার, আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া গোলাম মৌলা যাঁকে স্বয়ং মুজতবা আলীরই বাস্তবিক ছায়া বলা যায, জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালী শ্রীধব মুখুজ্জে ('স্বয়ংবরা') সূয্যি রায় এবং স্বয়ং চাচা। 'স্বয়ম্বরা' গল্পের ধূর্ত কৌশলী রাশিয়ান সুন্দরী ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফ যে চাচাকে বিয়ের ফাঁদে ফেলতে গিয়েও শেষে ব্যর্থ হয় চাচার পরিচিত পুরুযালি হকি খেলোয়াড় ফন ব্রাখেলের চেষ্টায, 'মা-জননী' গল্পের কুমারী অবস্থায় মা হওযা নার্স সিবিলা, 'তীর্থহীনা'র যক্ষ্মা রোগে অক্ষম ও স্বামী বর্জিতা নায়িকা, 'পুনশ্চ' গল্পের দুই অংশের কাহিনীব দুই তরুণীব চরিত্ররূপ—এসবই গল্পকাব মুজতবা আলীর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেব যথোচিত শিল্পসম্মত অভিজ্ঞান। আব একটি সুলিখিত গল্প 'কর্ণেল'। এব নায়ক প্রশিয়ান বংশের জার্মান সেনা বাহিনীর প্রাক্তন কর্ণেলেব কৌলীন্য ও জাতিগত অভিমানের কঠিনচিত্ততা ও আত্মনিপীড়ন এবং 'বেলতলাতে দু' দুবার' গল্পে চাচাব সঙ্গে অস্কারেব বিচিত্র ব্যবহার—গল্পগুলির নারী চরিত্রেব অসামান্য বৈচিত্র্যেব মধ্যে পুরুষ-নাযকদেব আলাদা এক ব্যক্তিত্বের যেন স্মাবক চিহ্ন হয়ে ওঠে।

।। তিন ।।

মুজতবা আলীব ছোটগল্পেব বড় বৈশিষ্ট্য আড্ডার মধ্যেই নিটোল গল্প তৈরী হয়ে যাওয়া এবং অবলীলায়। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে তাই ঘটেছে। সমস্ত গল্পেই চাচা মধ্যমণি। নিজেকে নায়ক করে গল্পের আরম্ভ ও শেষ ঘটিয়েছে চাচা। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে যেমন হিউমার আছে, তেমনি আছে হাল্কা বিষাদ। গল্পের মধ্যে লেখক কথা নিয়ে মজার খেলা খেলেছেন একাধিক প্রসঙ্গে।

১. 'চাচা বললেন, ইয়োরোপে cold blooded খুন হয়, ভারতবর্ষে কোল্ড

ব্লাডেড বিয়ে হয়। এবং দুটোই ভেবে চিন্তে, প্ল্যান মাফিক, প্রিমিডিটেটেড্...' (স্বয়ংবরা)

২. 'বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, আপনি কোন্ দেশেব লোক। পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কাব চেঁচিয়ে শুধালো, যাচ্ছিস কোথায়। আমি বললুম, আর না বাবা। এর রাত্তিরে দু' দুবার না'।.. (বেলতলাতে দু' দুবাব)

৩. 'তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল গোঁফে চাড়া দেবার। কিন্তু গোঁফ তো আর নেই'। (একপুরুষ)

এমন সব বাক্য ও বাক্যাংশে মুজতবা আলীর গল্পে ধরা পড়ে রাজমুকুটের চাকচিক্য।

মুজতবা আলীব ছোটগল্প বিচিত্র সব চরিত্রের এ্যালবাম। এমন এক অভিজ্ঞতাব এ্যালবাম---যাব পাতায় পাতায় আঁছে জটিল মনস্তত্ত্বের আলো-আঁধাবি বহুসামযতা। আরও আছে শিল্প-প্রয়োজনে ঠিক ঠিক মাপেব প্রকৃতি-চিত্র, হিউমাব, শ্লেষ, স্যাটায়ার, আগাগোড়া উজ্জ্বল বর্ণে বিলসিত আছে অন্তরঙ্গ আলাপচারী ভঙ্গির সহজতা। 'একপুরুষ' গল্পে খোয়াই-এর চমৎকাব প্রকৃতিচিত্রকে গল্পকাব গভীরতা দিয়েছেন কিয়ামতের অর্থাৎ মহাপ্রলযেব যে বর্ণনা কোরান শবীফে আছে তাব যথোচিত প্রতিতুলনা (analogy) দিযে। মুজতবা আলীর ছোটগল্প তাঁব অন্যসব বচনার মতই বাস্তব অভিজ্ঞতায যাচাই কবা লেখক-ব্যক্তিত্বেব বিশ্বন। তাঁব ছোটগল্পে 'অভিজ্ঞতা' তাঁব অসীম, আবার অভিজ্ঞতাই তাঁর সীমা। গল্পের বিষযকে বুদ্ধি দিযে বেঁধেছেন, গল্পের প্রকরণকে বুদ্ধি দিয়েই নির্মাণ করেছেন। গল্পের প্রকরণে তিনি বিশ্বকর্মা হতে পাবেন নি, কিন্তু সচেতন কর্মিষ্ঠতার প্রমাণ রাখতে পেরেছেন। গল্পকার স্বয়ং একজন পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ্, বসিক স্বভাবে-অন্তরীণ, বৈঠকী মেজাজের স্ব-নির্বাচিত সদস্য, বুদ্ধির খেলায় বিষয়ের বল নিয়ে 'ড্রিব্ল্' করায় যথেষ্ট পারঙ্গম। তাঁর গল্প এসব থেকে বিবিক্ত নয়। বাংলা ছোটগল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী আমাদের একান্ত আপনজন নিঃসন্দেহে—তদ্ভব, তৎসম, দেশজ ও কথ্য শব্দ, ইসলামী শব্দ, বিদেশী শব্দ—এমন সবের গভীর মিশ্রণ-রূপও দেখায়, সৈয়দ মুজতবা আলীর আছে পূর্বসুরী ভারতচন্দ্রের অক্ষর-ডম্বর উত্তরাধিকার।

সৈয়দ মুজতবা আলী ও রবীন্দ্রনাথ

বারিদবরণ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যে সব মানুষ এসেছিলেন, তাঁদের জবানিতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি দু'ধরনের। ববীন্দ্রনাথ যেখানে প্রত্যক্ষগোচর—সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি কিছুটা আচ্ছন্ন—স্মৃতিচাবণে যার আস্বাদ পাঠক পরবর্তীকালেও পেতে থাকেন আব যেখানে তিনি পবোক্ষগোচব সেখানে নানান রচনায় এমনকি জীবনী রচনাতেও তিনি ওতপ্রোত জড়িত। সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনে রবীন্দ্রনাথেব উপস্থিতি এমনই দ্বিবিধ। কিন্তু দু'টি বিষয়েই কিছুবা স্বাতন্ত্র্যসম্পন্নও। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জীবন দীর্ঘ যদি হয়েছে, তবে তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে 'ভাঙিয়ে' খেয়েছেন। মুজতবার অবশ্যই গৌরব করাব মতো ববীন্দ্রসংস্পর্শ সম্পদ ছিল। কিন্তু ঐটুকুতেই তাঁব অহঙ্কাব। তাকে, ইংবেজিতে যাকে বলে encash কবা—তাতে তাঁব গভীর অরুচি ছিল। তাঁরই ভাষায়,'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ, কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এব কিছু হল না।' আমবা অবশ্য আলী সাহেবেব বিনযকে ফুৎকাবে উড়িয়ে দিতে এককাট্টা। লোকটাব কিছু যে 'হয়নি' একথা মেনে নিতে বাজি নই আমবা। তবে একথা তো হক্ কথাই যে তাব 'যেটুকু' হযেছে তাতে রবীন্দ্র-প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বোপার্জিত 'ধনে'ব একটা বৃহৎ অংশও। সেখানে তিনি একক এবং নিঃসপত্ন রাজা।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবন, আচরণ এবং বচনা—সে কবিতাই হোক্, কি গানই হোক্—তাঁকে আদ্যোপান্ত গড়ে তুলেছে। তাঁকে 'মানুষ' করে তুলেছে। এই যে নানা ভাষা নানা বিদ্যায় তাব পরম আগ্রহ এবং চরম অধিকার—সে তো রবীন্দ্রনাথের দৌলতেই। শান্তিনিকেতনে তিনি যখন পড়তে এলেন, রবীন্দ্রনাথ, জিগ্যেস করেছিলেন—'কি পড়তে চাও'?

'আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব

ভাল করে শিখতে চাই।

'তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি?

'আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

'গুরুদেব আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, এ কথা কে বলেছে?

'আমার বয়স তখন সতেরো---থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

'গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয়।

'কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।'

এই যে সম্ভব অসম্ভবে ঝাঁপিয়ে পড়া—এই শিক্ষাটা আলী সাহেব দুরস্ত করেছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে। গুরুবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গুরুই ছিলেন। কবিগুরু শব্দটির তিনি ব্যাখ্যা করতেন তাই এইভাবে---'রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু। তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালির কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবিরূপ দেখেছি অন্যভাবে।'

।। দুই ।।

সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন তাঁর জন্মভূমি সিলেটে---শ্রীহট্টে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ 'আকাঙ্ক্ষা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। আলী সাহেবের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ (জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ শহরে)। কবির বক্তৃতা তাঁর মনে গভীর ছাপ বিস্তার করে। কারও সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে প্রশ্ন ছিল—'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?' ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গেছিলেন। এর মাঝখানে দিন সাতেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। হঠাৎ সব প্রত্যাশা ছাপিয়ে কবিগুরুর চিঠি এলো আগরতলা থেকে আসমানি রঙের খামে আসমানি রঙের কাগজে। দশ বারো লাইনের চিঠি। তার

মূল কথাটি ছিল ঃ

> *'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এ কথাটার মোটামুটি অর্থ এই যে—স্বার্থই মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত যে উদগ্র কামনা তাহাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমাব পক্ষে কি করা উচিত, তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।'*

এই যে 'এতোদূর থেকে বলা সম্ভব নয়' কথাটি তাঁর মনে গেঁথে গেল, কারণ তাঁর অন্তরের শুভ-ইচ্ছা কল্যাণের পথের সন্ধানে তখন থেকেই উন্মুখ। তাই পিতা খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দর আলীর নির্দেশ সত্ত্বেও সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেযে অসহযোগ আন্দোলনাদিকে ঘিবে দেশে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করছিলেন খানবাহাদুর। সব জেনে শুনে তিনিও পুত্রকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে মনস্থির করলেন—পুত্রকে এই বাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে রাখা যাবে ভেবেই। বিশ্বভারতী তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইবে থেকে ছাত্রেরা আসতে সবে শুরু করেছেন। লাহোব থেকে মৌলানা জিযাউদ্দীন আসবাব আগেই শ্রীহট্ট থেকে এসে পৌঁছেছেন মুজতবা আলী। ১৯২১ সালেব কথা। তখনও কলেজ বিভাগ খোলা হযনি সেখানে। তাঁর পৌঁছনোর ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরহিত্যে তার ভিত্তি স্থাপন হয। এই প্রসঙ্গে আলীসাহেবেব স্মৃতিচারণার অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

> *বিশ্বভারতীতে তখন জন দশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমাব গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।*

এই 'বাইরের ছাত্রটি' অবিলম্বে 'ভিতরের মানুষ' হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়েন শেলি, কিট্‌স্ আর 'বলাকা'। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পঠন-পাঠনেব মধ্যে বিদ্যাভবনে নতুন ধারার সূত্রপাত হলো। বগ্‌দানোফ নামে এক রুশ পণ্ডিত এসে এর সূত্রপাত করলেন। তিনি একই সঙ্গে পার্সি এবং ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইংরেজি আর আরবিতেও দুরস্ত্। এসেই তিনি বিশ্বভারতীতে ইস্‌লামিক সংস্কৃতি

চর্চার ব্যবস্থা করলেন। জিয়াউদ্দিন, মুজতবা আলী প্রমুখেরা তাঁব ছাত্র হলেন। ধীরে ধীরে 'অনেক কিছু শেখা'র আয়োজন বিস্তৃততর হতে থাকল। এর পরে এখানে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখানোর জন্য আসেন একদা সুইস-ফরাসী স্কুলের শিক্ষক ফার্দিনন্দ বেনোয়া। ১৯২৭ সালে তিনি আশ্রম ত্যাগ করে কাবুলে কাজ নিয়ে চলে যান। এই সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলীও কাবুলে চলে যান। চলে যাবার আগে একটা দামী ক্যামেরায় গুরুদেবের ছবি তোলার পর তিনি নীরবে কিছু বলতে চাইলেন ঃ

> *ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, কি রে কিছু বলবি নাকি?*
>
> *আমি বললুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন। তিনি ক্লাসে যে-রকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেই বকমভাবে বললেন, বল, বল, ভয় কি?*
>
> *আমি বললুম, এই যে আপনি বললেন, আপনাব সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তবফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।*
>
> *গুরুদেব বললেন, সে কি আমি জানিনে বে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদেব কাছে আমার সামর্থ্যহীনতাব কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।*
>
> *মনে মনে গুরুদেব খুশি হয়েছেন।*

একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে মুজতবা বিশ্বভারতীর স্নাতক হন। তিনি ও বাচু ভাই ছিলেন এখানের প্রথমবাবের স্নাতক।

।। তিন ।।

এই রকম একটা খুশি, এই রকম একটা জীবনায়নের পরিবেশই ছিল তখনকার শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন তো কোনও আলাদা সত্তা ছিল না। তাঁরই মতো প্রাণের অজস্র প্রাচুর্য এখানে। এখানে রবীন্দ্রনাথ আর কি করে

গেছেন জানি না, প্রাণপ্রকাশের অজস্র আলো-বাতাস এখানে সঞ্চারিত করে রেখেছিলেন—সেখানে আড়ার মেজাজটি ছিল একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত এবং মেজাজী। মেজাজ আছে এই অর্থেই মেজাজী। মজলিসি। কতো মহানুভব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর যৌবনের মহৎ সূচনায়। সিলভাঁ লেভি, তুচ্চি, উইনটারনিজ, কলিন্স, লেজনি, বেনোযা, বগ্‌দানোফ, স্টেনকোনো প্রভৃতি বিদেশী গুণীজন। বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, নন্দলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথেরা তো আছেনই। আছেন প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সুহৃদগণ। এবং সব ছাপিয়ে আড্ডা-রাজচক্রবর্তী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একদিকে জ্ঞানাহরণ ও পণ্ডিতসঙ্গ, অন্যদিকে নাটকে-গানে-নাচে এক ঋদ্ধ পরিমণ্ডলে বাসের, শ্বাসের সমৃদ্ধ আযোজন। প্রাণরসের অজস্র উৎসার। এখানে যদি কেউ পূর্ণ মানুষ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তো তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে? মুজতবার জীবনে তার রবীন্দ্রনাথের মতোই শান্তিনিকেতন এক অনিবার্য অধিষ্ঠান। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কাবুলে চলে গেছিলেন আলী সাহেব 'ইউরোপে যাওয়ার জন্য অর্থসংস্থান করতে।' বিশ্বভারতীতে শিখেছিলেন একই সঙ্গে ফার্সী আর ফরাসী। আরও শিখেছিলেন জার্মানি। একমাত্র বিশ্বভারতীতেই তখন এই সুযোগ ছিল। আর তারই সুবাদে কাবুলে চাকরি।

চাকরিতে যোগদানের সময় মাইনে দু'শো টাকা। কিন্তু যেই কর্তৃপক্ষ জানতে পারলেন তাঁর জর্মন ভাষাও জানা আছে। অমনি, মুজতবার ভাষায়—'মাইনে দাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল'। কিন্তু তাতে একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল—সহকর্মীরা ক্ষেপে গেলেন। আর তাঁদের প্রতিবাদের যে উত্তরটা কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন সেটাই ছিল তাঁদের তুরুপের তাস। 'গপ্পো'টা তবে আলী সাহেবের ভাষাতেই শুনুন ঃ

> *'পাঞ্জাবী ভাযারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজীরে মওয়ারিফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিযে ধরনা দিযে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'আনরেকগনাইজড্‌' বিদ্যালযের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালযের বি. এ; এম. এ। আমাদের মাইনে শ-দেড়শো; তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায।*
>
> *শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারি ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফারসীতে।*

--'জানো বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কি বললেন?'
খানিকক্ষণ চুপ করে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন— 'বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদেব ডিগ্রিতে দস্তখত বয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবেব। তাকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন---আমাদেব ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীব সনদে আছে ববীন্দ্রনাথের দস্তখত,—সেই ববীন্দ্রনাথ যিনি সমগ্র প্রাচোব মুখ উজ্জ্বল করেছেন।'

।। চার ।।

স্বভাবতই ববীন্দ্রনাথেব স্মৃতি অন্তঃপব মুজতবাব জীবনে নিত্য স্মবণযোগ্য প্রেবণা হযে দাঁড়িয়েছিল। যাবা তাঁর 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' বইটি পড়েছেন তাঁবা সবিশেষ তথ্যাদি অবগত আছেন। তবে যে সব 'বাওযা' (মুজতবাবই ভাষা) সেগুলোর সঙ্গে পবিচিত নন, তাঁদেব উদ্দেশ্যে তা থেকে দুচাবটি কথা নিবেদন কবি।

মুজতবাব পবম গর্ব ছিল---তিনি 'ববীন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন'; তাঁব সঙ্গে তাঁব সাক্ষাৎ পবিচয় ছিল। তাই যখন দূরে গেছেন এই পরিচযটা তাঁব সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালযে পডতে গেছেন এবং পথ ভুলে 'ফনেটিক ইনস্টিট্যুটে'ব বক্তৃতা ঘবে উপস্থিত হয়ে সবাব সঙ্গে আসনে বসেছেন। হঠাৎ আলো নিবিয়ে দেওযা হল। ম্যাজিক লণ্ঠনে ছবি ফেলা হল। পর্দায় ভেসে উঠল ববীন্দ্রনাথের ছবি আর কণ্ঠস্বর—'Through ages India has sent her voice' আবার যখন আলো জ্বলল—অধ্যাপক তখন শ্রোতাদের বলছেন—'এমন গলা, ঠিক জাযগায জোব দিয়ে অর্থ প্রকাশ কবাব এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনো "বট"কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথেব কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতর অভিব্যক্তি।' সেদিন সন্ধ্যায এই অনাহূত অতিথির বুক গর্বে ভরে উঠেছিল। বহু ছাত্রছাত্রী সেদিন ক্লাসে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন।

এমনি কবেই জর্মনির মারবুর্গ শহরে এক বিশাল জনসভায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মুজতবা আলী সাহেব যেদিন জনতার মাঝেই গুরুদেবকে প্রণাম

করেছিলেন—সেও এক অদ্ভুত অনুভূতি। তারপর রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করে বসেছেন, তাঁব বক্তৃতা মুজতবার কেমন লেগেছে। স্বভাবতই এবং সঙ্গতভাবেই তিনি কোনও উত্তর দেননি। যেখানে রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন, পরদিন সেখানে গিয়ে হাজির হতেই গুরুদেব বলেছিলেন—'(অমিয় চক্রবর্তীকে) একে ভালো করে খাইয়ে দাও।' এমনই সব অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সাক্ষী তিনি।

১৯৩৯ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মতো দেখেন। দেখা হতেই তাকিয়ে বললেন, লোকটি যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস?' তখন তিনি ববোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র কে কোথায় আছেন, কি করছেন—সে সব খবর খুব বাখেন ববীন্দ্রনাথ। বরোদার মহারাজা সসম্মানে তাঁকে রেখেছেন শুনে তিনি বললেন—'তোদের যখন বাজা মহারাজারা ডেকে নিয়ে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়, আমার কী আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে-বিদেশে কৃতী হয়েছে।'

এবপরে যে-কথা বললেন, তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই বলা সম্ভব—

> *'তা যাক্। বলতে পাবিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে কবে?*
>
> *আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানেব বাণী নিয়ে, অথাব শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে কবে?*
>
> *হা, হা কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনেব দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুবমাব কবে একাকার কবে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আব কতদিন এবকম আলাদা হয়ে থাকবে।*

।। পাঁচ ।।

এই রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেও মুজতবাব কাছে বেঁচে ছিলেন নানা অনুষঙ্গে। ববীন্দ্রনাথকে তিনি চোখেব সামনে দেখেছেন। তাঁর অমানুষিক কর্মক্ষমতা ও অপরিসীম জ্ঞান-তৃষ্ণা তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। মুজতবা তাঁর মধ্যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সমাহৃত হতে দেখেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন।' কতো রসপূর্ণ গল্পের তিনি ভাণ্ডারী। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়জন বিয়োগের পর পর শোভাযাত্রার বেদনা

আলীসাহেবকেও কতবার ব্যথিত করেছে। ব্যথিত করেছে তাঁকে বুঝতে অপারগ বাঙালির দৈন্যও।

কিন্তু ভরসা আছে তাঁর রবীন্দ্রনাথের দানে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিতে তেমন বাঁধন দেখতে পাননি আলীসাহেব। তাঁর ধারণা ছিল 'মোঁপাসার গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর' রবীন্দ্রনাথের এই ঢিলে ভাবটা কেটে যায়। রবীন্দ্র কবিতার গীতরস তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বড়ো ভক্ত রবীন্দ্রনাথের গানের। সেজন্যেই তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন—'আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।' রবীন্দ্রনাথের গানের 'অখণ্ড রূপ'টিই তাঁর 'হৃদয়মন অভিভূত' করে রাখতো।

> *শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারেই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গ-ভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারবেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিটি শব্দ।*

সৈয়দ মুজতবা আলীর রবীন্দ্রানুরাগ এই নটরাজেরই অনুধ্যানকল্প।

মুজতবা আলীর বৈঠকী প্রবন্ধের হাস্যরস

মানস মজুমদার

আলী সাহেবেব 'সিনিযার এপ্রেন্‌টিস্'কে মনে আছে? আলী সাহেবেব জবানীতেই তার একটু পবিচয় দেওয়া যাক : 'গণেশ বেচারী এপ্রেন্‌টিস্, মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এব ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্‌টিসি কবেনি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে কবো না; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পবিবেদনা, আবাব চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফেব ফক্কিকাবি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবাব মিষ্টি কথায চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি কবে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তাব এপ্রেন্‌টিসিব আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আব গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করাব প্রয়োজনও বোধ কবেন না।'

এবার সংক্ষেপে বলা যাক। সেদিন অফিসেব বড় সাহেব একটা জরুরী রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত। তাঁকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেজন্যে দরজায় পাহাবাদাবির প্রয়োজন। এদিকে দারোয়ানেরা ধর্মঘট করেছে। বড়বাবু তাই গণেশকে পাহারাদারিতে বসিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই রাস্তার ছেলেদের চিৎকার চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক বদ্ধ পাগল জন্মদিনের পোশাকে সিঁড়ি দিয়ে অফিসের উপরের তলায় উঠে এসে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে তাঁর চেয়ার দখল করতে চাইলো। শেষপর্যন্ত পুলিশ এসে পাগলকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বড় সাহেব গণেশকে রীতিমতো গালাগাল দিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন পাগলকে সে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলো না কেন?

আবার আলী সাহেবের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে : 'গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদেব আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?'

সাহেব তো সাত হাত পানি মেঁ। বললেন, 'হোয়াক্য মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুব, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি। খেতে পাইনে, পবতে পাইনে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবাব উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসেব সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্‌টিসি করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্ হয়েছেন।'

কিন্তু নিছক গল্প-কথনই তো আলী সাহেবের উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভাবতবর্ষের সাধারণ মানুষেব ক্রমবর্ধমান দুরবস্থার পবিচয় দিতে গিযে এ গল্পের অবতারণা করেন তিনি। তারপর মোক্ষম ঘা লাগান রচনাটির অন্তিম অনুচ্ছেদে . '১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আব আমাদের সিনিযর এপ্রেন্‌টিস্ হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতি।'

হিউমাবে শুরু, স্যাটায়াবে শেয। লিখছেন প্রবন্ধ, কিন্তু প্রবন্ধেব গুরুভাব নেই। হাল্কা চালে বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা। এ হল বৈঠকী প্রবন্ধ। বৈঠকী বা মজলিশী মেজাজ তৈবি কবে পাঠকের মনের মধ্যে ঢুকে পড়া। এর জন্যে যথেষ্ট দক্ষতাব প্রয়োজন। খোশগল্পের খুশবাই যেমন আছে, তেমনি আছে কথনরীতির চমৎকারিত্ব। শব্দ-বৈচিত্র্যের কথাই ভাবা যাক। দেশী শব্দ : 'ধাঁতানি গুঁতানি'। তদ্ভব : 'আঁকশি'। আরবী শব্দ 'কেরামৎ'-জাত 'কেরামতি'। ফারসী : 'মালিশ'। ইংরেজি : 'সিনিয়ার এপ্রেন্‌টিস্', 'হোয়ক্য মীন বাই দ্যাট?' ফ্রেজ ইডিয়মের প্রয়োগও উপভোগ্য : 'ফক্কিকারি মারলেন', 'মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন', 'কাকস্য পরিবেদনা', 'সাত হাত পানি মেঁ' ইত্যাদি। লৌকিক উপমা : 'চাঁদপানা মুখ'। শব্দ উপমা ও ফ্রেজ-ইডিয়মের সুচতুর কৌশলী ব্যবহারে আলী সাহেবের উইটের পরিচয় পাওযা যায়। সব কিছু মিলিয়ে একটা বৈঠকী মেজাজ। পাঠককে যা আকৃষ্ট করে আর আবিষ্ট করে। ক্লান্ত করে না, কৌতূহলী করে। আলী সাহেবের কথনভঙ্গিতে এমন একটা

স্মার্টনেস আছে, যার তারিফ করতেই হয়।

'বই কেনা' প্রবন্ধটির সূচনা উইটে। লেখকের বাগবৈদগ্ধ্যের নিদর্শন : 'মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন।' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি মাছির অসংখ্য চোখের কথা তুলেছেন। চোখের কথা থেকে উঠেছে মনের চোখের প্রসঙ্গ। মনীষী আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন আলী সাহেব : 'আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমাব মনেব চোখ ফুটতে থাকে।'

আব চোখ বাড়াবার উপায হ'ল বই পড়া। এবং সেজন্যে বই কেনার মানসিকতা থাকা চাই।

একেই বলে ওস্তাদী। মাছির উল্লেখ ক'রে বইয়ের বাজারে পৌঁছুনো!

আলী সাহেবের বিদ্যাবত্তার পরিধিটি ব্যাপক। কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন না তিনি। অথচ তা গোপনও থাকে না। বৈঠকী মেজাজেই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁব স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। বিচিত্র ও বহুতর উল্লেখ। মনের চোখ ফোটানোর প্রয়োজনটুকু বিস্তারিত করতে গিয়ে তিনি বাবট্রান্ড রাসেলেব উক্তি বিশেষের উদ্ধাব করেন : 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতব আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওযা এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।' রাসেলেব উক্তির ভাষ্য করেন আলী সাহেব : 'অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কী।' তাঁর মতে অসংখ্য ভুবন বই পড়েই সৃষ্টি করা সম্ভব। ওমর খৈযামেব বয়েতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। যে-বয়েতে খৈয়াম রুটি মদ আর প্রিয়ার কালো চোখের সঙ্গে কবিতা-পুস্তকের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন।

আলী সাহেবের চোখে বই কেনারও রকমফের আছে। ঈষৎ কৌতুক হাস্যের সঙ্গে তা জানিয়ে দেন তিনি : 'ভেবে চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে

বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।'

সুযোগমতো নিজেকে নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়েন না তিনি : 'আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই Consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।' বাংলা সাহিত্যে বৈঠকী প্রবন্ধের ধারায় প্রাক্-মুজতবা পর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ কমলাকান্তের আড়ালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য মাঝে মধ্যে নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকে মেতে উঠেছেন। চিত্তের ঔদার্য ছাড়া যা সম্ভব নয়। মুজতবা আলীও অনুরূপ ঔদার্যের অধিকারী ছিলেন।

বই কেনায় সাধারণ বাঙালীর যে অনীহা তা প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্গালী উপভাষার সাহায্য নেন আলী সাহেব : 'অত কাঁচা পয়সা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?' স্পষ্টতই সরস বাকপটুতার নমুনা। 'বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে সস্তা করা যায় না।' Paradox-এর চমৎকার নিদর্শন।

চুটকি গল্পের পরিবেশনে কখনো কৌতুক, কখনো বা ব্যঙ্গরসের আবির্ভাব ঘটে। মার্ক টুয়েনের বই সংগ্রহের গল্প সুবিখ্যাত। আলী সাহেবের ভাষায় সে গল্প বৈঠকী মেজাজের মহিমা প্রাপ্ত হয় : 'মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে : গোটা কয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারি নে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

এবার শোনা যেতে পারে ব্যঙ্গরসের গল্পটি : 'এক ড্রইংরুম বিহারিনী

গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

বই কেনার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে এভাবেই একটার পর একটা গল্প শুনিয়ে যান তিনি। আঁদ্রে জিদের কূটকৌশলের চাতুর্যপূর্ণ গল্প শোনান। শোনান আরব্যোপন্যাসভুক্ত রাজা ও হেকিমের গল্প। হিউমার যে গল্পের প্রাণ। বৈঠক এভাবেই জমে ওঠে। বৈঠকী প্রবন্ধ হয়ে ওঠে সরস, আস্বাদ্য।

শ্লেষ, কৌতুক ও বাগবৈদগ্ধ্যের মিলিত নিদর্শন 'প্যারিস' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি . 'প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ঘ্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত। (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে- -ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা কাপড় পরার কায়দা জানে—অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।'

'আজব শহর কলকেতা'য় কলকাতার একটি 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা পরিবেশন করছেন আলী সাহেব। ফরাসী বইয়ের দোকানের জিম্মায় রয়েছেন যে ফরাসী মহিলাটি তিনি ইংরেজী জানেন না। আলী সাহেবের মুখে দু'একটি ফরাসী শব্দ শুনে তিনি আলী সাহেবকে ফরাসীতেই তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করতে বললেন। আলী সাহেব তাঁর ফরাসী-কথনের অভিজ্ঞতাটুকু সরস ভাষায় নিবেদন করছেন, সে সরসতার সঙ্গে একটু ইয়ার্কিও মিশে রয়েছে . 'বাঙালীর জাত্যাভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমন কী ইংরিজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে ট্যাঁটফ্যুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জ্যাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসী তান-পুরোটার তার বেঁধে ববজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমাব ফরাসী শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন।...

আমাকে আব পায় কে?

আপনাদের আশীর্বাদে আব শ্রীগুরুর কৃপায তখন ব্যাকবণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে, উচ্চারণের মাথায ঘোল ঢেলে চালালুম আমাব ধেনো মার্কা ফবাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তব।'

শব্দ-প্রযোগে অত্যন্ত বেপরোয়া তিনি। বাছ-বিচাবেব বালাই নেই। আদৌ শুচিবায়ুগ্রস্ত নন। বাংলা ভাষায় বৈঠকী প্রবন্ধ রচনায যাঁবা তাঁব পূর্বসূবী অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুবী প্রমুখেব সঙ্গে এখানে তাঁব বড়ো পাথক্য। হুতোমী ভাষা কিংবা বিবেকানন্দেব চলিত গদ্যের সঙ্গে তাঁব ববং খানিকটা আত্মীয়তা আছে।

ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় বহস্য জটিলতাব সবস পরিচয প্রদত্ত হয়েছে 'ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধে। প্যাবিসের বেস্তরাঁয জনৈক ফরাসী আলীসাহেব ফবাসী ভাষা জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কবলে আলীসাহেব যে উত্তব দেন তা বাগবৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল 'ফরাসী ভাষাটা সব সময ঠিক বুঝতে পাবি কিনা বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দবী যখন প্রেমেব আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি, আবার যখন ল্যান্ডলেডি ভাড়াব জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমাব তাবৎ ফবাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায।' বৈঠকী এই প্রবন্ধটিব সমাপ্তি ঘটে এক 'না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট'এর গল্পে। কৌতুক রসের গল্প। বিযযবস্তু পরকীযা প্রেম।

সত্যি কথা বলতে কী, তাঁব অধিকাংশ বৈঠকী প্রবন্ধেই নানানতর চুটকি গল্পের সমাবেশ ঘটে। চুটকি গল্পের রাজা-বাদশা তিনি। মজুত ভাণ্ডাবটিও ঈর্ষাযোগ্য। এসব গল্পকে খোশগল্প বা গালগল্পও বলা যেতে পারে। সে যাই হোক না কেন, এসব গল্প তাঁর বৈঠকী প্রবন্ধগুলিকে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত কবে তুলেছে। স্বাদ-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহীও বলা চলে। অধিকাংশ গল্পই কৌতুকবসাত্মক, অবশ্য

হিউমার রসের গল্পও কিছু আছে। প্রসঙ্গত 'দাম্পত্য জীবন'-এর কথা মনে পড়ে। এতে বৈঠকী ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে তিনটি গল্প। প্রথম ও শেষ গল্প কৌতুক রসের, দ্বিতীয়টি হিউমার-আশ্রিত। 'দাম্পত্য জীবন' প্রবন্ধ নয়, কলম দিয়ে কী অসাধারণ চুটকি গল্প বলতে পারতেন, তাব প্রমাণ এতে আছে। যাঁরা এ লেখাটি পড়েছেন, তাঁরা হাজার বার 'এনকোর' বা 'সাব্বাস' বলতে বাধ্য। আব যাঁরা পড়েননি, তাঁরা নিজেরাই জানেন না, যে জীবনে কী হারিয়েছে! যাক সেসব কথা।

'চরিত্র পরিচয়'-এর সূচনা কৌতুক-স্নিগ্ধ : 'গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আব স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আন্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তাব ভাইকে।' এরপর য়ুরোপীয় বিভিন্ন জাতির চরিত্র-পরিচস নিযে মুজতবার টীকা-টিপ্পনী, মত ও মন্তব্য। যা তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা আর নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাক্ষ্য বহন করে।

সমাপ্তি চমকপ্রদ, একটি চুটকি গল্পে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজব জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কাব বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

'সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুবি বাৎ, কাবণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলাকৌশল মাবা যাবে।' কিন্তু ইংবেজেব হারা সম্বন্ধে সর্দাবজী চুপ।'

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

পাতার পর পাতা না লিখে সর্দারজীর মুখ দিয়ে এভাবেই ইংরেজ ফরাসী জার্মানদের চরিত্র-পরিচয় দিতে পারেন মুজতবা। দিতে পারেন জুৎসই ভাবেই।

এলেমদার আড্ডাবাজ হিসেবে আলী সাহেবের খ্যাতি ছিল। তাঁর বৈঠকী প্রবন্ধগুলিতেও আড্ডার চালটা খুঁজে পাওয়া যায়। 'আড্ডা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। এতে দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর বিদ্যাবত্তার

পরিচয় পাই। কিন্তু গুরুগম্ভীর প্রাবন্ধিকের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন নি। 'বক্তৃতা আড্ডার সবচেয়ে ডাঙর দুশমন' এ সত্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই নির্ভেজাল আড্ডার ভঙ্গিতেই আড্ডা সম্পর্কে সরস বসালাপ করে গেছেন। কাইরোর আড্ডায় ফর্শী হুঁকোয় তামাক খাওয়ার মনোরম অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণটুকু নিঃসন্দেহে উপভোগ্য . 'যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।'

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলা সাহিত্যে বৈঠকী প্রবন্ধের যে দীর্ঘ ধারাটি গড়ে উঠেছে, মুজতবা আলী সে ধারায় একটি অনুচ্ছেদ মাত্র নন, একটি অধ্যায় বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ হিউমার রসেরই প্রাধান্য, রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' আর 'পঞ্চভূত' বৈঠকী প্রবন্ধেরই সংকলন। সেগুলি স্নিগ্ধ কৌতুকরসদীপ্ত। প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকী প্রবন্ধে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যজনিত হাস্যরসের আধিপত্য। প্রমথনাথ বিশীর বৈঠকী প্রবন্ধে ঘটেছে চাতুর্যদীপ্ত মনের সরস বহিঃপ্রকাশ। আরও অনেকের কথা মনে পড়ছে। তালিকাটা আপাতত না হয় দীর্ঘ নাই করলাম। আলী সাহেব জাত বোহেমিয়ান, খানদানী আড্ডাবাজ, বহু ভাষাবিদ, চুটকি গল্পের ভক্ত এবং কুশলী কথক। তাঁর বৈঠকী প্রবন্ধে হাস্যরসের হরেক বর্ণের ফোয়ারা ছুটেছে। আলী সাহেবের উত্তরসূরী? এই মুহূর্তে অন্তত তিনজনের কথা মনে পড়ছে। 'সুনন্দর জার্নাল'-এর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'উড়ো চিঠি'র সন্তোষকুমার ঘোষ এবং রূপদর্শীর আড়ালে গৌরকিশোর ঘোষকে। পার্থক্য কী কিছুই নেই? আছে, আছে। আর তাই তো স্বাভাবিক।

ভৌগোলিকতার সীমা-ছাড়ানো ভ্রমণ-কাহিনী

অশোক মুখোপাধ্যায়

শুরুতেই বলা আছে 'জলে-ডাঙায়' একটি ভ্রমণ-কাহিনী। ১৩৬৩-এর পৌষপার্বণের দিনে শান্তিনিকেতনে 'তোমার আব্বু' এই বই 'বাবা ফিরোজ'-কে উৎসর্গ কবেন। এই 'আব্বু' হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই ভ্রমণ-কাহিনীর শুরু মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ছাড়ার 'ধুন্দুমার' কাণ্ডের বর্ণনায়, শেষ হয় না-লেখা এক ভ্রমণ-কাহিনীর বন্ধুদ্বয় পল আব পার্সিকে উৎসর্গ কবে। এর মাঝে আছে কিছু চরিত্র, কিছু বর্ণনা, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা, আর বিস্তব অফুরন্ত মজা। প্রসঙ্গের পর পালটে যায় প্রসঙ্গ। দেশ, কাল বদলায়। মজার আমেজটা ধরা থাকে সর্বদা।

তাই 'বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়েই এক হুলস্থূল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড!' এর পর অচিরেই চলে আসে 'বগি' বাড়ির নেমন্তন্ন। বর্ণনা তিনি নিজে না দিয়ে উদ্ধার কবেন তাঁব 'গুরু সুকুমাব রায়ের' 'অজব অমব বর্ণনা' যা 'প্ল্যাটিনামাক্ষরে লেখা'। 'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড/সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!' তারপর সিদ্ধান্ত 'ভোজেব আহারে অনাহারে প্রাণহত্যা! আলবাৎ! না হলে বাঙালীর নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন?' জানিয়ে দেন পৃথিবীর সব দেশের সব বন্দবেই জাহাজ ছাড়ার সময় ডাঙা ও জাহাজের খালাসিদের বাক্ বিনিময় একই, ভাষা হতে পারে ইংরেজি, ইতালীয়, জার্মান কিংবা 'সিলট্যা, নোয়াখাল্যা'। তাদের বিনিময়েব বিষয় ভিন্ন নয়—স্রেফ কটূক্তি। তার কোনো উদাহরণ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেন না তিনি, হয়তো ছোটোদের জন্য লেখা বই বলেই। তবে পেয়ে যাই একটা মজার প্রেসক্রিপশন। ভদ্রতা বে-আদবদের কাছ থেকেই ভালো শেখা যায়, কারণ তারা যা করে তা বর্জন করলেই তো হয়। আর 'জাহাজের খালাসীদের বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদেব—ভাষাটা বর্জন

করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।'

যাঁরা একবার জাহাজে কাজ নেন বা সমুদ্রে অভ্যস্থ হন (যেমন সমুদ্রে মাছ ধরেন) তাঁরা সমুদ্রেব মায়া কাটাতে পারেন না। এই আলোচনাতেও কিছু রসিকতায় ডুবিয়ে রেখে ঘর বাঁধতে নারাজ এমন লোকদের বিষয়ে তথ্য ঢুকিয়ে দেন। এসে পড়ে সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ। জানতে পারি ইংলন্ডে এক ধরনের 'বেদে' আছে যাদের দুশো বছর ধরে চেষ্টা করেও কোনো জায়গায় 'পাকাপাকি ভাবে' বসাতে পারেনি। এরা এক জাযগায় থাকে না—ফলে এদের বাচ্চারাও স্কুলে যায় না। 'শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠশালা খুলেছে।'

'জলে-ডাঙায়' যে-যাত্রাপথ জুড়ে আছে তা মাদ্রাজ-কলম্বো-সুযেজ-পোর্ট সৈযদ—শেষে দলছুট হয়ে প্যালেস্টাইন। জলই বেশি, ডাঙা কম—মিশরেব কিছু অংশ। বইটিব অন্যতম বিশেষত্ব যে এতে কেবল ভ্রমণপথেব বৃত্তান্তই নেই। প্রায়শই তিনি ছোটোদের নিয়ে গেছেন ইতিহাসের অন্তানে। পালাবদল হয়েছে, অথচ লেখার ধাবাবাহিকতায় ও মেজাজে ছেদ নেই কোনো। আরব বেদুইনদের এক টুকরো ইতিহাসে শেষ হয় প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশে দুই সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয পাঠকের। থাকে জাহাজের কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ, সঙ্গে কিছু রসিকতা। তাব একটা 'আমাদের দেশে এক বুড়ি কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মবা মাছি। দোকানিকে ফেবত দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি'। দোকানি বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতি আশা করেছিলে?'

এইভাবেই তেইশটি পরিচ্ছেদে সৈয়দ মুজতবা আলী শেষ করেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'জলে ডাঙায়'। এ ঠিক দিনপঞ্জি নয়, বর্ণনার বাহুল্যও নেই, নেই শিখিয়ে কিংবা জানিযে দেওয়ার মাস্টারি ভাব। এই স্টাইল তাঁব একান্তই নিজস্ব, যার বলনের চলন নিতান্ত বৈঠকি, আর পর্যবেক্ষণে মুজতবা তো চিরকালই মুজতবা। তিন নম্বর অধ্যায়ের শুরুতেই মৌসুমি বায়ুর আলোচনা। এই হাওয়া-নির্ভর জাহাজ চলাচলই ছিল ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায়। রোমানরা এই হাওয়ার খবর রাখত। 'এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গা'র মাটির তলা থেকে রোমান মুদ্রা বেরোয়। মালদ্বীপের কথা আছে। 'ওখানে না কি সবসুদ্ধ দুই হাজার ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারেব বসতি নেই।' এক

মালদ্বীপবাসী ছাত্রেব সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল কাইরোতে। সেই সূত্রে-জানা খবরে জানিয়ে দেন যে ওখানে গিয়ে থাকলে মহাসুখেই দিন কাটানো চলে, কোনো পরীক্ষা নেই। একান্তই মুজতবা স্টাইলের সহজ সরল ভঙ্গিতে টেনে আনেন বেশ গভীর তত্ত্ব। 'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোনো কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না-করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভযাবহ কাজ।' 'কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আবম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সইতে পারা যায় না।' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এসেই পড়েন এবং এসেওছেন। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের পরই পাওয়া যায় মূল সিদ্ধান্ত। 'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজেব দেওযাল নেই বলে।'

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে কন্-ফু-ৎস'র কথা। ছেলেবা জেনে যায় কন্-ফু-ৎস'র 'আমাদের মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক? ঐ সমযেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইবানে জবথুস্ত্র, গ্রীসে সোক্রেতেস-প্লাতো-আরিস্তোতেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমাব কথা বলো।'

জাহাজেই আলাপ হল 'আবুল্ আস্‌ফিযা, নূব উদ্দীন, মহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দিকির' সঙ্গে। অদ্ভুত পোশাক, ততোধিক অদ্ভুত চবিত্র। সেইবকমই পোশাক—তাতে অসংখ্য পকেট। অন্যতম পকেটে সোনার কেস, তাতে ভিজিটিং কার্ড। সোনার সিগারেট কেস, জয়পুবি মিনাব কাজ করা সিগাবেট লাইটার। কথা বিশেষ বলেন না। এহেন চরিত্রের সঙ্গে মুজতবা আলীব ভাব জমবে কোনো সন্দেহ নেই।

তাঁর গল্প এগোয় দ্রুতবেগে, ছোটোদের জানাতে ভুল করেন না যে বড়ো দ্বীপের খুব কাছ দিয়ে জাহাজ যায় না, কাবণ আশে-পাশে বিস্তর ছোটো ছোটো দ্বীপ 'জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে'। এর কোনোটার সঙ্গে ধাক্কা খেলেই সমূহ বিপদ জাহাজের। প্রসঙ্গটা আসে সেকোত্রা দ্বীপের উল্লেখে, হজ করতে আসতে হলে এই দ্বীপের পাশ দিয়েই জাহাজ আসত। ডুবন্ত দ্বীপে ধাক্কা খেয়ে কত জাহাজ যে ঘায়েল হয়েছে সে কথা তিনি শুনেছেন তাঁর এক 'দাদীর' কাছে। তার সঙ্গে মিশে যায় ইতিহাসের এক টুকরো। আরব্য উপন্যাসে কেন এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প? আরবরা সমুদ্রকে ডরায না, কারণ দেশটার 'সাড়ে তিনদিকেই' সমুদ্র।

সঙ্গে জুড়ে দেন, যেমন 'আমরা পদ্মা মেঘনাকে ডরাইনে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দের পদ্মা দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে—বোধহয় লম্ফ দিয়ে পেরবার জন্য।' আববদের পূর্বে ছিল রোমানবা বাদশা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিল—ক্রমে অবাধে 'লাল দরিয়া মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়লো।'

ইতিহাসের উপাদানেব ব্যবহার ও তা শিশুমনে যাতে ভাবনার উদ্রেক করতে পারে—এমন খোঁচা আছে বহু জায়গাতে। সমুদ্রযাত্রা একটা সময়ে বন্ধ হয়ে যায় ভারতবর্ষে। 'কিন্তু ভাবতীয়রা সেকোত্রায় একটা চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সেকোত্রার গাই-গোরু জাতে সিন্ধু দেশেব। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু তার পোষা গোরু-ঘোড়া শতাব্দীর পর থেকে শতাব্দী বেঁচে থেকে তাব প্রভুব কথা চক্ষুষ্মান-ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানেব বাজত্ব ভাবতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদেব বাগানে আবো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে।' এর মধ্যে 'চক্ষুষ্মান' শব্দটি লক্ষ্য করার মতো। সামনে থাকলেই কি সব জিনিস বোঝে সবাই?

এর পর দুই বন্ধুর কথোপকথনেব মধ্যে দিয়ে আবাবও যা পাই তা-ও সমাজ ইতিহাসেব কথা। সমুদ্রে কে বা কোন জাতি প্রথম আধিপত্য করল, কেনই-বা তা তারা হারাল আর কেনই-বা এখন মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য? এর পর কে? মুজতবার মতে আফ্রিকাব নিগ্রোবা। কেননা ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভাবতীয, চীনা, আবব, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি 'যাবতীয় জাতই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধহয় ওদেব পালা।' পর পরেই প্রাচীন ভাবতে সমুদ্র যাত্রার পরিধি ও প্রসার নিয়ে আলোচনা, একেবারেই নিবাসক্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে। বাংলা দেশের এক রাজা নাকি আফ্রিকা থেকে জিবাফ আমদানি করে চীন দেশের রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন—তার বিশদ বর্ণনা আছে। উৎস চীনা ভাষার বৌদ্ধশাস্ত্র। তবুও গল্পটি যেন বিশ্বাস করতে চান না তাঁর সহযাত্রী বন্ধুদ্বয। এ নিয়ে কিছু কথাবার্তার পর আলীসাহেবের মন্তব্য, 'এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিম্বা বলবো, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকারের ঐতিহাসিক নয়।

আমাদের এরকম কাঠখোট্টা ঐতিহাসিকই বেশী।'

সম্ভবত এই জায়গাটাতেই লুকিয়ে আছে 'জলে-ডাঙায়' নামক ইতিহাস-আশ্রিত ভ্রমণ-কাহিনীর মূল উদ্দেশ্যটা। আর সত্যিই যখন এর পাঠক ছোটোরা। এই কাহিনীর ভ্রমণ কেবল কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে নয়, সেই অঞ্চলের মানুষ, পূর্বের কাহিনী সবই এমনভাবে পরিবেশিত যা আমাদের ভাবায়, চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

এরই মধ্যে জাহাজ পৌঁছোয় জিবুটি বন্দরে। দরিদ্র দেশের দরিদ্র বন্দর। লেখক নিজে কলকাতায় দারিদ্র্য দেখেছেন—বিদেশের মাটিতে সে জিনিস দেখার মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার থাকেই। কিন্তু ততটা চমকে ওঠে না মন। যেন এ আবার এমন কী, এতে তো আমবা অভ্যস্তই। তার পরই ধাক্কা খান পাঠক, 'এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষেরা দৈন্য দেখে কখনো অভ্যস্থ হন না। কখনো বলেন না, এতো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়েই গভীর পীড়া দেয়।' এর পরই সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভে নানান সভ্য জাতি কীভাবে কতদিন পদদলিত করে রেখেছে তার ইতিহাস। ওই একইরকম গল্পেব ভঙ্গিতে লেখা। 'ইয়োরোপীয় বর্বরতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হবে আফ্রিকাব ইতিহাস—ইংরেজ শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।' এখানে পাই আফ্রিকাব নানা জাতিব উপব পোর্তুগিজ, ইংবেজ, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির দমন-পীড়নের কাহিনী। যা হযতো উসকে দেবে অনেক পাঠককে, আফ্রিকাব তথা সমগ্র বঞ্চিতদের ইতিহাস নতুনভাবে পড়তে ও জানতে। এই পর্যাযে অনেকটা জায়গা নিয়ে আছে ব্রিটিশ-সোমালিয়ার ইতিহাস, সেখানকার বিদ্রোহের কাহিনী। শেষে খানিকটা শপথ বাক্য পাঠ করানোর ভঙ্গিতেই বলে বসেন,

> 'এবং শেষ কথা—সবচেয়ে বড় কথা;—
>
> আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায আচরণ দেখে যেন আমরা সতর্ক হই। আমরা দুশো বছর ধরে পরাধীন ছিলুম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি।'

আলীসাহেব যেন চিন্তা করেন যে আগের অধ্যায়টা একটু যেন ভারি হয়ে গেছে, হয়তো বা ঢুকে গেছে খানিকটা স্কুলমাস্টারি। পরেই তার রেশ ভেঙে দেন। জিবুটির কিছু বর্ণনা পাই নেহাতই হাস্য-পরিহাস। আছে 'মাছি তাড়ানোর'

কথা, আর সেই শস্তা পারফিউম---যা খুলে দেখা গেল কোনো গন্ধ নেই তার, একেবারে 'নির্জলা' জল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার কোনো আভাস কি পাই বইতে? উত্তরে বলা যায়, হয়তো অনেক বেশি করেই পাওয়া যায়। কোনো লেখক যখন ছোটোদের জন্য কলম ধরেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজের ভাবনার কিছু অংশ চালান করে দিতে চান শিশুর মাথায়, আর সে ভাবনা অভাব অভিযোগের মালা নয়, কে কে তাকে ঠকিয়েছে আর কীভাবে তিনি তার ঝাল মিটিয়েছেন তার ফিরিস্তি থাকে না। তিনি যে-বিষয়ে যতটা বুঝেছেন ছোটো পাঠক বড়ো হয়ে সেই ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে, এমন একটা ক্ষীণ আশা ও উদ্দেশ্য থেকেই যায় লেখকের। হয়তো খুব বেশি করে বিশদে থাকে না, কিন্তু ছোটোদেব লেখা থেকেই হয়তো একজন লেখককে চিনে নেওয়া যায়। সৎ লেখক ছোটোদের কাছে নিজেকে খুলেই দেন। 'জলে-ডাঙায়' বইটিও এই দিক থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়। বইটার মাঝামাঝি এসে পড়ে ধর্মভাবনা। বোঝা যায় না অবশ্য তিনি নিজে ধার্মিক কি না, তবে ধার্মিকদের বিষয়ে কোনো অশ্রদ্ধা তাঁব নেই, আর আছে সহনশীলতা। 'আমি বললুম পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে, অর্থাৎ এ ধর্মগুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।' বিশ্বধর্মেব সংজ্ঞাটি ভালো লাগে। হজের দিন মক্কার রাস্তায় পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।

বই-এর শেষের দিকটা ডাঙায। সুয়েজ বন্দর থেকে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত জাহাজ চলে অতি ধীরে। যাত্রীরা নেমে গিয়ে ট্রেনে কাইরো' যান, সেখান থেকে পিরামিড দেখে, কাইরো শহর দেখে আবাব পোর্ট সৈয়দে জাহাজ ধরেন। এতে কিছু অশান্তি থেকেই যায়, কাবণ ডাঙায় সবকিছু ঠিকঠাক না চললে হয়তো ওদিকে পৌঁছোনোর আগেই দেখা যাবে যে জাহাজ পার হয়ে গেছে। তাই অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম ও মজার অভিজ্ঞতা। এইখানে আবার এসে পড়ে ভারতীয় মিশরীয় আদানপ্রদানের কাহিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোগল আমলের কিছু প্রাসঙ্গি ক তথ্য।

সুয়েজ বন্দর থেকে কাইরো—নানা ঘটনার ঠাস বুনোনি। মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এছাড়া কাইরোর হোটেল রেস্তরাঁর বর্ণনা—

'খদ্দেরে খদ্দেরে তামাম শহরটা আব্‌জাব করছে'। 'ওই দেখো অতি খানদানি নিগ্রো'। 'ঐ দেখো সুদানবাসী। সবাই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা।'

পরে আসে পিরামিড প্রসঙ্গ। এখানে প্রথম এই রম্য ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে মাপজোখ, সন তারিখের উল্লেখ পাওয়া গেল। বেশ কিছু পাতা জুড়ে পিরামিডের ওপর যেন 'পেপার' গোছেরই কিছু লিখে ফেলেন তিনি। কাইরোর বর্ণনাও আছে কিছু, কাইরোর সঙ্গে কলকাতার তুলনাও বাদ পড়ে নি। আছে 'পুবো-পাক্কা' এক হাজার বৎসর বয়স্ক আজহর বিশ্ববিদ্যালযের কথা। এখানে সৈয়দ মুজতবা আলী যেন কিছু সাবধান বাণীই উচ্চারণ করেন তরুণদের উদ্দেশ্যে। 'এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবীয় চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু, সাধু' রবে হুঙ্কার তোলে?'

'হায়, এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এঁরা ভাবলেন, এদের সবকিছু করা হয়ে গিয়েছে, নূতন আর কিছুই করবার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।'

শেষ পর্যায়ে পাই মিশরের ট্রেনেও ফেরিওয়ালা আছেন অজস্র। কমলালেবু, কলা, রুটি, নোটবুক, চিকনি, মোজা, ঘুড়ি সব নিয়েই ওঠেন তাঁরা। আর একজনের সাক্ষাৎ পেলেন যিনি 'দেশ বিক্রি করেন'। তাঁর হাতেই আত্মসমর্পণ করে তাঁর যাত্রাপথ ঘুরে যায় প্যালেস্টাইনের দিকে। এটা কীভাবে হল তা জানতে হলে পড়ে নিতে হবে বইটি।

'জলে-ডাঙায়'—এই বইতে আমরা প্রায় সমগ্র মুজতবা আলীকে পাই। তাঁর গভীর জ্ঞান, রবীন্দ্রভক্তি, মুক্তমন ও মনন, পূর্ববঙ্গের প্রতি বুঝি একটু পক্ষপাতিত্ব, সরস কলম ও অফুরন্ত হিউমারের স্টক। এই ভ্রমণ-কাহিনীটিতে পথের বর্ণনা বিশেষ নেই, উচ্ছ্বাস তো একেবারেই নেই। ভ্রমণ কাহিনী লেখার উদ্দেশ্য যে কেবল লেখকের দেখা জায়গার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করানো—তা নয়। পাঠকের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করা, তাকে এক জায়গায় থেমে থাকার প্রবণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বাতলানো—এসবই তো থাকবে এই কাহিনীতে। এছাড়া অজস্র অচেনা মানুষের ছবি ও তাদের মিশে যাওয়ার ক্ষমতা—তা-ও তো ভ্রমণেরই একটা আবশ্যক শর্ত।

মুজতবা আলীর উপন্যাস : অবিশ্বাস্য, তুলনাহীনা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

।।এক।।

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত, আগ্রহ দূরবিস্তারী, জীবনরসরসিকতা অনবদ্য। তিনি রম্যরচনার লেখক মাত্র, একথা অগ্রাহ্য। আমাদের অনেকেই জানেন না যে আলীসাহেব তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বে বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি পাঁচ-সাতটি ভাষা উত্তমরূপে জানতেন। কায়রো, কাবুল ও ইউরোপে, বিশেষত জার্মানিতে অনেক বছর কাটিয়েছেন। তাঁর কলম ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন, তিনি যেমন চাইতেন তেমনি চলত। তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ পেত আড্ডায়, রসিকতায়। মানবিকী বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ কতো স্বচ্ছন্দ ছিল, তা জানেন কেবল তাঁরাই যাঁরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন।

আলী সাহেবের নাম ছড়ায় 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে। এটি মামুলি ভ্রমণগ্রন্থ মাত্র নয়, তার চেয়ে বেশি অনেক-কিছু। এটি পড়ে মোহিত হননি এমন পাঠক আছেন কিনা জানিনা।

তিনি উপন্যাস লিখেছেন মোট চারখানি—'অবিশ্বাস্য' (১৯৫৩), 'শবনম্' (১৯৬১), 'শহর-ইয়ার' (১৯৬৯) আর 'তুলনাহীনা' (১৯৭৪)।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসটি 'দেশ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৬০ থেকে ২০ চৈত্র ১৩৬০। এই সময়ে (১৯৫৫) তাঁর পার্ল রোডের বাসায় বর্তমান নিবন্ধকারকে আলী সাহেব বলেছিলেন, দেখবে এমন একটি বিষয় নিয়ে লিখেছি, যা একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য আর সাংঘাতিক। পরে মনে হয়েছিল, তাঁর মন্তব্য কেবল একটা দাবী নয়, যথার্থই একটা বিপজ্জনক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তিনি জীবনের ছবি এঁকেছিলেন। মধুগঞ্জ মহকুমা শহর, রেল স্টেশন থেকে

কুড়ি মাইল দূরে। জলের কল, বিজলী বাতি নেই, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আনাজ-পাতি মাছ মাংস খুবই শস্তা এবং পুববাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড। এখানকার হাইস্কুল ও দুটি প্রাইমারি স্কুল চালাতেন ওয়েলশ মিশনারীরা। এই হাইস্কুলে ফী-সন ছাত্রভর্তির জন্য ওয়েটিং লিস্ট টাঙানো হত। এমন যে মধুগঞ্জ তা-ই এক রোমহর্ষক মর্মবিদারী কাণ্ডের পটভূমি। মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেই হয়। পুব বাঙলার মতো ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিম বাঙলায় মত ঢেউ খেলানও নয়। সামনে 'কাজলাধারা' নদীর কাকচক্ষু জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশছোঁয়া বিরাট নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনাব কাজ (শত রূপোলী ঝবণা) আব সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজল-ধারা কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ্ পুলিশ হয়ে আসামাত্র-ই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

এই হল সাঙ্ঘাতিক ও মর্মবিদারী উপন্যাসের মুখপাত। এর থেকে ধববার উপায় নেই কী ঘটতে যাচ্ছে। উল্টে লেখক পরবর্তী বাক্যে লিখেছেন—প্রেমটা কিন্তু দু'তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলল। পরবর্তী বাক্য—ও-রেলি সত্যই সুপুরুষ। বয়স একুশ-বাইশ, ফরসা রঙ, চুল খাঁটি বাঙালীব মতো মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ।

মধুগঞ্জ শহরটি ছোট, তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। কাছাকাছি সব চা-বাগানের মালিক, সাহেবরা এর সদস্য। সন্ধ্যেবেলায় সে সব বাগান থেকে ক্লাবে আসত সায়েব-মেম আর তাদের আন্ডাবাচ্চারা। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল ও-রেলি ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক লাগাচ্ছে। ক্লাবেও তাঁব সমাদর হতে সময় লাগল না। বড়-মেজ-ছোট সায়েবরা, তাদের মেমেরা এবং অনূঢ়া মেমেরা ও-রেলি বলতে অজ্ঞান। ও-রেলির সঙ্গে মধুগঞ্জে ভাব নেই কার? সকলেই, এমনকি বুড়ো পাদ্রী সায়েবও ও-রেলিকে পছন্দ করেন। ও-রেলি পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য এবং সেখানকাব দো-আঁশলা ছেলেদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করল। ইস্কুলের ছোঁড়ারা তাঁর নামে ছড়া বানিয়েছিল 'ও-রেলি, কোথায় গেলি'? তাতে ও-রেলি রাগ করেনি, বরং খুশি হয়েছিল।

এক বছর বাদে ও-রেলি বিলেত গেল বিয়ে করতে। সে এক বিলেতি কন্যার কাছে বাগদত্তা ছিল। বউ নিয়ে ও-রেলি ফিরে এলে সবাই আনন্দ প্রকাশ করল।

এই হল উপন্যাসের ভূমিকা। এরপর শুরু হল আসল ব্যাপার। মধুগঞ্জেব লোকজন, ক্লাবের সায়েব-মেম বুড়ো-বুড়ি ছোঁড়া-ছুঁড়ি—সবাই ধীরে ধীরে অনুভব করলে, ও-রেলির মেম সায়েব বউ সুন্দরী, কিন্তু কেমন যেন মিশুকে নয়। আর ও-রেলি ধীরে ধীরে সকলেব থেকে সরে যাচ্ছে। ক্লাবে, গ্যালা ডান্সের পর পাদ্রী বাঙলোয় পিকনিক। সবাই অনুভব কবলে ডেভিড ও-রেলি ও তস্য পত্নী মেব্‌ল্‌-এর উৎসাহ ফুর্তি ততটা নয়, যতটা প্রত্যাশিত।

মধুগঞ্জের সবাই দেখলে, সায়েবের বাঙলোর ছাতা-ল্যাম্পের নিচে ও-রেলি আর তার মেম-বউ বসে খাচ্ছে। বেশির ভাগ সময় নির্জন বারান্দায় কিংবা টিলার বাগানের লিচুতলায় দুজন পাশাপাশি বসে আছে। ও-বেলির বাঙলোয় বাস করে এই নববিবাহিত দম্পতি আব সিংহলি বাটলার জয়সূর্য (অবিবাহিত যুবক)। ক্রমে ক্রমে মধুগঞ্জের লোকেবা আবিষ্কার করল, সায়েব মেম একে অন্যের সঙ্গে কম কথা বলে। ও-রেলি একবার ট্যুবে গেল, সঙ্গে মেমসায়েব বউ। ট্যুর থেকে ফিবে এসে পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সোম সবাইকে মিথ্যে করে বলল—হুজুর সরকারী কাজে কলকাতা গেছেন। ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল তখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছাপ। মাত্র দু-তিন মাসের মধ্যেই বদলে গেল ও-রেলি। কোথায় গেল তার বাচালতা, সপ্রতিভতা, ফুর্তি, টগবগ করা প্রাণের প্রকাশ। এবং ও-রেলি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ কবল। ধীবে ধীরে মধুগঞ্জের লোকেবা অনুভব করলে, ও-রেলির জীবনে কোথায় একটা গোলমাল ঘটেছে। কিন্তু রহস্য ভেদ করা যাচ্ছে না। পাদ্রী সায়েবের বুড়ি মেম একবার ডেভিডের মফস্বল বাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে তে-রাত্তির কাটান। তৃতীয় রাত্রে ছিল পূর্ণিমা। বুড়ির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেব্‌ল নেই। পা টিপে-টিপে বারান্দায় এসে দেখেন, মেব্‌ল্‌ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে মুখ ঢেকে বসে আছে। মুখে কোনো কথা নেই। ছড়িয়ে পড়া চুল ভেজা।

লেখকের কাহিনী সাজানোর মুন্সিয়ানা তারিফ করার যোগ্য। ধীরে—অতি ধীরে ঈষৎ ইশারা দিয়ে তিনি রহস্যের পর্দা একটু একটু করে তুলেছেন।

ও-রেলির সহকারী এবং বিশ্বস্ত আস্থাভাজন সহকারী সোম একদিন সায়েবকে শুধালো—'এনি ট্রাবল?' তারপর উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে 'গুড বাই' বলে চলে গেল। বুড়ো পাদ্রী, তাব মেম সাযেব, সোম এবং তাবৎ মধুগঞ্জ রহস্য ভেদ কবতে পাবল না।

কেটে গেল আরো তিন মাস। সবাই লক্ষ্য করলে, ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে। ক্লাবে যায় না। মেব্‌ল্‌ও চুপচাপ থাকে। ক্লাবে বসে চা-বাগানের সাহেব মেমেরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে, ফলাং নাস্তি। তারপর ক্লাবে একটা গোপন গুজব পৌঁছল, মেব্‌ল্ নাকি বাটলাব জয়সূর্যেব প্রতি আসক্ত। দুই প্রবীণ সায়েব গুজবটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই তা শুনল।

এরপর কেটে গেল আরো তিনমাস। তাবপর ক্লাবেব সবাই শুনলে, ও-রেলির পুত্রেব জন্ম সংবাদ। যথাসময়ে চার্চে হল 'বাপ্তিষ্ম'। ও-রেলি ক্যাথলিক। মধুগঞ্জের অপর ক্যাথলিক বাটলার জয়সূর্য। ও-বেলি বললে, বাটলার হবে ধর্মবাপ।

'বাপ্তিষ্ম' হবার পব চার বছব কেটে গিয়েছে। এই চার বছব ও-রেলি দম্পতিব জীবন কীভাবে কেটেছে কেউ জানে না। তবে সবাই শুনল, ও-বেলি স্থিব করেছে মেব্‌ল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করবে। সবাই দেখল, ও-রেলি বিস্তব ট্রাভেল এজেন্সিব কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে—বোম্বাই হযে যাবে, না, মাদ্রাজ হয়ে যাবে। ও-রেলি কুড়ি মাইল দূবের বেল স্টেশনে বৌ আর বাচ্চাকে ট্রেনে তুলে দেবে, বাটলার ছুটি নিয়ে সিংহলে যাবে, আর সায়েব ফিরে আসবে। যাত্রার পূর্বদিন রাতে সব ভৃত্যদের ছুটি দিযে দিল, বললে, পবদিন ভোবে এসো। সেদিন ভোরে খুব বৃষ্টি। সবাই এসে দেখে খুব ভোরে সায়েবরা চলে গেছে। সায়েব ফিবল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। এবং কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিযে শুয়ে পড়ল।

এইবার রহস্যভেদেব পালা। অধ্যায় দশ থেকে যোলো—এই সাতটি অধ্যায়ে ধীরে ধীবে রহস্যভেদ হয়েছে। চোদ্দ থেকে ষোল—এই তিনটি অধ্যায়ে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়া ও-রেলি সোমকে চিঠিতে তার অপবাধ স্বীকার করেছে। এক বছর পরে ও-রেলির জায়গায় যে এল, তাঁর নাম ডীন। ডীনকে ও-রেলির চার্জ

বুঝিয়ে দেওয়া ও রেলস্টেশন অভিমুখে যাত্রার মাঝে ক্লাবে ও-রেলির জন্যে বিদায়ী-ডিনার দেওয়া হল। সে রাতেই ও-রেলি স্টেশন অভিমুখে যাত্রা কবল। ডীন বারান্দায বসে একটাব পর একটা সিগারেট খাচ্ছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, এমন সময় ঘুম চোখে আবছা আবছা দেখলে তিনটি প্রাণী—তিনটি মানুষ—প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝাবি, দ্বিতীয়টি ছোট, তৃতীয়টি বেশ লম্বা—বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। ছুটে গেল গেটের কাছে। রাস্তার ক্ষীণ আলোয দেখল কেউ ত নেই। পরের বাতে একই দৃশ্য। ডীন ছুটে গিয়েও তিন মূর্তিকে ধরতে পাবলে না, বড় জামগাছটার কাছে তারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এবার অপরাধীর স্বীকাবোক্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব জন্যে ও-বেলি অনেক কিছু কবেছিল বলে আই জি. পুলিশ আর ডীন মুগ্ধ হয়ে ও-বেলি সম্পর্কে গুজব সমূহ খণ্ডন করতে চাইল। এবং তখনি সত্য আবিষ্কৃত হল।

চোদ্দ থেকে যোল—এই তিনটি অধ্যাযে সোমের কাছে ও-রেলির স্বীকাবোক্তি—দীর্ঘ পত্রটি অসাধাবণ। বিয়ের পর মধুগঞ্জে ফিরে আসার পর মেব্‌ল্ আর ও-বেলিব কাছে এক সাংঘাতিক সত্য প্রকটিত হল—ও-রেলি পুরুষত্বহীন। অনেক ব্যর্থ বাতের পর মেব্‌ল্ এক বাতে বাটলার জয়সূর্যর ঘরে গেল। সেই শুরু। এবং তাবই ফলে একটি পুত্রসন্তান। মেব্‌ল্‌দের বিলেত যাত্রার পূর্বরাতে বিদায়ীভোজে ও-রেলি বাটলাবকেও খেতে বসাল। শেষ পর্বে পুডিং সার্ভ কবল ও-রেলি। ওদেব তিনজনকে পুডিং দেয়াব পূর্বে তাতে আর্সেনিক মেশালো। লিচুগাছের তলায় গর্ত খুড়ে তিনজনকে পুঁতে দিযে ভোররাতে গাড়ি নিযে সে স্টেশনে চলে গেল।

ও-বেলির যৌন অক্ষমতা আব অপরাধেব স্বীকারোক্তি এমন মর্মবিদারী ভাষায় দীর্ঘ পত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা পাঠকেব হৃদয়কে বেদনায় ভরে দেয়। তিনটি মানুষের হত্যাকারী ও রেলিকে করুণা করতে ইচ্ছা করে। এখানেই লেখকের জিত্। তিনি এমনভাবে এই স্বীকারোক্তি উপস্থাপিত কবেছেন যাতে উপন্যাসটি খুনের কাহিনী না হয়ে মর্মভেদকারী নিষ্ঠুর জীবন সত্যরূপে দেখা দিয়েছে। ও-রেলি পত্রের শেষে সোমকে জানিয়েছে, তাদের ক্লাবেব সদস্যরা ব্যাপারটা (ও-রেলির পারিবারিক কেলেঙ্কারি) ধামাচাপা দিতে চেয়েছে, একথা জানার পর লিখেছে, 'পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। তার ব্যক্তিগত

স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক স্বার্থ হয়তো আছে, সে পাপ গোপন করার। কাজেই আমাকে কেউ ধরিয়ে দেবে না।'

কিন্তু পত্রের একটি পুনশ্চ-আছে, আই. জি. পুলিশ আর ডীন ও-রেলির সম্পর্কে রটানো গুজব থেকে তাকে মুক্তি দিতে গিয়ে অনুসন্ধান শুরু করল, এবং তখনি সত্য উদ্‌ঘাটিত হল, আবিষ্কৃত হল তিনটি কঙ্কাল। অপরাধীর প্রতি পাঠকের মমতা ও করুণা চেয়ে লেখক ও-রেলিকে দিয়ে লিখিয়েছেন, 'যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়তো ঝুলতে হবে। আমার জন্য শেষকৃত্য হয়তো তোমাকেই করতে হবে। তাই আমার গোরের উপর নিচের দুটোর যে-কোনো একটা খোদাই করে দিতে পারো :

(For a Godly Man's Tomb)
Here lies a piece of Christ, a star in dust,
A vein of gold, a china dish that must
Be used in Heaven, when God shall feast the just

কিংবা,

(For a Wicked Man's Tomb)
Here lies the carcass of a cursed sinner,
Doomed to be roasted for the Devil's Dinner

ডেভিড ওরেলি।'

// দুই //

লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস 'তুলনাহীনা'র পটভূমি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম কয়েকটি মাস, পটভূমি—প্রত্যক্ষে কলকাতা, আগরতলা, শিলঙ; অপ্রত্যক্ষে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান—ইয়াহিয়া-র বুটের তলায় নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তান—আজাদীর জন্য অপেক্ষাবত প্রস্তুতিমগ্ন রক্তস্নাত বদ্ধমুষ্টি পূর্ব পাকিস্তান। এটি চড়াসুরে বাঁধা সাংবাদিকতাশ্রয়ী উত্তেজক ঘটনাবলীর বিবরণ নয়। সাহিত্যের সৃষ্টিরূপে হাজির হয়েছেন 'তুলনাহীনা'। সাংবাদিক প্রতিবেদন আর উপন্যাস যে এক নয়, তা এই উপন্যাস পাঠে অনুধাবন করা যায়।

এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হিন্দু—কীর্তি চৌধুরী আর শিপ্রা যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর চারটের মধ্যে তিনটি উপন্যাসই নায়িকাপ্রধান। 'তুলনাহীনা'র

নায়িকা এক অসামান্যা নারী, যার ব্যক্তিত্বের প্রভায় সবাই মুগ্ধ, আলোকিত, ত্রস্ত, বিমূঢ়। শিপ্রা কলকাতার খানদানী উঁচু মহলের সোসাইটি লেডি। বেয়ারাদের কথায়—'খাঁটি মিসিবাবা।' পবিত্র মহরম মাসে ইয়েহিয়া খুনখারাবী করতে ইতস্তত করতে পারে : এই ভুল ধারণার উপর কলকাতা-আগরতলা-শিলঙের অনেক হিন্দু-মুসলমান নির্ভব করেছিল। সকলেবই শিকড় আছে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিন্তু সব ধর্মভীরু মুসলমান আর হিন্দুদেব সব আশা-ভরসা নির্মূল করে বজ্রের মতো নেমে এল পঁচিশে মার্চেব 'ক্র্যাকডাউন'। এই রক্তাক্ত পটভূমিটি এখানে প্রত্যক্ষে নেই, তবু দূর থেকেই তার প্রভাব পড়েছে ভারতের সর্বস্তরে সকল মানুযেব উপরে।

আলী সাহেবের সব লেখার মতই এ-উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ হাজিব। বস্তুত তাঁর রচনায় ববীন্দ্রনাথ সর্বগ, সর্বশক্তিমান। প্রেমিক কীর্তি চৌধুরীর (শিপ্রার সিলেটি ভাষায় আদরের ডাকে 'কিতা') সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিতা শিপ্রা অপেক্ষা করছে শিলঙে। অপেক্ষা করে করে শিপ্রা যখন ধৈর্যের সীমানায়, তখনি এলো কীর্তির আগমন-সংবাদের 'তাব'। আর তখনি লেখক পেয়ে গেলেন সুযোগ। এসে গেলেন রবীন্দ্রনাথ—শিলঙ আর দার্জিলিঙেব তুলনাত্মক বিচারের মধ্য দিয়ে—'দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠান্ডা হেথায় কম হবে। একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' রবীন্দ্র-কবিতায় বর্ণিত শিলঙকে প্রতীক্ষার অবসান-শেষে নায়িকা লাইনে-লাইনে মিলিয়ে নেয়—'এখানে খুব লাগল ভালো গাছেব ফাঁকে চন্দ্রোদয়,' এখানে 'বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায পাইন বনেব পল্লবে'। মেঘ আর রোদের, আলো আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখছিল শিপ্রা শান্ত প্রতীক্ষায়—পাইনের শীর্ষ পল্লবেব মৃদু আন্দোলন আর টুকবো নীলাকাশ।

'তুলনাহীনা' প্রেমের উপন্যাস। ববীন্দ্র-নিষ্ণাত লেখকের কলমে সৃষ্ট উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেবল রঙ্গস্থলের আকস্মিক সাদৃশ্য দেখে একথা লিখছি না, প্রেমালাপনেও বন্যা-মিতার (লাবণ্য-অমিত রায়) কথা মনে পড়ে যায়। কীর্তিকে শিপ্রা আদর করে কখনো ডাকে 'কিতা', কখনও-বা 'মিতা'। শিপ্রা কীর্তিকে সেই অধরা প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছে, যে বাঁধনে অমিত রায় বাঁধতে চেয়েছিল লাবণ্যকে,তফাৎ এইখানে, লাবণ্য অমিতের প্রেমে শেষ ভরসা রাখেনি, কীর্তি শিপ্রার প্রেমে তা রাখতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্য আর উপন্যাসের ভাষার স্বাদ পাই মুজতবা আলীর উপন্যাসে—

আলিঙ্গন ঘনতর করে বাষ্পভরা কণ্ঠে কীর্তি বললে, 'এই তো আমার অক্ষয় সম্পদ। তোমার প্রেমেই আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে আর সবচেয়ে বড় কথা—আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানে যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাবো নবীন উৎসাহ। (খণ্ড ২, অধ্যায় ১১)

শিপ্রা রায় বিদায়বেলায় স্মরণ নিয়েছে রবীন্দ্র-প্রেম-গীতির (খণ্ড ২, অধ্যায় ১১)।

অফুরন্ত আদরে কীর্তিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যে নায়িকা, সেও স্মরণ নিয়েছে একই গানের—

কীর্তির ঠোঁটের কাছে এসে তার নিঃশ্বাস শিপ্রা আপন নাক দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়ে গুনগুন করে গাইল, 'আমাতে মিশাক্ তব নিশ্বাস/নবীন উষার পুষ্প সুবাস—' বার বার। তারপর আবার বার বার 'বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, হে প্রিয়/করুণ মম অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো'। তারপর কীর্তনিয়া রীতিতে বার বার আখর দিলে, 'অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো'। মাঝে মাঝে থেমে থেমে কীর্তির নিঃশ্বাস নিঃশেষে শুষে নিয়ে আপন বুক ভরে নেয়—তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

'তুলনাহীনা' উপন্যাসের শেষে ইয়েহিয়ার বর্বর আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে, এই আশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে, শিপ্রার রোমান্টিক প্রেম কীর্তিকে পেয়ে ধন্য হবে, এমন সুখদ পরিণামেরও ইঙ্গিত আছে। কীর্তির কথায়—'তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে একটুখানি—কেউ দেখলো—কেউ না—প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে'—সেদিনই শিপ্রা জেনে নিয়েছে কীর্তিকে। বাংলাদেশের শেষ বিজয়ের আশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে কীর্তির জন্য ভালবাসা। 'শিশুর মত সরল চোখে তাই (কীর্তি) দেখতে পেল, সেই মধু-মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি।'

সৈয়দ মুজতবা আলীর রবীন্দ্র-প্রীতি আর জীবন-প্রীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে 'অবিশ্বাস্য' আর 'তুলনাহীনা' উপন্যাস।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ধর্মীয় চিন্তা

আবদুর রউফ

মুজতবা আলী 'পঞ্চতন্ত্রে'র এক জায়গায় লিখেছেন, 'বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বখৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার বাসনা আমার নেই'। কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান ঠাট্টার ছলেও এমন কথা উচ্চারণ করতে পারেন না। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মুজতবা বোধ হয নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর তামাম লেখা খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, আর যাইহোক, ঈশ্ববের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মানুষ তিনি ছিলেন না। ইসলামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল অপবিসীম। তবে ধর্মীয় আচার আচরণ মেনে চলাব ব্যাপারে তাঁর যে কোন নিষ্ঠা ছিল না একথা তো বলাই বাহুল্য।

বাস্তবিক সর্ব অর্থেই একজন আধুনিক মানুষের পক্ষে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বরচেতনাকে এঁরা লালন করেন নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে। কোন বিশেষ ধর্মেব দ্বারা নির্দেশিত আচাব-আচরণ ও বিধি-নিষেধেব গণ্ডীর মধ্যে এঁদেব বেঁধে রাখা যায় না। তাব উপর মুজতবা আলীর মত তুখোড় আড্ডাবাজ, রসিক মহাপণ্ডিতকে বিধি নিষেধের বেড়াজালে আটকে বাখার কথা তো ভাবাই যায় না। দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার এবং রসসাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ গতায়াত। তিনি ছিলেন একেবারে সেকিউলার অর্থেই সেন্ট্‌ পার্সেন্ট মানবতাবাদী এবং সৌন্দর্যের পূজারী। মানবতার মহিমাবাহী সৌন্দর্য পদ্ম তথাকথিত পাপের পঙ্কে উদ্‌গত হলেও সেটাকে অবহেলা করার পাত্র তিনি ছিলেন না। পাপ পুণ্যের প্রতি এমন একজন ডোন্ট্‌ কেয়ার ভাবাপন্ন লোককে আর যাই বলা যাক, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান এমন কথা কোন মতেই বলা যাবে না।

বাস্তবিক, বিবিধ বিধি-নিষেধ এবং আচার-আচরণ সর্বস্ব ধর্ম যে ক্রমেই অকার্যকরী হয়ে পড়ছে, এই ব্যাপারে মুজতবা ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। 'ধর্ম' নামের নিবন্ধে লিখেছেন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের বিধান এখন প্রায় অচল। এখন সে জায়গা দখল করেছে ডাক্তার-বদ্যি, রাজনীতি বিশারদ,

অর্থনীতিবিদ কিংবা ব্যবসায়ীদের বিধান। অনেক সময় ধর্মের মোড়ক দিয়েও বাজারে চালু করা হয় এইসব বিধান। পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ এখন আর প্রবল নয়। তাই ধর্মের ব্যবহার আবর্তিত হয় সম্পূর্ণ ইহজাগতিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই। উল্লেখিত নিবন্ধের শেষাংশে মুজতবা তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না। এখন অন্য পন্থা। গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে, সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনো পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা এক জোটে দেবে ভোট।

ভাবি, কোন শ্রাদ্ধের—না, কোন বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায়'।

কিন্তু মুজতবা আলী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ধর্মের মর্মবস্তু কোন দিনই বিনষ্ট হবে না। তাই তিনি 'ধর্ম ও কম্যুনিজম্' নিবন্ধে বেশ জোর দিয়েই লিখেছেন, '....যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, 'ধর্ম গেল', 'ধর্ম গেল', কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন 'ইসলাম ইন ডেনজার' তখন অধমের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মেব এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মাবা গেলেও ইসলাম শব্দার্থে লুপ্ত হবে না। 'ইসলামে'র শব্দার্থ. 'সৃষ্টিকর্তাব ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা'। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁবই শরণ নিতে আদেশ করেছেন, তখন ঐ অর্থেই কবেছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝিবা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয। সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব''। —এই হচ্ছে মুজতবা আলীর ধর্মবোধের স্বরূপ। বাস্তবিক, এই বোধের গভীরতা বিস্ময়কর।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র বলেছেন, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 'ইসলাম'-এর পরেই মুজতবার গভীর অনুরাগ ছিল হিন্দুধর্মের প্রতি। এই বক্তব্য নিয়ে কোন রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও উপরে উল্লেখিত মুজতবার উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে বলা যায় তাঁর অধ্যাত্মচেতনার স্তরটা হয়ে গিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ। কোন

বিশেষ ধর্মের ভিত্তির উপর তিনি আর দাঁড়িয়ে ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূল্যায়ন তিনি যে পদ্ধতিতে করেছেন তাতে শুধু হিন্দুধর্ম কেন, পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শোনা যায় পরিচিত মহলে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি যে এত ভাষা জানেন, এত বই পড়েছেন, কোন বইটা তার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয মনে হয়েছে? সেই মুহূর্তে তিনি নাকি কালবিলম্ব না করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। এই যে একটা গল্প তাঁকে নিয়ে তাঁব বন্ধুবান্ধব মহলে চালু হয়েছে, এ থেকে তাঁর আধ্যাত্মচিন্তার ধরনটা অনেকখানি টের পাওয়া যায। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'যত মত তত পথ'-এ বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের প্রতি গভীর প্রত্যয় ছিল মুজতবারও। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে তাঁর আলোচনাব লম্বা উদ্ধৃতি দেয়াটা এখানে বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' নিবন্ধে মুজতবা আলী লিখেছেন, 'আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মত-বৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজেব ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড। সমগ্র সমাজেব অপূবণীয ক্ষতি— 'মহতী বিনষ্টি' হয ঃ এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয় নি? তবে কেন ঐ কাবণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

'পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালীকাল্টে' কন্‌ভার্ট করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন এদের বিরোধ যেন লোপ পায়। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমতের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুজতবা আলী উল্লেখিত নিবন্ধের শেষ অংশে লিখেছেন, 'পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের

সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মত পরে আল্লা আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

'অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজিমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন—'হে ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব'। আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব'। অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বর রূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার এর নূতন নাম করেছিলেন 'হেনোথেয়িজম'।

'পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থা বরণ করেছিলেন, অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্পন্ন পন্থাই বরণ কবেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা'।

'এই করেই তিনি সর্বধর্মেব বসাস্বাদন কবে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন'।

'কোন বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে, তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেন নি'।

'অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না'।

'বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগে হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি'।

'সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ

অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে'।

এই দয়াময়ের উপর যাঁদের আস্থা আছে তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা করে বলতে পারি পরমহংসদেবের ধর্মমতের ব্যাখ্যা যেরকম পরম নিষ্ঠায় মুজতবা আলী করেছেন, এরপর তাঁর নিজের ধর্মবোধের স্বরূপ বোঝাতে পৃথক কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। তবুও পবিশেষে বলতে চাই, ধর্মীয় চেতনার এই বকম একটা স্তরে নিজেকে উন্নীত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় জন্মসূত্রে পরিবার এবং সমাজ থেকে যে ধর্মীয় সংস্কারগুলো আমরা পাই সেগুলোকে যাচাই করে দেখার মানসিকতা। কারণ, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এই সংস্কারগুলো এমনই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে ধর্মীয় দৃষ্টির সংকীর্ণতা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। শিক্ষিত বাঙালিদের কতজন সচেতনভাবে এই যাচাই করে দেখার কাজটা করেন সেটাই এখন গুরুতর প্রশ্ন। যাঁদের আমরা বলি মৌলবাদী বা ধর্মীয় সংকীর্ণতাবাদী তাঁদের পক্ষে সম্প্রতি এই সংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষিতদের ভিতর থেকেও দেদার সমর্থক জুটিয়ে নিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাঙালি জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় এই কারণেই। সৈয়দ মুজতবা আলীর ধর্মীয় চিন্তা সম্পর্কে আলোচনাও তাই আজ বড্ড বেশি প্রাসঙ্গিক।

পঞ্চতন্ত্র

কৌশিক রায়চৌধুরী

।। এক ।।

ভারতবাসী সম্পর্কে আর যাই নিন্দামন্দ করুন না কেন, অতিবড় শত্রুও একথা কবুল করতে বাধ্য যে আমরা গল্প শুনতে বড্ড ভালোবাসি।

ছেলেবেলায ঠাকুমা, ঠাকুদ্দারা গত হয়েছেন। কৈশোরের মাস্টার-মৌলানারাও বিস্তর আশাবরী কিস্‌সা শুনিয়ে অবসর নিয়েছেন। ইদানীং মন্ত্রী-আমলা-পুরুত-পুলিশ-ইমাম থেকে শুরু করে এন্তার নেতা ও ক্যাডাবরা মওকা পেলেই হরেককিসমের রূপকথা, উপকথা শুনিয়ে যাচ্ছেন আমাদেব। আমবা ছেঁড়া নেংটি পবে, গালে হাত দিযে শুনছি আর শুনছি। তাতে আব কিছু না হোক, শিক্‌সা তো হচ্ছে।

এই ঐতিহ্য কিন্তু আজকেব নয়। আজ থেকে দেড়শো বছরেবও বেশী আগে এক ডাঙ্গর ফরাসী পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, ইন্দো-ইউরোপীয বংশেব নানা ভাষা ও বয়ানে প্রচারিত হতে হতে যত প্রাচীনতম গালগল্প আজও তামাম দুনিয়ার গল্পখোরদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, তার প্রায সবগুলিবই জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ। সেই সব গালগল্পের মধ্যে কুতুবমিনার হল প্রায় দু'হাজার বছর আগে লেখা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'। মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমর শক্তির তিন অকাটমূর্খ পুত্র ছিল। বিস্তর বিজ্ঞ বিদগ্ধ শিক্ষক যখন তাদের পেটে কামান দেগেও 'ক' বার করতে পারলেন না, তখন ডাক পড়ল ধুরন্ধর পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মাব। তিনি মাত্র ছ'মাসে রাজপুত্রদের অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র তাবৎ বিদ্যায পারদর্শী কবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কি উপায়ে? স্রেফ গল্প বলে। সেইসব গল্পের কম্বলে মুড়ি দেওয়া শিক্ষা-বটিকার সংকলনই হল 'পঞ্চতন্ত্র'।

সৈয়দ মুজতবা আলীও 'পঞ্চতন্ত্র' রচেছিলেন শিক্ষানবীশ লেখকদের 'ব্যাল ল্যাৎর-এর স্টাইল' শেখানোর জন্য। যদিও আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' বিষ্ণুশর্মার অনুবাদ

নয়, অনুকরণও নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আধুনিক রম্যরচনার সংকলন। 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা নিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সমাদৃত হয়। তার চোদ্দ বছর পর ১৯৬৬তে দ্বিতীয় পর্বের প্রকাশ। '৪৬ থেকে '৬৬—এই কুড়ি বছর রচনাগুলির কালসীমা। নামটুকু ছাড়া বিষ্ণুশর্মা ও আলীর কেতাবে মিল মাত্র দু'জায়গায়। এক, দু'জনেই গল্প বানানো, সংগ্রহ ও পরিবেশনার জাদুকর; দুই, দুজনেই গালগল্পের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে রাখেন দ্যুতিময় মরাল—প্রথমজন প্রকাশ্যে, দ্বিতীয়জন প্রচ্ছন্নভাবে।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সতীর্থ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা রম্যরচনার পাকা বুনিয়াদ তৈরী করে দিয়ে গেছিলেন। বাঙালী পাঠকের অসীম সৌভাগ্য, তারপর প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসুর মত বিদগ্ধ রসিকজন এই পথে আলো জ্বেলেছেন। এঁরা কেউই নেহাত হালকা গুলতানিতে পাতা ভরাননি, বরং রম্যরচনা যাতে হালকা হতে হতে লাঠিলজেন্স বা ঝুমঝুমির মত না হয়ে যায় সেই বাবদে 'রম্য' কথাটারই নির্বাসন চেয়েছেন কেউ কেউ। তার বদলে এ জাতীয় লেখাকে বলেছেন ব্যক্তিগত রচনা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ—আরো কত কি! লঘু ভঙ্গীতে গভীর কথা বলবার এই ঐতিহ্যময় প্রদীপটি সেদিন অবধি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন যাযাবর, রূপদর্শী, সুনন্দ, এবং সত্যপীর ওরফে সীতুমিঞা ওরফে টেকচাঁদ ওরফে রায় পেথৌরা ওরফে গুলম্‌গীর সৈয়দ মুজতবা আলী। এখন সকলেই গতায়ু। এখন রসিকতার জায়গা নিয়েছে ইয়ারকী, বৈদগ্ধ্যের জায়গায় এসেছে কোটেশান-কন্টক, গভীরতার বদলে যৌনতা আর কথামৃতের ককটেল।

'পার্সোনাল এসে'র পথিকৃত মঁতেইন দিব্যি গেলে বলেছিলেন, আমি ছাইপাঁশ যাই লিখি না কেন, নিজের চারপাশটায় যা দেখেছি, খুঁটিনাটি যা মনে আসছে তাই লিখছি। এতে কার কি উপকার হবে জানিনা তবে আমার বন্ধুজনেরা আমাকে খুব চিনতে পারবেন। কারণ হক কথাটি হল আমার লেখার বিষয়

আমি নিজে। আলী সাহেবের লেখার বিষয়ও স্বয়ং তিনি। দেশ বিদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষ তাঁর উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাই তিনি লিখেছেন আন্তরিক, আটপৌরে ও সরস ভঙ্গীতে।

।। দুই ।।

'পঞ্চতন্ত্রে'র পাতায় যে মুজতবা আলীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় তিনি একজন আপাদমস্তক আধুনিক মানুষ। বিশ শতকের সূচনায় তাঁর জন্ম। পরাধীনতার সমুদ্র থেকে তখন একটু একটু ক'রে মাথা তুলছে আজাদীর স্বপ্ন। আলী বড় হয়েছিলেন সেই স্বপ্নের সঙ্গে কদম ফেলে। বুদ্ধিজীবী পরিবারের জাতক তিনি, ছেলেবেলা থেকে পাঁড়-পড়ুয়া। আসমানী কাগজে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পেয়ে নিজেই ঠিক করেছিলেন, যেতে হবে শান্তিনিকেতনে—বিশ্ববিদ্যার 'মহাঅম্বরমাঝে'। সেখানে না আছে ডিগ্রির স্বীকৃতি, না চাকরীর নিশ্চয়তা, তবু ইংরেজের হুকুমবরদারীও তো নেই। শান্তিনিকেতনের শিশিরভেজা ঘাসের উপর হেঁটে বেড়ান শুধু ব্রিটেন নয়, তামাম দুনিয়ার জ্ঞানী মানুষেরা। ইউরোপকে চেনার একটি নয়, অনেকগুলি দরজা খোলা থাকে। কোন দরজায় বেনোয়া বা সিলভাঁ লেভির মৌরী হাসি মুখ, কোথাও বিধুশেখরের শাস্ত্রীয়তা, কোথাও বগ্‌দানফের আতিথ্য। সিংদুয়ারে স্বয়ং বিশ্বকবি। তিনি ছাতিমতলায় বসে এবেলা শেখান কিটসের কাব্য তো ওবেলা বোঝান উপনিষদ। এর পূরবী আশীর্বাদ করে ওর বিভাসকে।

মুজতবা অন্তত পনেরটি ভাষা জানতেন। সেই শিক্ষার সূচনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। তারপর আলিগড় হয়ে কাবুল, জার্মানী, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, কায়রো, সেখান থেকে একগুঁয়ে ঘুড়ির মত আবার দেশের আকাশে। বরোদা, বাঙ্গালোর, বগুরা, কটক, কলকাতায় গোঁত্তা খেয়ে ফের সেই শান্তিনিকেতনে এসে উড়ান সাঙ্গ হল। বিশ্বভারতী যেন তাঁর জায়নামাজের কাপড়টি। তার উপর দাঁড়িয়েই চন্দ্র দেখা, সূর্য দেখা। তাঁর পায়ের তলায় সর্ষে ছিল। যেখানে গেছেন সেই মাটিতেই ছাপ পড়েছে পায়ের, ফিরে এসেছেন সেই মাটি পায়ে মেখে। দেশবিদেশে ছড়িয়ে ছিল অগণিত বন্ধুমণ্ডলী—মহারাজা থেকে ফকির। এত বিভিন্ন স্তরের ইয়ারের সঙ্গে দিলচসবি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মত হয়ে মিশতে হয়, শিখতে হয় আর শেখাতেও হয়। তাদের ভাব-

ভাষা ভালোবাসাকে জানতে হয়। আড্ডাবাজ হতে হয়।

আলী ছিলেন পাদনখশিরে আড্ডাবাজ। তাজমহল বা পিরামিডের চেয়ে নাকি তাঁকে ঢের বেশী টেনেছে হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। কঁহা কঁহা মুল্লুক পাড়ি দিয়েও মন পড়ে থেকেছে পাড়ার চায়ের দোকানটিতে। কিম্বা সেই বসন্ত কেবিন—'আমার যা কিছু জ্ঞানগম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি পড়তি মাল কুড়িয়ে'। মক্কায় হজ করতে গিয়ে একদল বঙ্গসন্তান সারাক্ষণ কিচিরমিচির ক'রে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম কিনেছিলেন। সুদূর কায়রোয় বসে তাঁদের সুখ্যাতি শুনে গুষ্ঠিসুখের গর্বে ছাতি দশহাত হয়েছে আলী সাহেবের। জলে, স্থলে, দেশে, বিদেশে, সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর বৈচিত্র বোঝানোর জন্য কায়রোর উদাহরণটিই যথেষ্ট। সেখানকার কাফের আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন—এক, ওয়াহহাঁব আতিয়া (কপ্ট ক্রীশ্চান, ফারাওদের বংশধর), দুই, জুর্গো (ফরাসী কিন্তু আরবী ভাষার কবি), তিন, মার্কোস (গ্রীক, রাণী ক্লিয়োপেত্রার কুটুম্ব), চার ও পাঁচ, রমজান বে ও সজ্জাদ এফেন্দি (মিশরী মুসলমান) এবং ছয়, 'বাংলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি অধম' মুজতবা আলী সাহেব। ইনি পূর্বোক্তদের বসন্ত কেবিনের ঠিকানা দিয়ে আসতে ভোলেন নি।

একথা কে না জানে, সার্থক আড্ডাবাজ মাত্রেই পার্থিব-অপার্থিব ও মহাপার্থিব যে কোন বিষয়ে কথা বলবার অধিকারী। আলীও তাই। শুধু আরো দশটা ঠেকবাজের সাথে তাঁর তফাৎ হল, কোন বিষয়েই তিনি পল্লবগ্রাহী নন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থবিদ্যা, বিজ্ঞান—আরো নানা বিষয়ে তিনি অনুসন্ধিৎসু ও পণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ আড্ডাও ইতিহাসে নতুন নয়। 'ছাত্র বনাম পুলিশ' রচনায় আলী হাজার তসলিমাৎ স্মরণ করেছেন গ্রীক কলোসিয়ামের মাতাল আড্ডাবাজদের—প্লাতো, সোক্রাতেস, আরো কত জনা। কিন্তু আলী তো শুধু গল্পে নন, মুসাফেরও বটেন। তাঁর শতেক ঠেকে হাজার বন্ধু, হাজার লোকের সাথে লক্ষ মতের বিনিময়। ঈশ্বর যেন তাঁকে একটা জীবন দিয়ে বলেছিলেন—'যাও, এই তোমার জ্ঞানপীঠ। সূর্যাস্ত না হওয়া অবধি যতদূর ছুটতে পারবে,

আলোকিত করতে পারবে ততদূর, দখল করতে পারবে ততখানি জমিন'। ঐ আদেশ শুনে লোটাকম্বল কাঁধে তুলেছিলেন সেই কবে, শেষ দিন অবধি তা নামিয়ে রাখার সুযোগ পাননি। পাননি বলেই লেখা সম্ভব হয়েছিল 'পঞ্চতন্ত্রে'র মত বই।

।। তিন ।।

মুজতবা আলী সৈয়দবংশের সন্তান হয়েও, রিলিজিয়ন অর্থে ধর্মকে বা কোন শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে মেনে জীবন কাটাননি। আচারের বেড়ায় আবদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টি থেকে দেখলে, কোন ধর্মই তাঁর জীবন যাপনকে অনুমোদনীয় বলে মনে করবে না। অথচ তিনি খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, ইসলাম—বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছেন সেই জীবনের নানা উপাদান। জন্মসূত্রে তিনি সংখ্যালঘু ভারতীয়। তাঁদের সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ধর্ম বিষয়ে সংখ্যাগুরুদের অজ্ঞতা সীমাহীন। 'মা মেরীর রিস্টওয়াচ' রচনায় আলী তা নিয়ে ঈষৎ ক্ষোভও ব্যক্ত করেছেন এবং বারবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মণিমুক্তাগুলি চয়ন ক'রে একটি সুতোয় গাঁথবার চেষ্টা করেছেন। সেই সুতোটি মনুষ্যত্বের। আলী মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে চান এবং মনুষ্যত্ব অর্জনের সহায়কশক্তি হিসেবে দেখেন ধর্মকে—বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে বর্ণিত প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণীকে।

ছাত্র জীবনের গোড়া থেকেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ছিল তাঁর অন্যতম আকর্ষণ। পরে এ বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। 'পঞ্চতন্ত্রে'র প্রথম রচনাতেই তিনি ঘোষণা করেছেন, আল্লা জ্ঞানদান করেন কলমের মাধ্যমে, গণপতি স্বয়ং লিখনবিদ এবং বাইবেল শব্দের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। এ জাতীয় বাক্‌বিস্তার থেকে বোঝা যায়, বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষীর দেশ ভারতে বসে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বকে তিনি শুধু অ্যাকাডেমিক নয় বরং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছিলেন।

আমরা জানি যে ধর্ম একদা মানুষকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিল, মোটামুটি নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই তা এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সংখ্যাগুরুদের শোষণ করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আলীও জানেন—'ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভেন বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাদেরই, যাঁদের কিংডম অব্ দি আর্থ বা পৃথ্বীরাজ্য আছে'। তিনি

বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত ক'রে বোঝান, যে ভগবান মর্ত্যে আমাকে দুমুঠো ভাত দিতে পারেন না, তিনি স্বর্গে নিয়ে গিয়ে কোলে বসিয়ে অমৃত খাওয়াবেন—এ একটা বিরাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনীতি কিভাবে ধর্মের বাঘ নখ হাতে এঁটে শোষিত মানুষদের পেট চিরে দেয় পঞ্চতন্ত্রের পাতায় পাতায় আলী সেই তথ্য সাজিয়েছেন। নাজীদের উত্থান তো হালের ঘটনা, ওল্ড টেস্টামেন্টের ইহুদী বিদ্বেষ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন ধর্মপুস্তক জাতিবৈরিতাকে লালন করেছে হাজার বছর ধরে। পৃথিবীর প্রতি একশোটি দাঙ্গার অন্তত নব্বইটি শুরু হয় ধর্মের নামে, প্রতিটি দাঙ্গার সঙ্গে হয় লুঠ, প্রত্যেক লুঠোর গায়ে থাকে নামাবলী। লুঠেরা কুলগুরু সুলতান মামুদের জবানীতে আলীর কলম তীব্র ব্যঙ্গে ফালাফালা করেছে ঐ নামাবলী। সোমনাথ মন্দিরের ধনভাণ্ডার লুঠতে হলে মামুদকে সিন্ধুদেশের মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে হত। তারা তো বিধর্মী নয়। তাহলে উপায়? মামুদের সিদ্ধান্ত 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির তুল্য—তারা হেরেটিক; অতএব আক্রমণ করা যায়'। ধর্মপ্রাণ, ধর্ম ব্যবসায়ী এবং ধর্মান্ধ—তিন ধরনের মানুষকেই, যথাযোগ্য আন্তরিকতায় প্রেম ও ঘৃণায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেছেন 'পঞ্চতন্ত্রে'র লেখক।

ইহুদী কবি হাইনে শুধুমাত্র আপন সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থায় নারাজ ছিলেন, কারণ বাপ-ভাইয়ের গণ্ডিটা টপ্‌কে বিশ্ববাসীকে বেরাদর বানানোর ব্রত ছিল তাঁর। আলী সাহেবও তেমনি সম্প্রদায়, প্রদেশ, দেশ যাবতীয় বেড়া ডিঙোতে ডিঙোতে বৈশ্বিক হবার ফিকির করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ীতে পলান্ন না খেলে অথবা দুই ইহুদী পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী একই পরবের দাওযাত দু'দুবার হাসিল না করলে ঐ পেটুক মানুষটির ধর্মরক্ষা হত না। জর্মন পুলিশের হাতে বন্দী কার্লোকে বেরাদর ভাবতে না পারলে, পাউলোর মা'কে নিজের মা ভাবতে না পারলে, 'সৈয়দের ব্যাটা' বাঁচবেন কি ভাবে? এইসব দেখে শুনে অধ্যাপক লেভী আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়'। বংশধর অসংখ্য হয়েছে কিনা জানিনা, তবে 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে যে অনেক মণ্ডুক-পাঠক তাঁদের কূপের বাইরে ঝাঁপ দেবার জব্বর প্রেরণা পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ভারতের যক্ষ্মা স্যানেটোরিয়ামে অসুস্থ স্বামীর সেবারতা বধূটিকে তাঁরা ভোলেন নি। যার মাথায়

হাত রেখে আলী বলেছিলেন, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো!' সে জানিয়ে ছিল 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি'। পাঠক ভোলেন নি তুর্কী টুপি পরা হিন্দু ব্যবসায়ী মুথহানার কথা, যার সরল যুক্তি, হিন্দু হয়ে যদি কেরেস্তানী সুট পরা যায় তবে প্রতিবেশী মুসলমানদের আপন করার তাগিদে মাথায় তুর্কী টুপিই বা চড়ানো যাবে না কেন?

মুজতবা আলী কিন্তু নাস্তিক নন। অন্তত 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে চিহ্নিত কবাব লোভ হয়। তবু, এই সহজ মার্কা লাগানোর বদলে এভাবে ভাবা ভালো যে, তিনি Empiricism ও Rationalism এই দুইযেব সমন্বয়ে, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির আলোকে ধর্মকে বুঝতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত, তাঁর ছাত্রটিও ছিলেন কবিমনের অধিকারী। স্বভাবতই গুরুদেবের প্রভাবে, সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে মনুষ্যধর্মের সংযোগ বিষয়ে ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। 'পঞ্চতন্ত্র'কারের ধর্মচিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীব তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁর ধ্বজা বহন করে চলেছে। এখানে ধর্মের বহুরূপতা ও ঐক্যের আলোচনা বারবার কবা হলেও, নাস্তিকতার প্রসঙ্গটি বিস্তারিত হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো বছর আগে থেকে গ্রীসে অথবা ভাবতে নাস্তিকতার, বস্তুবাদী চোখ দিয়ে ধর্ম ও ঈশ্বরকে বিচার করার, প্রবণতা পুষ্পিত হয়েছিল। 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাতায তাব কিন্তু হদিশ নেই।

'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ' রচনাটিতে এক আরবী লোককথার অবতারণা করেছেন লেখক। যার মরাল হল মানুষ যেদিন অল্‌হক্ ও অল-জমীলের সাধনা ছেড়ে জড়বাদকে আঁকড়ে ধরবে, সেদিন স্বর্গের সীমানাও তার অধিগত হবে, সে বিশ্বভুবনকে খেয়ালমাফিক বদলে নিতে চাইবে। তখনই আসবে কিয়ামৎ বা মহাপ্রলয়। ইদানীং সর্বত্যাগী শঙ্করের চ্যালারাও ভোগসুখে মত্ত। সুতরাং কিয়ামতের ঘণ্টা বাজতে আর দেরী নেই। এই পর্যন্ত পাঠ করার পর মনে হয় যে কোটি কোটি মুর্খ মানুষ সমবেত জ্ঞানী সিদ্ধান্তে ঈশ্বরকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করছেন বা করবেন, তাঁরা সর্বনাশ ঘটাবেন বিশ্বের। কিন্তু লেখাটির শেষ লাইন—'কী দরকার সেই মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—'। অর্থাৎ আলীর তত্ত্ববুদ্ধি আর অভিজ্ঞতায় বিরোধ বাধছে। তাঁর মনে হচ্ছে, কিয়ামৎ আসুক। কিন্তু এই

মনে হওয়াটা শেষতক আটকে থেকেছে অবাজনীতির উঠানে।

।। চার ।।

সমাজবদলের প্রয়োজনীয়তা বা পদ্ধতি বিষয়ে বাকবিস্তর না করলেও, পঞ্চতন্ত্র'কার সমাজবিবর্তনের পর্যায়গুলি সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিব। তিনি জানেন সামন্তযুগের পর বুর্জোয়া সমাজ আলোকস্তম্ভের মত জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু তার নীচেও চারিতরফ আন্ধেরা। 'ইস্কিলাস-শেলী-স্পিটলার' রচনায় এর সাক্ষ্য আছে। এইসময় দেবতাব অনুশাসনে সমাজকে বেঁধে ছিলেন ইস্কিলাস। তারপর নতুন মানব ধর্মের উত্থান ঘটল। শেলী আঁকলেন মুক্ত প্রমিথিউসকে। এখন এসেছে দেবতা বা নবদেবতা নয়, অর্থদেবতাব কাল। কলকারখানার ধোঁযাশার মধ্যে দিয়ে মিছিল করে চলেছে বণিক, রাজপুরুষ, পাদ্রী, পুলিশ। এখন নতুন বিদ্রোহের কাব্য লিখছেন স্পিটলার। এই পোড়া দেশেও একজন স্পিট্লাবকে চাই। বিদ্রোহের প্রয়োজন যে এখনও ফুরাযনি!

মুজতবার জীবনের প্রথমার্দ্ধ কেটেছে পরাধীন ভাবতে। অসহযোগ আন্দোলনেব কালে ছাত্র ধর্মঘটে যোগ দেবাব অপবাধে স্কুল ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আর কখনও না জড়ালেও ইংবেজ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা তিনি বহন করেছেন আজীবন। 'পঞ্চতন্ত্রে' সেই ঘৃণার অতুলনীয় ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। 'চরিত্র পরিচয়' রচনায় সর্দারজী যখন বলেন, যুদ্ধে ফবাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্য চর্চা, জার্মানী হারলে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা লোপ পাবে, আর ইংরেজ হারলে উঠে যাবে বেইমানী—তখন সর্দাবজীব দাড়ির আড়ালে মুজতবার ইন্দ্রলুপ্ত মুখখানি দিব্যি চেনা যায়। ইণ্ডিয়ান নেটিভদের উন্নতিব জন্য নাকি 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' বহন করতে হত ইংরেজদের। সেই ভণ্ডামি ধরে ফেলেছিলেন জেরম কে জেরম। জেরমের রচনার যে বঙ্গানুবাদ আলী কবেছেন, তা পেশ করার লোভ সামলানো দায—'বার্ডেন যদি হেভীই নয়, তবে ওটা বইছিস কেন মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক্য-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয়না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঘাড়ে'।

'৪৭ এর ১৫ই আগস্ট ভারতবাসী যে আবির উড়িয়েছিল তার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই বোঝা গেছে 'ইয়ে আজাদী ঝুঠা হ্যায়'। 'পঞ্চতন্ত্র'কার

দেখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আগ্নেয় ঘোষণা সত্ত্বেও, ল্যাম্পপোস্টগুলি ফাঁকা থাকছে, কালোবাজারীরা যে যার টাটে বসে জপে যাচ্ছে শুভলাভ মন্ত্র। তাঁর সখেদ উপলব্ধি, একদা ভাবা গেছিল, স্বরাজলাভ মানেই 'পাঁচ আঙ্গুল ঘিয়ে' আর 'গর্দান ডেগ এর ভিতর ঢুকিয়ে' ভোজন উৎসব। কিন্তু স্বরাজের পর দেখা গেল, পরনে যে নেংটিটুকু ছিল, তাও টেনে নিতে চায় দেশী শোষকেরা। বেচারা অফিস-অ্যাপ্রেন্টিস্ বছরের পর বছর শিক্ষানবীশ থেকে, মান-ইজ্জত-বিত্ত-পোশাকের জৌলুস সব খুইয়ে ভাবে, উলঙ্গ পাগলটা বুঝি 'সিনিয়র অ্যাপ্রেন্টিস্'! আমরাও ক্রমশ অ্যাপ্রেন্টিসশিপে সিনিয়র হচ্ছি। প্রাক্ সাতচল্লিশের ভারতীয় বিপ্লবীরা শুধু নলচে বদলের কথা ভেবেছিলেন, খোলটাকে ভাবেন নি। সীতুমিঞা জানেন—

'শাদরী পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল।'।

জানেন যে আমরা স্বরাজলাভের সাথে সাথেই মার্জার বধে উদ্যত হইনি, তারই কিমৎ দৈনন্দিন অপমান, পিঠ ও পেটে শতশত পয়জার।

খোলনলচে একসাথে বদলের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বীজটির সন্ধান করতে হয়। অন্তত একটি লেখা পড়ে মনে হয়, আলী সাহেব বেস ও সুপারস্ট্রাকচারের দ্বন্দ্বকে বুঝতে চাইছেন। অর্থনৈতিক বুনিয়াদটি না পাল্টালে উপবিসৌধগত পরিবর্তন নিস্ফল—একথা বোঝাতে চাইছেন। লেখাটির নাম 'মিজোর হেপাজতী'। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিক্ষুব্ধ পার্বত্য জাতিসত্তা আজ সারা ভারতেরই শিরঃপীড়া। আলী আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে এই নিয়ে গভীর দরদ ভরা আলোচনা করেছেন। যাদের কাছে শিক্ষা স্বাস্থ্য-চাকরী কৃষিব্যবস্থা-জীবনায়োজনের আধুনিক উপকরণগুলির একটিও আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি, তারা সরল বিশ্বাসে আমাদের উপর আস্থা বজায় রেখে চলেছে বহুদিন। কিন্তু অবস্থাটা বেশদিন এরকম থাকবে না। ওঁদের অসন্তোষের অর্থনৈতিক কারণটিই প্রধানতম। সেইটা দূর করা চাই। এই উপলব্ধির পর মুজতবা বুঝেছেন, এতে 'অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন!' মন্তব্যটিতে কি ঈষৎ ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে? তাঁর তো জানা ছিল নিশ্চয়ই, অর্থনৈতিক সংস্কার আর ভিত্তি কাঠামোর বদল একার্থক নয়, লেনিন, শুম্পেটার আর জামবার্টের তত্ত্বের প্রভেদ প্রচুর। তিনি

কি ভেবেছিলেন, কোন পরশপাথর দিয়ে, মিজো অসন্তোষের অর্থনৈতিক কারণগুলির স্থায়ী উপশম ঘটানো যায়? তাহলেও, 'পঞ্চতন্ত্রে' সে প্রশ্নের উত্তর নেই।

।। পাঁচ ।।

'পঞ্চতন্ত্রে' আছে ভালোবাসার কথা—দেশকে, দেশের মানুষকে, 'বাংলার শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল দেহলি প্রান্ত'কে। হয়ত দীর্ঘ প্রবাসজীবন কাটাতে হয়েছে বলেই মুজতবাব দেশপ্রেমে নস্টালজিয়া এত তীব্র। জাহাজের মোদেশীয় সহযাত্রিনী প্রশ্ন কবেছিলেন, প্যাবিস, লণ্ডন, ভিযেনা এমন সব ঝাঁ চকচকে শহর দেখেও, কেন আবার আঁধার ভারতেব এক এঁদো শহরে ফিরে যাওয়া? আলীসাহেব ঘাড় চুলকে বলেছিলেন 'আমার যে মা রয়েছেন। .. মা যা, মায়ের শহরও তা'। এই মায়ের শহর হঠাৎ হানা দিয়েছে জিনিভা লেকে প্রমোদ ভ্রমণের সময়। মনে হযেছে—এযেন 'হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। .মনে পড়েছিল পদ্মার কথা।...রেলিঙের পাশে বসে তারই উপব মাথা কাৎ কবে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো সাদাব মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পদ্মাব জল রাঙা হয়ে গেল. মহাজনী নৌকার পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায গোলাপী মেঘে নিয়েছে, দূবেব পাখি আর এ পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দন কাননের মেহেদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে। ঐতো সূর্য, ঐতো সবিতা'! আলীর দেশপ্রেম কখনোই শুধু প্রকৃতি নির্ভর নয়। জিনিভায ব'সে গোযালন্দের স্মৃতিচারণ পদ্মা বর্ণনাতেই শেষ হয় না, ভেসে ওঠে তাঁবই বিছানায ঘুমিয়ে পড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সরল মুখখানি। এক শুভ্রকেশ জার্মান মণীষী অনেক আগেই বলে গেছেন, মানুষ প্রাকৃতিক ও প্রকৃতি মানবিক। আলী সাহেবও যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মানুষের হাতের ছোঁয়া, জীবনের স্পন্দন কিম্বা মানবিক মহিমার অস্তিত্ব নেই—সেই নির্জন নিসর্গ বর্ণনায় আগ্রহ দেখাননি।

'মুসাফির' কেতাবের কৈফিয়ৎ অংশে মুজতবা জানিয়েছিলেন, তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন অতিশয় অনিচ্ছায়, গত্যন্তর ছিলনা বলে। প্রতি আশ্রয় লাভের পর ফের বেরিয়েছেন আরো বেশী অনিচ্ছায়, নিতান্ত বাধ্য হয়। এই অতিশয়োক্তির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সত্যি আছে। বিশ্বভারতী থেকে পাশ করবার

পর তিনি এমন জায়গাতেই চাকরী বা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারতেন যেখানে ঐ ডিগ্রি স্বীকৃত। কতকটা এই তাগিদেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপকদের আমন্ত্রণে তাঁর কাবুল যাত্রা অথবা ব্রিটিশ-বিরোধী জার্মানী বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া। বিদেশী ডিগ্রির পালক না গুঁজলে উচ্চশিক্ষিত ভারত সন্তানের মুকুটের শোভা হয় না। আলী সাহেব নিজে ফরেন ডিগ্রিধারী হলেও, তাঁর দেশপ্রীতির তির্যক প্রকাশ ঘটেছে এই 'ফরেন ভূত' প্রসঙ্গে। সেই সুদূর অতীত থেকে ইংরেজরা কাঁধে চাপার আগে অবধি বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে— এ দেশীয় ছাত্ররাই শুধু নন, বিদেশীরাও জ্ঞানচর্চা করতে আসতেন তক্ষশীলা, বারাণসী, উজ্জয়িনী, বৃন্দাবন দেওবন্ত, রামপুর, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, ঢাকা, সিলেটে। এখন আমরা বিদেশ যাই। বোতল ভর্তি বিদ্যা উল্টে ফেলে তলার গর্তটুকু ভরে আনি ফাউ এ। ইংরেজ বিদায় নিয়েছে ঢের দিন তবু অবস্থা বদলায়নি। কারণ 'পরাধীনতার মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায়'।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রসের অখণ্ড জগৎকে চিনেছিলেন আলী। 'পঞ্চতন্ত্রে'র নানা লেখায়, ছবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, মার্গসঙ্গীত, ইউরোপীয় সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যাপারে তাঁর সমঝদারি, পাণ্ডিত্য ও জাগ্রত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় মেলে। যেমন ঐ 'মিজোর হেপাজতী' লেখাটি। মিজোদের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাটির গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে তাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা ফেঁদেছেন আলী সাহেব। প্রশ্ন তুলেছেন, মণিপুরী নাচের আশ্রয় রাধাকৃষ্ণের লাস্যময় লীলা। কিন্তু অবতরণ নৃত্যে দুর্দম বলিষ্ঠতা কেন? একি পার্বত্য উপজাতিদের প্রাক্‌বৈষ্ণব সাংস্কৃতিক অবশেষ? গবেষকরা ভেবে দেখতে পারেন। তাঁরা ভাবতে পারেন আলবের্ট শোয়াৎসারের জীবনী আলোচিত পর্যবেক্ষণটি নিয়েও। ভারতীয় সাগরেদের শ্রুতিতে অন্যান্য ইউরোপীয় সঙ্গীত-স্রষ্টাদের তুলনায় সেবাস্তিয়ান বাখের আবেদন সহজতর। কেন? তাঁর ধর্মসঙ্গীতের সাথে আমাদের প্রার্থনাগীত কি কোন ঐশী সাদৃশ্য অনুভব করে?

মারহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকে নিয়ে 'পঞ্চতন্ত্রে' দুটি রচনা আছে। যেখানে রম্যরচনাকারকে ছাপিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক। অতিযত্নে, দু একটি ছোটখাটো ঘটনা এঁকেছেন আলী। তার পটে ফুটে উঠেছে ওস্তাদের দুটি আসামান্য প্রোফাইল। একদিন বরোদায় আলীর কুটীরে ফৈয়াজ খাঁর মেঘমল্লার গায়ন শুরু

হতেই বাইরে বৃষ্টি। শ্রোতারা বাহ্‌বায় বে-এক্তেয়ার। খাঁসাহেব কিন্তু বিষণ্ণ, মাথা নীচু, তিনি জানেন, যে যাই বলুক 'আমি কি সত্যিই গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি?' দ্বিতীয় প্রোফাইলটি লখনৌ বেতার কেন্দ্রেব অডিশনিং হলে। আপনি কি কি রাগ জানেন? ফর্মে এই প্রশ্নটির উত্তবে তিনি লিখেছেন—তোড়ি, শুধুই তোড়ি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'পঁচাশ সালসে তোড়ি গা রহাহুঁ—অভী ঠিক তরহসে নিকলতী নেহী'। বর্ণনাব গুণে, ওস্তাদেব শৈল্পিক অতৃপ্তি ও বিনয় আমাদেব মুহূর্তে ছুঁয়ে যায। 'ঘন অন্ধকারে ধ্রুবতারাব মত' দেখতে পাওয়া যায় খাঁ সাহেবেব বিষণ্ণ চোখ দুটি।

// ছয় //

ফেয়াজ খাঁ, শ্বাযাৎসার, নন্দলালেব মত স্বনামধন্য নয, এমন অনেক সাধাবণ, অতিসাধারণ, এমনকি নামহীন মানুষের চবিত্রও আঁকা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রে। এঁদেব সঙ্গে মুজতবার দেখা হয়েছে সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য নানা স্থানে, শহবে, গ্রামে বিচিত্র পবিস্থিতিতে। ভ্রমণবিবরণীগুলো যেন তাঁর অপেরাগ্লাস, যার মধ্যে দিযে দেখে, দূবকে কাছে আনেন, নিকটকে ক'বে দেন দূবতর। এই কাছে দূরের মানুষগুলো অনামী হলেও, মনুষ্যত্বের নানা মাত্রা সংযোজন কবে কেতাবে। অনেক সময পাঠকের গড়ে ওঠা পূর্বধারণাকে ভেঙে দেয। যেমন প্রাগ শহরের রাস্তায় হাবিযে যাওযা বেকুব দক্ষিণী বৃদ্ধটি। তাঁর উদাবতা, বোকামি, রসবোধেব ভিযেনে পড়ে পাঠকেব মন যখন টৈটম্বুব, তিনি তখন পুবনো দিনের গল্প ফাঁদেন---'আমি বড় সুখী ছিলাম'। কিন্তু অচিরাৎ জানা যায এই মানুষটি জন্মভিটেয় সপবিবাবে বেড়াতে গিযে, বাইশ-ঘণ্টাব মধ্যে একে একে হারিয়েছেন ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীকে। তাবপর সঞ্চিত অর্থ খবচ ক'বে বিদেশের পথে পথে ঘুরছেন বেদনাহত মনটিকে শান্ত করার জন্য। বেদনার মধ্যে দিযে মানুষকে নতুন ক'রে চিনতে শেখে পাঠক। 'ধূপ-ছায়া' লেখাটির দু'পাতা জুড়ে জাহাজী ফ্যান্সিবলের বর্ণনা। কিন্তু শেষ পাতায় পৌঁছে বোঝা যায নিছক ঐ উদ্দাম-আনন্দ-পাগলামি আর মাতলামির কেচ্ছা লেখার জন্যই প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হয় নি।

মুজতবা আলো আঁধারকে আলাদা আলাদা করে, আলোর মধ্যে আঁধার অথবা আঁধারের মধ্যে আলোকে আবার একই মানুষের জীবনে আলো ও আঁধারের সন্নিধি এঁকেছেন। যেমন কায়বোর প্রবাসী ভারতীয় মুখহানার প্রসঙ্গ

। জাহাজের ডেকে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ডাবল ব্রেস্ট কলার, টাই, টুপির টাস্‌ল দুলিয়ে। তিনি সদালাপী, সুরসিক, সেকুলার, রাজনীতি সচেতন এবং সবচে' বড় কথা পরোপকারী মানুষ। এক বছব পরে তাঁকে দেখি চীরবাসী, শীর্ণ, সর্বস্বান্ত যক্ষ্মারোগী হিসেবে। অথচ তখনো দুঃস্থ মানুষদের পরোপকার করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুখহানা। ফলশ্রুতিতে কার্পেট ভিজে যাচ্ছে রক্তবমিতে।

মুখহানার জীবনের শেষভাগ সম্পূর্ণ ছেয়ে আছে মায়ের কাছে পৌঁছনোর স্বপ্নে। ভারতের কোন দূর কুর্গে বসে, তেঁতুলের ছায়ার নীচে প্রবাসী ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন বুড়িমা। মুখহানা যেন কাফকার নায়কের মত দুর্গ বন্দী। রুক্ষ প্রবাস জীবনেব গোলকধাঁধা থেকে শেষমেষ মুক্তি পান নি তিনি। তাঁর সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য অনেক খুঁজেও আলী পাননি মা-কে। এই মা যেন এক প্রত্ন প্রতিমা। আমাদের সকলের ঘবে ঘরে তিনি আমাদের জন্য নিবাময়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষা কবছেন। মুখহানা চেয়েছিলেন আঁধাব কুটীবগুলোয় দীপ জ্বালাতে, অমলেব মত। অমল তো পেয়েছিল 'বাজার চিঠি'। মুখহানার চিঠি কি মা পাবেন না? কোনোদিনও না?

মা'র কথা প্রায় প্যাশানের মত ফিরে এসেছে 'পঞ্চতন্ত্রে'। কোন্‌ভিনাবেব মা এক ইহুদী বৃদ্ধা। নাজি-বার্লিনে আটকে প'ড়ে, প্রবাসী পুত্র আর পুত্রবধূর জন্য তিনি আলীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিয়েতে পাওযা হার, আংটিটা। তখন তাঁব কোলকুঁজো বলিরেখাময মুখটিতে যে নস্টালজিক মধুব হাসিটি ফুটে উঠেছিল, আমরা সেই হাসি কতবাব দেখেছি বেহালা-বিরাটি-বহবমপুবে— আমাদের প্রত্যেকের মা'ব দুঃখী মুখখানিতে।

গোয়ালন্দী জাহাজে এক কুমারী মা-কে প্রসবেব সময ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছিল কোন নরাধম। তাই নিয়ে গোটা জাহাজে ছিছিক্কার। মেরীও তো কুমারী ছিলেন, তবু তাঁর পুত্রকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিন জ্ঞানীবৃদ্ধ। জাহাজেব মা'কে সাহায্যের জন্য শত কটুক্তির মধ্যেও উচ্চশিরে এগিয়ে গিয়েছিল এক 'আধুনিকা,' আলীর ভাষায় 'পরমহংসী', যে হয়ত একদিন আমাদের ভবিষ্যৎকে ধারণ করবে আপন গর্ভে।

কোন মুসাফিরের পক্ষেই শুধু গোলাপবাগানে বসে গান গাইলে চলে না, বিস্তর কাঁটার ঝকমারিও পোহাতে হয়। আলী সাহেব অনেক দেবোপম মানুষ

দেখেছেন, গণ্ডাগণ্ডা অমানুষও দেখেছেন। তাঁর সমগ্ররচনাবলীতে অমানুষদের তালিকায় পয়লানম্বরে অবশ্যই আছেন হের্ ফুয়েরাব এবং তাঁর দানব সঙ্গীরা। পঞ্চতন্ত্রেও তাঁদের ইতস্তত উল্লেখ পাই। ইতিহাসকারেব নির্লিপ্তি নিয়ে আলী সাজিয়ে দিয়েছেন নাজি-উত্থানের তথ্য, তত্ত্বের খুঁটিনাটি। পড়তে বসে মনে হয়, যে বিশিষ্ট মগজের দৌলতে মানুষ হন্তারক হয়ে ওঠে, সেই মনোবিশ্লেষণেই তাঁব আগ্রহ বেশী। যে প্রতিবেশ ঐ অমানবিকতাকে সম্ভব করেছিল, তার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। খুন জানতে ইচ্ছে হয়, আজ, বিধ্বস্ত বার্লিন প্রাচীরেব উপর মাথা তোলা নব্যনাজিদের আস্ফালন দেখলে, কী বলতেন আলী! ফুয়েরারেব দেহ জ্বালিয়ে দিলেও, তিনি তো মরেন না। বাববার তার পুনর্জন্ম হয়, স্বদেশে, বিদেশে, এই ভারতবর্ষেও।

।। সাত ।।

মুজতবা আলী জানতেন, 'শুধু সাহিত্যিকই না, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে কোন বিস্ময়-বিযয নিয়ে চিন্তা কবেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু না কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়'। স্বভাবতই, দুনিযাব তাবৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা ফাঁদার সুবাদে, শুধু দেশী-বিদেশী শব্দভাণ্ডাবই নয়, শব্দের মিলন, অর্থের তুলনামূলক বিচার, উচ্চারণ, ব্যাকরণও নিয়েও প্রচুব ভাবতে হয় তাঁকে। বহুভাষাজ্ঞান, দেশভ্রমণ আর অনুবাদ কর্মে অবাধ্য উৎসাহ এ কাজে সাহায্য কবেছে পদে পদে। তিনি জানেন, বিভাষী সংস্কৃতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে, আবহ তৈবীর জন্য বিভাষী শব্দেব ব্যবহাব অনস্বীকার্য, অথচ এ বাবদে পাঠক বিলকুল অজ্ঞ। তাই অসম্ভব ধৈর্য ও বিনয় সহকারে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কখনো ফুটনোটে আমাদেব বুঝিয়ে চলেন—

আরবী মোকদ্দমা ∠প্রথম কদম বা পদক্ষেপ = মামলার অবতরনিকা =লাতিন প্রিমা ফাসি কেস = বাংলা সম্পূর্ণ মামলাটি।

ফারসী পঞ্চশীব = বাংলা পঞ্চক্ষীর > পঞ্চনদ।

ফারসী আজ =ইংরেজী Fonn = বাংলা হতে এবং ফারসী গায়েবী =বাংলা অজানা, দুয়ে মিলে আজগুবি =অজানা থেকে উদ্ভূত বা অদ্ভুত ইত্যাদি।

শুধু শব্দের জন্যেই শব্দ নয়, তার ডানায় ভর দিয়ে উড়ে আসে ইতিহাস থেকে ধর্মতত্ত্ব। বুদ্ধ ভগবান যে খ্রীষ্টীয় সেন্ট এ পরিণত হতে পাবেন, 'য়ুআদফ'

ও 'বার্লাম' শব্দদুটির সঙ্গে 'বোধিসত্ত্ব' ও 'ভগবান' শব্দদুটির বুৎপত্তিগত সাদৃশ্য খুঁজে না পেলে, তা ভাবা কঠিন ছিল। আলী সাহেব মদার =বিম=পাল্লা =হিল্‌সা =ইলিশ, এই শব্দ-সমীকবণ না শেখালে, মহম্মদ বিনতুঘলক কি খেয়ে পেটের অসুখে দেহ্ রাখলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাত কোন মুর্খ?

বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে ইংরেজ অতি বেহায়া। তাই তাদের কখনো পরিভাষার সমস্যায় পড়তে হয়নি। অবশ্য বিদেশী শব্দ প্রায় না থাকলেও, ফবাসী ভাষাও কখনো পরিভাষা নিয়ে বিচলিত হয়নি, আমরা চলেছি মধ্যপথে। শব্দঋণের দ্বারা পরিভাষা নির্মাণ বাংলায় হয়েছে। মুসলমান শাসকদেব কাছে পাওয়া সমন, জেরা থেকে শুরু ক'রে ওস্তাদদের কাছ থেকে পাওয়া বন্দিশ, মেজরাব অবধি হজম করেছি আমরা। আলোকচিত্রর বদলে ফটোগ্রাফ, হাওযাগাড়ির বদলে মোটরকারকেই আপন করেছি সহজে। কিন্তু সমস্যাটা হল, পৃথিবী যত গড়াচ্ছে তত ছোট্ট হচ্ছে। সর্বাধুনিক বিদেশী নো-হাউ নাহলে এক কদমও এগোন দায। তাই পবিভাষা সমস্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। 'এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট' রচনায আলী সাহেব দুঃখ করেছেন, 'বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত. পরিভাষার জন্য তারা চেয়ে আছেন কোষকারের দিকে কারণ ভাষাতত্ত্বে তারা এমেচার'। আবার কোযকার তাঁদের মুখাপেক্ষী, কারণ ঐ সব বিদ্যায় তিনি স্পেশালিস্ট নন। এই পবিস্থিতিতে পরিভাষা নির্মাণের নামে যা চলেছে কহতব্য নন।

নতুন শব্দ সৃষ্টির জন্য দুটি চেনাশব্দের সমাস বানানোর চেষ্টা করেছিলেন আলী সাহেব। হুতোমের লেখায় 'খ্যাংড়া গুঁফো' আর 'গামছা-কাঁধে'র ছড়াছড়ি। অথচ আজ 'দমকলে'র মত চমৎকার সমাসবদ্ধ পরিভাষা ছেড়ে আমাদের ছুটতে হয়, 'অগ্নিনির্বাপকশকট'-এর দিকে। পরিভাষা ছাড়াও, স্পেশালিস্টরা বিদেশী স্থান বা ব্যক্তিনামের প্রতিবর্ণীকরণ নিয়ে প্রায়ই ধন্দে ফেলেন আমাদের।

আরবী ও ফরাসী শব্দের এক বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে কলেকটিভ নাউন তৈরী, দেশী ও বিদেশী শব্দের জোড়কলম সমাস নিয়ে চমৎকার আলোচনা রয়েছে 'পঞ্চতন্ত্রে'। অ্যাকালচারেশান-এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে বিভাষীকে বোঝানোর জন্য প্রথমে আপন শব্দ ব'লে, তার সাথে বিভাষী শব্দ যোগ ক'রে দিই, তাই নিযে লিখেছেন 'ভাষা'। এই দুপৃষ্ঠার ছোট্ট লেখায়, উদাহরণ হিসেবে

অসংখ্য পরিবেশানুগ সরস সংলাপ লিখে গেছেন আলী। তাতে বর্ষার মত অবলীলায় ঝরেছে পঞ্চাশটিরও বেশী জুতসই দ্বিভাষিক জোড়কলম শব্দ। এখানেই ভাষাতাত্ত্বিক মিলে গেছেন সাহিত্যিকের সাথে।

এই মিলনের শ্রেষ্ঠক্ষেত্র অনুবাদ। ছাত্রবেলায় আলী ওমর খৈয়ামের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ তখন হৈ চৈ ফেলেছে। আলীর কিন্তু তাতে মন ওঠেনি। তিনি ফিটজেরাল্ড উইণ্ডফিল্ড থেকে সত্যেন দত্ত অবধি রুবাইতের প্রতিটি বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদকের খ্যাতি না পেলেও, জীবনোপান্ত অবধি এই আগ্রহ বজায় ছিল তাঁর। 'পঞ্চতন্ত্রে' নানা প্রসঙ্গে বিদেশী কবিতা, গান, গদ্যের বেশ ক'টি টুকরো অনুবাদ, অনুবাদের প্রকৃতি পদ্ধতি ও ইতিহাস নিয়ে নানা মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রয়েছে দুই খণ্ডেই 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে দুই পৃথক রচনা। প্রথমটিতে পিয়ের লোতির 'ল্যাঁদ সাঁজাংলে'র অনুবাদক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, শুধু ভাব নয়, মূলের ধ্বনি ঝংকারটি পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলা যায় অনুবাদে। দ্বিতীয় লেখাটিতে আলাওল, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কালীপ্রসন্ন, ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশান ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ, রাজশেখর, দীনেন্দ্র কুমার প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গানুবাদকদের স্মরণ করেছেন তিনি।

পঞ্চতন্ত্রের পাতায়, একদিকে তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হওয়া মাত্র সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, অন্যদিকে অনুবাদ হওয়া দরকার এমন অনেক বিভাষী গ্রন্থ বিষয়ে আমাদের ওয়াকিব করেছেন। ভারতীয় গ্রন্থের ইংরেজী বা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের হালহকিকৎ নিয়েও ভেবেছেন তিনি। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জড়বাদী ইউরোপ হঠাৎ ঝুঁকেছিল প্রাচ্যের দিকে, কারণ এখানে ভাগবৎ সংস্কার অগ্রাহ্য করেও, চরম তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বাতাসে ত্রিপিটক, কুরাণ, উপনিষদ, মায় ছোটদের জাতককাহিনীর চমৎকার অনুবাদ ভেসে ওঠে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায়, ওরিয়েন্টালিজম ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়। সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা ক'রে পাণ্ডিত্যের আস্ফালন দেখালে, কোন সাহিত্যই হালে পানি পায়না। অনূদিত ভারতীয় সাহিত্যও পায়নি। আলী জানতেন, একটি কেতাবের অনুবাদ কোন দেশে গৃহীত

বা বর্জিত হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। বিষ্ণুশর্মার বই রচনা থেকে আরম্ভ ক'রে পহ্‌লভী, সিরিয়াক, আরবী, হিব্রু, লাতিন ইত্যাদি নানা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিশ্বজয় করল— এ নিয়ে তাঁর প্রায় গোয়েন্দাসুলভ আলোচনাটি ঐ সচেতনতার পরিচায়ক। এই ছোট্ট লেখাটির সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে ভাষাতত্ত্ব থেকে ইতিহাস নানা বিষয়ে আলীর জাগ্রত কৌতূহল।

আলী ঐতিহাসিক নন। কিন্তু 'পঞ্চতন্ত্রে'র দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি লেখায় ইতিহাস বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা পাওযা যায়। অধ্যাপক বগ্‌দানফ তাঁকে টেক্সট্ ক্রিটিসিজমেব গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন ছাত্রবেলায়। তারপব থেকে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসগ্রন্থ ঘেঁটে, তুলনামূলক বিচার দ্বারা প্রামাণ্য তথ্যটির আবিষ্কার হযে উঠেছিল আলীর প্রিয় অভ্যাস। 'পঞ্চতন্ত্রে' 'মিরয়ৎ-ই আহ্‌মদী' ও 'বাবুব নামা' কেতাব দুটির পর্যালোচনা করেছেন তিনি। প্রথম বইটি আহমেদাবাদের দেওয়ানের লেখা গুজবাত কাঠিয়াওযাড়ের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয়টি বাববেব আত্মজীবনী। বচনা তিনটির মধ্যে দিয়ে বাবর ও মহম্মদ বিনতুঘলকের চরিত্রের নানা ভাঁজ ফুটে উঠেছে ঔপন্যাসিকের দক্ষতায। আলী জানতেন, ইংবেজ শাসকদের মধ্যে একদল যেমন আকাটমুর্খ ছিলেন, প্রকৃত পণ্ডিতও ছিলেন, তৃতীয দলটিতে ছিলেন অল্পবিদ্যাবিশাবদরা। তাঁদের মুখে ঝাল খেযে আমরাও ভাবতে শুরু করেছিলাম, 'পাঠান মোঘল ইতিহাস লিখতে জানত না'। এই অপপ্রচাবের জবাব দিতেই আলীর কলমবাজী। এজাতীয় স্বাজাত্যভিমান বঙ্কিমের ইতিহাসচর্চার পেছনেও ক্রিযাশীল ছিল। কিন্তু মজুতবার কৃতিত্ব অন্য জায়গায়। ইতিহাসের সঙ্গে তিনি অনায়াসে জুড়ে দেন সাম্প্রতিক সামাজিক, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং বিযুক্ত বাখেন সাম্প্রদায়িকতাকে।

।। আট ।।

ফুলার, বার্গ সঁ থেকে আমাদের পাঞ্চভৌতিক আড্ডার সদস্যেরা সকলেই ধরতে পেবেছিলেন হাসি আর কান্না আসলে একই মুদ্রার দুটি পিঠ। অল্প অসঙ্গতিতে আমরা হাসি, অসঙ্গগতির তার চড়লে দুঃখিত হই। আলীও এ তত্ত্ব বিলক্ষণ জানতেন। তাই তাঁর রসিকতা কখনই ভাঁড়ামো হয়ে ওঠেনি। ইতিপূর্বেই আমবা দেখেছি আলোকিত মানুষের সরস বর্ণনা দিতে দিতে তিনি হঠাৎ ডুব মারেন

গভীরে, ভিজিয়ে দেন আমাদের চোখের পাতা। 'চোখের জলের লেখক' রচনায় নিজেই জানিয়েছেন শুধু হাসির বা কান্নার লেখক ব'লে কোন প্রকৃত স্রষ্টার গায়েই লেবেল মারা যায় না। তবে দুঃখ সর্বজনীন হলেও, হাসি তা নয়। হাসির ফুলে প্রায়ই লুকিয়ে থাকে ব্যঙ্গের হুল। তা পড়ে আমরা আমোদ পেলেও, ব্যঙ্গের উপলক্ষটি রাগে বেগুনী হয়ে-যান। অর্থাৎ 'হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে'। তাছাড়া এই সজল বাংলার মানুষকে কাঁদানো অপেক্ষাকৃত সহজ। হাসানো কঠিন। আলী সেই কঠিন কাজে হাত দিয়ে, হাসানোর শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ ক'রে তুলেছিলেন নিজেকেই—'আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশ্যে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস্ অ্যাট হিজ ওন কস্ট'। হিউমার সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম হাতিয়ার ছোট্ট ছোট্ট গল্পিকাগুলি। ফরাসী চণ্ডুখোর থেকে ঢাকার কুট্টি অবধি হাজার মানুষকে নিয়ে লক্ষ গল্পের ভাঁড়ার তিনি উজাড় করে দিয়েছেন 'পঞ্চতন্ত্রে'। এই গল্পগুলির প্রত্যেকটিই ক্যারেক্টারিস্টিক্। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, কলমের কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে, পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও লেখকের উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। এ জাতীয় গল্পবলার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাপক লেভির কাছে। 'খেলেন দই রমাকান্ত' রচনায় তার বিবরণ আছে।

'পঞ্চতন্ত্রে'র তিনটি লেখায় সাহিত্য সমালোচক মুজতবা আলীকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমটি পূর্ববর্ণিত ইস্কিলাস-শেলি-স্পিটলার। এখানে ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতির হাত ধরে, রেস, মিলিউ ও মোমেন্টের মীথস্ক্রিয়ার কাব্যজন্মের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন তিনি। 'পঁচিশে বৈশাখ' রচনায়, রবীন্দ্রগানের লিরিক গুণ অন্বেষণ করতে গিয়ে কিন্তু বিশিষ্টভাবে রাবীন্দ্রিক রসতত্ত্বেরই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন সুন্দরের গতি কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ, সে যেমন আপনার মধ্যে সমাহিত তেমনি আপনাকে বিচ্ছুরিত করতে চায়। দুইয়ের সামঞ্জস্যেই আসে সুষমা। আলী রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দসজ্জার চমৎকারিত্ব নিয়ে ভাবতে বসে সেই সম্পূর্ণতা ও সুষমারই সন্ধান পেয়েছিলেন।

আবিশ্বের কাব্যসাহিত্যের তুমুলপাঠক মুজতবা আলীর আপন রচনাতেও যে ভাষা সৌকর্যের পরাকাষ্ঠা দেখা দেবে তা খুবই স্বাভাবিক। ধরা যাক, তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা। সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী সূর্যাস্ত আঁকতে গিয়ে তিনি আগুনের

বহুশ্রুত উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা রসোত্তরণ ঘটায় ডিটেলের অনুপম ব্যবহারে। সূর্যেব আগুন নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে কাঁচের শার্সি, পাহাড়ের বরফ, টুরিস্টদের সাদা ফ্রক, সোনালী চুল, দেহত্বক, ভেড়ার মত মন্থর মেঘ, হ্রদের জলে। প্রত্যেকের নিজস্ব রং রোদের সাথে মিশে তৈরী করছে লালের ভিন্ন ভিন্ন শোভা। তারপর এলেন সন্ধ্যাবানী। আবির মুছে নিয়ে যেন কাজল পরিয়ে দিলেন চরাচরের ডাগর চক্ষুতে। দেবতা আর মানুযেরা পাহাড়ের এপাব থেকে সন্ধ্যের চিরাগ দেখাল পরস্পরকে। 'পুলিন বিহারী' রচনায় সাগরেব ঢেউ উপমিত হয় পালোয়ানেব দলের সাথে, সাগর আর আকাশের রংদাবী হয়ে ওঠে তবলা, তানপুরাব যুগলবন্দী। সন্ধ্যাব সমে এসে বাজনা থামে। তখন লাল মদের ভাঁড় নিয়ে ওঠে মাতাল চাঁদ। পূবের বাতাস গোলাপ জল ছিটিযে দেয আসরে। আসমানের মশালচি জ্বালিযে দিযে যায় তারাগুলি। শুরু হয রাত্রির মুশাযেরা।

অভাবিত উপমা সন্নিবেশনে আলীব জুড়ি নেই। যথা, ইলিশ মাছ যেমন বহুদেশে বহুনামে চিহ্নিত ও বহু পদ্ধতিতে রন্ধিত হলেও, সমাজ উপাদেয় থাকে। যেমনি আড্ডা, স্থান-কাল-পাত্র সীমা সরহদ্দ যতই বদলাক, স্বাদ যায় না। পান তৈরীর ক্ষেত্রে শিব্রামের সমকক্ষ না হলেও তিনি বিদ্যাসাগবকে ছাড়িয়ে গেছেন, কাবণ 'তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান কবতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যাসাগাব পান্ কবতেন অত্যল্পই'। তাঁব কলম কথার টানে টেনে এনেছে বহুকাব্যময় বিশেষণ। যেমন 'কবিবরি'ব ভাইপো হলেন 'ছবি-রবি'। বিশেষণগুলির প্রত্যেকটিও ক্যারেকটারিস্টিক।

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম পাতাতেই আলী লিখেছিলেন, একটা বই পড়া মানে একটা চোখ খুলে যাওয়া। 'পঞ্চতন্ত্র' শেষ ক'রে মনে হয এতো একটামাত্র নয়, অনেকগুলি বই-এব মহাসঙ্গম। পঞ্চতন্ত্রের রসিক পাঠক পুঞ্জাক্ষির অধিকারী। তিনি হয়ত মহাপণ্ডিত, শামস-উল-উলিমা হয়ে ওঠেন নি। কিন্তু মনের অনেকগুলি বাতায়ন খুলে দিয়ে বসে আছেন। উন্নততর, বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চায় আমাদের আগ্রহী করে তোলার প্রথম ধাপ পঞ্চতন্ত্র। সেখানেই তার সার্থকতা।

চাচা কাহিনীর চৌহদ্দিতে

সুনীল দাশ

অক্টোবর পাতা ঝরার ঋতু Herbst বা শরতের হ'লেও, বার্লিনের এই ঝরা পাতার রূপটা তার ভেতরের উৎসবের আবহে অন্যরকম আলো পেয়ে যায়। ষাট বছর আগেও এই বার্লিনের ছবি, বিশেষ ক'রে যে এলাকাগুলোতে ঘোরাফেরা করছে সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা, গল্প করতে করতে আমরা হাঁটতে থাকি সেইসব পথ ধরে।

আমরা বলতে, আমি আর দাউদ হায়দার। আমাদের এই কবি বন্ধু এখন বার্লিনের স্থায়ী বাসিন্দা। বার্লিনে দাউদের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিনেই ঠিক করেছিলাম 'চাচা কাহিনী'র চত্বরটা ওর সঙ্গে ভালোরকম ঘুরে দেখে নেবো।

ফুল, শুধু হরেকরকম ফুলের হাসিই যে একটা শহরকে কত রঙের খুশিতে মাতিয়ে রাখতে পারে, বার্লিনে প্রথমদিন পা রাখার থেকেই তা টের পাচ্ছিলাম। এর সঙ্গে রাতের আলোর অনুরাগ থেকে উচ্ছ্বাসের ছটা। শহরের সবচেয়ে প্রাণবন্ত পথ কুরফুর্স্টেনডামের সেই উচ্ছ্বসিত আলোর উদ্দীপন পেরিয়ে—এই প্রাণপথের সঙ্গে উলাণ্ড স্ট্রাসে মিলেছে যেখানটায়—সেখান থেকে উলাণ্ড স্ট্রাসে উজিয়ে দু'তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই—Hindusthan Haus-এর অবস্থানের বর্ণনা পড়েছি—চাচা কাহিনীর শুরুতেই। সাহিত্যে আমার বার্লিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় চাচা কাহিনীর হাত ধরেই।

আমাদের ছেলেবেলায়, বিশ্বপরিচয়ের শুরুতে, জার্মানিকে কেবলই দেখেছি মহাযুদ্ধের পটভূমিতে নাৎসি দাপটের নির্দয় দৃশ্যাবলীতে, বিশেষ করে তখনকার দেখা ফিল্মগুলোর সিংহভাগ জুড়ে ছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নিগ্রহের নিরন্তর ছবি। মুজতবা আলীর লেখাই যেন গান দিয়ে দ্বার খুলে দিল,—জর্মন সাধারণের প্রাণের ভুবনে সেই প্রথম পৌছানো। আর সব কিছু বাদ দিলেও, শুধু এই একটি কারণেই আমাদের প্রজন্ম আলী

সাহেবের লেখার কাছে ঋণী থাকবে।

এক দুপুরে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ তোরণের মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। মুজতবা আলীর জার্মানিতে ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৯ নাগাদ বিশ্বভারতীর ডিগ্রি তখনো বিদেশী স্বীকৃতি লাভ করেনি। শুধু ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতীর ডিগ্রিকে মর্যাদা দিচ্ছে। Wilhelm Humboldt প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়ে মুজতবা আলী এখানে পড়তে এসেছিলেন। সেদিনের দেখা বার্লিনেব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আর তার বাইরে বাঙালি আড্ডার আবহ আমাদের সাহিত্যে চিরকালেব ছবি হয়ে আছে। 'ধূপছায়া'য় 'বাংলার গুণ না জার্মানগুণী' লেখাটিতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল করিডোর কয়েক আঁচড়েই জীবন্ত। দু পিবিয়ডের মাঝখানে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় যেন গুরু হাটার গাদাগাদি কিংবা সিনেমা হলেব সামনে হুড়োহুড়ি। আইনস্টাইনকে দেখা এইখানেই। বৃদ্ধ অধ্যাপক আইনস্টাইন ক্লাস নিতে ছুটে যাচ্ছেন। আলুথালু কেশ, লজঝড় বেশ। তামাম ইউনির্ভার্সিটি বিল্ডিং চযে বেড়াচ্ছেন আইনস্টাইন তাঁব নিজেব ক্লাসঘবটি খুঁজতে।

রবীন্দ্রনাথেব শান্তিনিকেতনেব আবহ থেকে একেবারে মেরু দূরত্বে। বিশ্বভাবতীর ছাত্র মুজতবা আলী উত্তর জীবনে আড্ডাব অনুষঙ্গে যতই শাণিত সপ্রতিভতায় চিহ্নিত হোন না কেন, তাঁব ছাত্রজীবনের শান্তিনিকেতনেব মগ্ন নির্জনতাকে একান্তভাবে চেয়েছিলেন। তাই কযেক মাস পবেই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালযে একটা টার্ম (১৯২৯—১৯৩০) শেষ করার পর তাঁব জ্ঞানযোগের জায়গাটি বদল হ'ল। বার্লিনেব বদলে বন। বন বিশ্ববিদ্যালযে দুবছবের পড়াশোনা করে পি. এইচ. ডি.। তবু স্বভাবতই তাঁব লেখায় বনের তুলনায বার্লিন মুখ্য ও মুখর। বার্লিনে বাংলা বিভাগ খোলায় কী অপার আনন্দ তাঁর! ওই বিভাগেরই প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতি বারবাবা দাশগুপ্তকে আর একদিন মুজতবা আলী প্রসঙ্গেই বলেছিলাম, বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী কেউ যদি এখানকার পঠনপাঠন আব কাজের খোঁজখবর নিয়ে কিছু লিখে রাখেন তাহ'লে বাংলা সাহিত্যের সত্যি একটা ভালো কাজ হয়ে থাকে।

দাউদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মুজতবা আলীর বাসস্থানের এলাকায় পৌঁছে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ষাট বছর আগে বার্লিনের এই

চত্বরটা কেমন ছিল জানা নেই। কিন্তু এখন এই অক্টোবরের সন্ধ্যায় কুরফুরস্টেনড্রামস্ট্রাসের কয়েক মিটারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্ত রাস্তাটির এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখি জায়গায় জায়গায় চড়া সাজের রমণীরা অপেক্ষামানা। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর বার্লিনের নানা এলাকার চেহারা যেমন বদলেছে, চরিত্রও তেমন বদলেছে নিশ্চয়। বেশিক্ষণ আর আমাদের ঘোরা হ'ল না। দুজনে আবার হাঁটতে হাঁটতে চললাম অডেনওয়ার প্লাৎসের 'ভারত মজলিসে'র আড্ডায়। সেখানে আমাদের ইলিশ মাছ আর ভাতের বরাদ্দ আছে। সেই ইলিশ,—যার প্রেমে মুজতবা আলী পঞ্চতন্ত্রে লেখেন, 'বেহশতের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ বখৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার বাসনা আমার নেই'। হাসেন হাইডেস্ট্রাসের বিমল মজুমদারের বাড়িতে এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের সাহিত্যের ঘরোয়া আসরে আমি খানিকটা পড়লাম---'চাচাকাহিনী' থেকে। আসরের বন্ধুদের মধ্যে বাঙালি ছাড়া জার্মান, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক আর হল্যান্ডের মানুষজন ছিলেন। তাঁদের জন্যে আমার পাঠের সমান্তরাল জার্মান অনুবাদ শুনিয়ে গেলেন বিমল মজুমদার। অবশ্যি গোড়াতেই তিনি ভিন্নভাষীদের ভালো রকমের বুঝিয়ে নিয়েছেন, তাঁর জার্মান অনুবাদে মূল লেখার গদ্যগৌরব প্রায় কিছুই বাজবে না। যদিও, প্রসঙ্গত বলে নেওয়া উচিত, বার্লিনের গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউটের আমাদের শিক্ষক বন্ধু ফ্রাঙ্ক ওয়ারনার বিমল মজুমদারের জার্মান সংলাপের রীতিমত প্রশংসা করেছেন।

'কুরফুর্স্টেনডাম বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইউরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবাণীতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা, ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল, কুরফুর্স্টেনডামের গা ঘেঁষে উলাণ্ডস্ট্রাসের উপর আপর রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার'। —চাচা কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইভাবে শুরু হয়ে একটু এগিয়েই মন্তব্য, 'ভারতীয়রা নিয়ে আসত জার্মান, অ-জার্মান বান্ধবীদের—মাছভাত বা ডালরুটির স্বাদ বাতলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জার্মানদের সঙ্গে

নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ কবার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না, ভাবতীয় রান্নাব চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তাব সঙ্গে ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যেরকম প্রমাণ কবা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জার্মানদেব কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই কবা যায় না'। আমার নব্বইয়ের দশকেব জার্মান বন্ধুরা মজুতবার তিরিশেব দশকের এ উপলব্ধি পুবোপুবি না মানলেও আলী সাহেবের বলাব ভঙ্গিমার তারিফ করেছিল খুব। কিন্তু আমাব মিউনিখবাসিনী জার্মান বান্ধবী মার্গিট ক্লাবকে যখন 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে শুনিয়েছিলুম, 'জার্মান মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির যত্ন কবে, প্রেমে পড়ে ফবাসিনীদের চেযেও বেশি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিবদিনই তার কাছে 'আউসল্যাণ্ডার' বা বিদেশীই থেকে যাবেন—কিন্তু ফবাসিনীদের মনে অন্য ভাগাভাগী'। শুনে সঙ্গে সঙ্গে মার্গিট বলে উঠেছিল, 'নাইন, নাইন'। উপায় না দেখে তখন আমি আলী সাহেব কথিত সেই জার্মান ভাষাব প্রেমেব গানটাব কথাগুলোই আউড়েছিলুম, 'Dein Mund Sagt 'Nein' Aber Dein Augen Sagen 'Ja' অর্থাৎ 'তোমার মুখ বলছে না, না, কিন্তু তোমার চোখ দুটি বলছে হাঁ হাঁ'।

জার্মান ভাষাটাকে যত ভালো করে শিখতে চাই, ততই কেমন যেন পিছলে পিছলে সবে যেতে চায। যথার্থই জার্মান ভাষা হ'ল সেই অরণ্য যার যত ভেতব দিকে ঢোকা যায় ততই সে গহন, জটিল আর দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। আবার এই ভাষাবই আবেক ভারি উদাব ঐশ্বর্য। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভবে' লেখাটায় ডক্টর আলী সেই ব্যাকবণের বিভা দেখিয়েছেন খুব সহজ কথায়--

'Gepaeckaufbewahrungstelle জার্মান ভাষায় এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। জার্মান ইংরেজিব মত দিল দরিয়া হাতে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক বাত ব্যামোও তার এমন ভয়ঙ্কর মাবাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু একটা নিত্য প্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জার্মান, ইংরেজি ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণ ক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে, কিন্তু ইংরেজি রবারেব মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না। জার্মান ভাষাব আসল জোর তার সমাস বানানোব কৌশলে আব সেখানে

জার্মানের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে'।

ডঃ আলীর দখলের ভাষাভাণ্ডারে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়ান ইত্যাদি য়ুরোপীয় ভাষা সমেত মোট পনেরোটি ভাষা ছিল।

১৯২৯ থেকে ১৯৭১ এই তেতাল্লিশ বছরের পরিসরে জার্মানির মাটি ফিরে ফিরে টেনেছে সৈয়দ মুজতবা আলীকে। বার্লিন, বন কিংবা হামবুর্গ জার্মানির নানা চরিত্রের শহর শুধু তার যৌবনের উপবন নয়, বার্ধক্যের বারাণসীও। জার্মান সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিল। প্রান্তজীবনে জার্মানিতে দুবার গেছেন তাঁর আযৌবন প্রিয় বান্ধবীর আত্মিক সান্নিধ্যে। জার্মানিকে তাই তিনি কখনোই টুরিস্টের চোখে বাইরের থেকে দেখেননি; দেখেছেন খুব ভেতর থেকে। সে দেখায় একটু একটু করে ভারি নিবিড় ভাবে মিশে হয়েছে ডয়েচ্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর চিন্তার চার দশকের ওপর চর্যাচরিত।

'কোলন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়। এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে যৌবনে পড়াশোনা করেছিলুম। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। . খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি'।

তাঁর যৌবনের উপবন 'বন' শহরের ছবিও এঁকেছেন সহজ, নিরুচ্ছ্বাস অনুরাগে—'এপারে বন, ওপারে সিবেন গেবির্গে, মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ, আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির ওপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত, ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ঘর-বাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিমসানুং'।

'ময়ূরকণ্ঠী'তে এই বর্ণনা যেদিন পড়েছিলুম, তারপর তো একটা দুটো নয়, অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল, অনেক জল বয়ে গেল রাইনের অববাহিকায়। কিন্তু বাহান্ন দিন বার্লিনে কাটিয়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে, বার্লিন থেকে ফ্রাইবুর্গ—জার্মানির উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছি যখন—কোলন আর বন শহর ছুঁয়ে বহতা রাইনের পাশাপাশি, কখনো খুব কাছাকাছি, ট্রেনের থেকে কেবলই দেখেছি আর দেখেছি, তখন—ফিরে ফিরে ওই

বর্ণনা—আমার তারুণ্যের সেই পাঠ সঞ্চয় থেকে উঠে এসে মিশে যাচ্ছে সেই দেখায়। তবে শব্দ দিয়ে ডক্টর আলী বন শহরের ভেতরকার যে ছবি এঁকেছেন—সে ছবি তো খুঁজে পাওয়া যাবে না—আজকের বনের হাইরাইজ সৌধরাজির সমাবেশে। মুজতবা আলীর সেই ছাত্রদিনে সংগীতাচার্য বেটোফেনের এই জন্মশহরে—সুরেব গুরুব ব্রোঞ্জের আবক্ষমূর্তিও গড়া হয়নি। উনপঞ্চাশ থেকে একানব্বই—বিয়াল্লিশ বছব বন যে ছিল ফেডারেল বিপাবলিক অফ জার্মানির রাজধানী। বিশ্বভাবতীব যে ছাত্রটি এই শহরে তাঁর আর এক শান্তিনিকেতনকে খুঁজে পেয়েছিলেন আজকের বন-এ তা হাবিয়ে গেছে পুরোপুরি।

'. আর বন শহরেব ভিতরটাও বড় মনোবম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটবের গাঁক গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট গলিঘুঁজি, ছোট ছোট বাড়ি ঘরদোব, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধজাগ্রত রেস্তোরাঁ। আব বিশাল বিপুল কলেবর আধাশহব জুড়ে ভুবন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।'

প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছব পব সেই একই শহবে এসে 'শাঁসালো জার্মানি'কে দেখেছেন মুজতবা আলী। দেখেছেন, 'ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে বন বিশ্ববিদ্যালয়েব শ'তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনাব মোটব গাড়ি আছে আঙুল গুণে বলতে পারতুম। আর আজ?' (টুনি মেম)। বন বিশ্ববিদ্যালয়েব চত্বর ছেয়ে আছে দামী মোটর গাড়িতে। অধ্যাপকরা তো আসেনই, বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রী আসে গাড়ি চালিয়ে। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বব ঘুরতে ঘুরতেও মুজতবা আলীব দেখা বিদ্যাব প্রাঙ্গণে এই বৈভবেব বিবর্তনের দিকটি আরো একবাব মনে পড়েছিল আমাব। ১৯৭০-এব ডিসেম্বরের বনকেও দেখেছেন আলী সাহেব। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বৈভব বিশ্লেষণে জার্মান ও ভারতীয় সাহিত্যের দুই কবিগুরু—গ্যোয়টে ও রবীন্দ্রনাথ—হিমালয়প্রতিম শীর্ষচূড় প্রতিভার কথায় সৈয়দ মুজতবা আলী ফিরেছেন বার বার কিন্তু তাঁর একান্ত ভালবাসার নিভৃত মনের সুরটি যাঁদেব একতারায় বড় আপন হয়ে বাজতে চেয়েছে—তাঁরা হলেন বাঙালি চণ্ডীদাস আর জার্মান হাইনে। লিখেছেন, 'আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ...চণ্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষাতে হৃদয়ের গভীরতর বেদনা কেউ বলতে পারে নি'।

তাঁর 'ভবঘুরে ও অন্যান্য'র 'কই সে' লেখাটিতে সৈয়দ মুজতবা আলী হাইনরিষ হাইনের একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন নিজের অনুবাদে—

'গঙ্গার পার--মধুর গন্ধ ত্রিভুবন
আলো ভরা
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত্র প্রকৃতি ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে'।

হাইনে জাতধর্মে ইহুদী। কবির ধমনীতে আর্য রক্ত নেই। কিন্তু আর্য ধমনীতে তখন শুরু হয়েছে ভারতীয় আর্যের প্রতি সমমর্মিতা। ভারতবর্ষের প্রতি গৌরবানুভবের প্লাবন শুরু হয়েছে জার্মানিতে। কবি হাইনেও নিজেকে ভাসালেন সেই প্লাবনে। শেলি, কীট্‌স, বায়রন যে অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন গ্রীসের----সেই অবস্থায় হাইনের স্বপ্নাভিসার ভারতবর্ষের দিকে। 'হাইনের বহু কবিতায় কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়াবেগ (জার্মান ভাষায় এই হৃদয়াবেগের নাম 'শুয়ের্মবাই') ধ্বনিত হয়েছে'।

প্রসঙ্গত ডক্টর আলী উল্লেখ করেছেন, জার্মান ভাষা শিক্ষার্থী ভারতীয়দের সাধারণত প্রথম যে জার্মান উপন্যাসটি পড়তে দেওয়া হয় সেই 'ইমেন্‌জে' বইটির কথা। 'ইমেন্‌জে' উপন্যাসে জার্মান শিশুদের একটি খেলাধূলার দৃশ্য বর্ণনা আছে। সেই দৃশ্যে বাচ্চারা সবাই মিলে একটা ঠেলার গাড়ি তৈরি করে সেটার ওপর চেপে বসেছে কেউ কেউ, আর বাকিরা সবাই মিলে সেটাকে ঠেলছে আর সেই সঙ্গে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—

'নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েন'। ভারত চলো, ভারত চলো। ঠেলার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বা চলতে চলতেই তারা ভারতবর্ষে পৌঁছে যাবে।

কবিরা শিশুপ্রকৃতি ধরেন এবং শিশুরাও কবিপ্রকৃতি ধরে। দু'জনারই বাস কল্পনারাজ্যে। কিন্তু প্রশ্ন তারা নাখ্ ইণ্ডিয়েন, নাখ্ ইণ্ডিয়েন্ করছে কেন, 'নাখ্ আমেরিকা' কিংবা 'নাখ্ চীনা' বলে চেঁচাচ্ছে না কেন? জার্মানির কাচ্ছাবাচ্চাদের ভিতরও তখন এই শুয়েমর্বাই ছড়িয়ে পড়েছে। এ বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩২ জার্মানীতে মুজতবা আলীর ছাত্রগবেষকের জীবন পর্বের পর, ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০-এর শেষের দিকে তাঁর

এই দ্বিতীয় বাসভূমির বিভিন্ন শহবে তিনি কাটিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁর প্রথম বাসভূমি থেকে এই দ্বিতীয় বাসভূমিতে যাওয়া—নানা সময়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হয়েছে বিচিত্রগামী। প্রথমবাবে বার্লিন পৌছানো বোম্বাই থেকে জাহাজে কবে ফ্রান্সের বন্দরে এসে, রেলপথে বার্লিন। পথে বের হলে বিপত্তি কেন সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ওঁর কথায়, '...ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের সঙ্গে বাসের নম্বর গুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়িব আগাপান্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জবুথুবু হয়ে ককাতে ককাতে যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলুম সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের'।

পরবর্তীকালে কোলন এয়াবপোর্ট দুটি ব্যাগের একটি হারিয়ে বহু অভিজ্ঞ মানুষটিও কিছু সময়েব মত কেমন দিশেহাবা হয়ে ওঠেন, বিমান বন্দরেব হাবানো প্রাপ্তি দপ্তবে ছুটে যান, নিজেব নাম ও ঠিকানা নথিভুক্ত করেন সদাহাস্যময়ী হাবানো দপ্তরে—সেই অনুপঙ্খ ছবি আমাব মনে পড়েছিল বার্লিনেব টেগেল বিমান বন্দরে পা দিয়েই। দিল্লি থেকে লুফ্‌থানসায় সোজা উড়ে গেছিলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেখানে এয়াবক্র্যাফ্‌ট বদল করে বার্লিনে পৌছে দেখি—আমাব লাগেজ আসেনি। উদ্বেগে টানটান হয়ে সামান হারানো সেরেস্তার দিকে এগোতে এগোতে সেই মুহূর্তে সৈযদ মুজতবা আলীর সেই কোলন বিমান বন্দবে বাক্স-বিপর্যযেব ছাড়া আব কিছু মনে পড়ছিল না। আশ্চর্য! টেগেল এযারপোর্টেব নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে দেখি—ওই কোলনের কামিনীর মতই সুরূপা জার্মান তন্বী সহাস্যে ববাভয় দিচ্ছে। গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউটের ঠিকানা লিখে দেওয়ার পর হুবহু ডক্টর আলী বর্ণিত ভঙ্গি মাত্রেই বলেছেন, কোনো ভয নেই, তোবঙ্গ তোমাব ঠিক পৌছে যাবে। হ্যাঁ, পরদিনই সেটা পৌছে গিয়েছিল গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউটের অফিসে।

ববীন্দ্রনাথেব তিনবার (১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০) জার্মানি ভ্রমণেব শেষবাবে মারবুর্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে গুরুশিষ্যের। জার্মানির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা কববেন রবীন্দ্রনাথ। কবি অমিয় চক্রবর্তী তারযোগে জানিয়েছিলেন মুজতবা আলীকে—গুরুদেব তাঁকে ডেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন সৈয়দ মুজতবা আলী কাছাকাছি ছিলেন। মারবুর্গের সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন আলী সাহেব তাঁব গুরুদেবের বক্তৃতা শুনতে।

[সে]দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন, '....টানা এক ঘন্টাকাল গুরুদের বক্তৃতা দিলেন,—একটিবাবের সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নবনারীর শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিয়েছেন..... আবার মনে হয়েছিল সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিযে দেখব সেই বিপুল কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে'।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘুরতে ঘুবতে ডক্টর অলোকবঞ্জন দাশগুপ্তের ছাত্র, বাংলাভাষার গবেষক ইযর্ক বাথসিঙ্গাবকে বলছিলাম, সৈয়দ মুজতবা আলীর মত আর কোন বাঙালি কথাসাহিত্যিক সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে জার্মানিকে তার প্রতিদিনের বেঁচে থাকার এমন অনুপুঙ্খ ও বর্ণবিচিত্রায় পৌঁছে দিতে পারেননি। কবি অলোকরঞ্জনকে বাদ দিলে আর কোন বাঙালি লেখকেব জীবন ও সাহিত্যে জার্মান সংস্কৃতি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয়নি। তাও তো যতখানি পরিকল্পনা করেছিলেন ডঃ আলী তার অংশ বিশেষই লিখে উঠতে পেবেছেন। 'হিটলার'কে নিয়ে উপন্যাস লেখাব কাঠামো গড়েছিলেন ১৯৩৪ সাল থেকে। পরে একাধিক লেখাও লিখেছেন হিটলাবকে নিয়ে। কিন্তু তার পরিকল্পিত উপন্যাসটি পূর্ণরূপ পায়নি। সৈযদ মুজতবা আলীর লেখায় হিটলাবের সময়কার জার্মানীকে পেযেছি, পেযেছি তাঁর পরেব আমলটিকেও। আরো পবে জার্মানির সমৃদ্ধিকেও শেযবারের মত দেখে এসেছেন মৃত্যুর কয়েকবছর আগে। জার্মানিতে ছাত্রজীবনেই আনা মারিব সঙ্গে বন্ধুত্বেব শুরু মুজতবা আলীর। শেষ দুবার জার্মানির ভ্রমণে তিনি হামবুর্গে আনা মারির বাড়িতে ছিলেন। কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তেব জার্মানির অধিবাসী ভাই শ্রীরঞ্জিত সেনগুপ্তের মাবফৎ শ্রীমতী আনা মারির সৌজন্যে পাওয়া কয়েকটি আলোকচিত্রে ১৯৭১ হামবুর্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাপ্তবয়সেব প্রতিকৃতিও যেন তাঁর এই দ্বিতীয় বাসভূমিকে ভালবাসার কথা বলে। এলবে-নদীর তীরে আনা মারির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কিংবা হামবুর্গে আনা মারির বাড়ির বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে আছেন স্বস্তিতে।

শুধু হাইডেলবার্গে বাংলা সাহিত্যের গবেযক জার্মান—তরুণ প্রজন্মের কয়েকজনকেই নয়; বার্লিনের, হামবুর্গের, কোলনের সাহিত্যপ্রেমী অনেককেই

জিজ্ঞাসা করেছি মুজতবা আলীর প্রসঙ্গ জার্মানিতে কোনোরকম স্মৃতিধায করার ছোটখাটো কোনো প্রয়াস কখনো হয়েছে কিনা—আশা ব্যঞ্জক উত্তর একটিও পায়নি।

এদিক থেকে আমার জানা একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ —ডক্টর রাহুল পিটার দাসের দুটি জার্মান অনুবাদ Die Zigeunerin, (বেদেনী। পঞ্চতন্ত্রের 'বেদে' শিরোনামের লেখাটি) এবং caturanga সহ শ্রীমতি ক্রিস্টেল দাসকে লেখা মুজতবা আলীর দশটি চিঠির সংকলন—Delta—Kultur und Politik aus Bangladesh. ডক্টর পিটার দাসের মা শ্রীমতি ক্রিস্টেল দাস ছিলেন কলকাতার ম্যাক্সমূলার ভবনের গ্রন্থাগারিকা। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রান্তিক জীবনের জার্মান-সংযোগের অন্যতম শুভানুধ্যায়িনী তিনি। সংকলিত দশটি চিঠির থেকে (প্রথম চিঠি ২৫ আগস্ট ১৯৭১ কলকাতা এবং দশম চিঠি ২মে, ১৯৭২ ঢাকা থেকে লেখা।) সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনের একেবারে শেষের দিকে পৌঁছে তাঁব দ্বিতীয় বাসভূমি সম্পর্কে নিরন্তব অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় উঠে আসে। প্রথম চিঠিতে কেন তিনি 'হিটলার' সম্পর্কে আগ্রহী ব্যাখ্যা কবতে গিযে বলেছেন, (১) 'হিটলাব' রীতিমত একটা ব্যাপার ইতিহাসের (২) মুজতবা চান না ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ এব জার্মানির ইতিহাসের পুনবাবৃত্তি। তিনি ডুসেলডর্ফে 'Hitler Private' গ্রন্থের একটি কপিও পাননি এবং অবশেষে সেটি গোডেস্‌বার্গের কাছে মুফেনডর্ফ নামে একটি ছোট গ্রাম থেকে যোগাড় করেন। দশম পত্রলেখাটিতে মুজতবা আলী জানিযেছেন ঢাকায় তাঁর নিয়মিত 'ডয়েচওয়েলে' রেডিও সংবাদ শোনার কথা।

বার্লিনের দেওয়াল সরে যাওয়ার দু'বছর পরে, ক্রযেৎবার্গের গ্রেঞ্জেনলোজ কাফের বাংলা লাইব্রেরির আয়োজনে সাহিত্যসভায় বসে, বারবারা দাশগুপ্ত, দাউদ হায়দার, সুনীল দাশগুপ্ত এবং বিমল মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে ভাবছিলাম, দেওয়াল সরে যাওয়া জার্মানির এই প্রাণের শহরে, তাঁর চাচাসাহেবের বার্লিনের খোলা হাওয়ায়, দুই বাঙলার বাঙালিরা কি এখন একটু বেশি করে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের অভাবটা বোধ করছে না? তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে, আজকের পর্বান্তরে পৌঁছবার ইতিহাসটিকে, আমৃত্যু তাঁর বোধদীপ্ত সরস সংরাগটিকে ফিরে দেখতে চাইছে না?

সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বিচিত্র সংলাপের সপ্রতিভ নায়ক। বক্তব্যের তাৎক্ষণিকতায়, শব্দ-নির্মাণের ব্যস্ততায, নির্লিপ্ত রহস্য-সংবেদনে, প্রতিবাদীকে পরাভূত করার কূটকৌশলে তাঁর সমকক্ষ আমি কাউকে দেখিনি। আমি তাঁর সঙ্গে কখনও বিতর্কে নামিনি, জানতাম সত্য আমার পক্ষে থাকলেও জিতবো না। তিনিই জিতবেন—জয় তাঁর ব্যসন এবং আনন্দ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলতেন, মুজতবা আলী তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে প্রচণ্ড গবেষক হতে পারতেন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সার্থক অন্বেষণ চালাতে পারতেন, ভারতীয় ইতিহাসের অনুদ্‌ঘাটিত দিক উন্মোচন করতে পারতেন কিন্তু কিছুই করেননি। শুধু ব্যঙ্গ-রসিকতায় নির্বাসন নিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করলেন। আমি বলতাম, রসিকতায় বাঙ্ময়তায় তিনি নাগরিক মানুষের প্রাত্যহিকতাকে সবাক করেছেন, এটারও তো অনেক মূল্য আছে। তিনি শব্দে ও চাতুর্যে যেভাবে কলকাতা ও জার্মানীকে মানুষের মুহূর্তের চলমানতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার তুলনা হয না। জানি, শ্লীল-অশ্লীলতার দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে ছিলো না, সামাজিক মর্যাদার অভিমানে তিনি শব্দকে শাসন করেননি—বাংলার শব্দ ব্রহ্মাণ্ডে তিনি নগ্নকায় ভস্মাবিভূতিময় শিব। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জাল-প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন, "মানুষের নিমিত্ত একত্র চিৎকার আর শুনা যায় না, যাহা এখন শুনা যায়, তাহা সব বাহকের চিৎকার—পথ হইতে লোক তাড়াইবার চিৎকার।" সৈয়দ মুজতবা আলীর চিৎকার ছিলো মানুষের নিমিত্ত, শোভন অশোভনের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে তিনি মানুষের জন্য কথকতা করে গেছেন।

একজন লেখক তাঁর উপলব্ধির প্রতিরূপ আবিষ্কার করেন শব্দে। অথবা আবিষ্কার না বলে বলা যায়, তিনি স্বতঃসিদ্ধান্তে একটি বক্তব্যে উপনীত হন। আমরা অনেক সময় সকালে বেলায় জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকাই, তখন

হয়তো কুয়াশার অস্পষ্টতায় পাখি দেখি, মেঘ দেখি, এলোমেলো গাছের পাতা অথবা কাগজের টুকরো উড়ে যেতে দেখি, হযতো গানের শব্দ কানে আসে, হয়তো অনেক পুরনো ঘটনা সহসা মনে সাড়া তোলে। আমি যদি বুদ্ধিমান হই, তাহলে আমি তখন সমস্ত ঘটনার বিমিশ্রণে একটি কুশলী ভাষণ উপস্থিত করবো, যার মধ্যে আমার চিন্তা ও অহমিকার পরিচয় থাকবে এবং অধীত বিদ্যার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হবে। একটি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় এভাবেই লেখকের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। এ-পরিপূর্ণতার পথে অন্তরঙ্গ ধ্যান এবং চিন্তায় শব্দগুলো আবেগ ও বিশ্বাসের উষ্ণতায হৃদয়কে উন্মোচিত করে। সমস্ত ঘটনা এবং চিন্তা তখন শব্দ হিসেবে উদয় হয়।

শব্দ হচ্ছে দাবাখেলাব গুটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতিব সাহিত্যে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। আবার কখনও কখনও শব্দ যোগ করি, কখনও পুবাতন শব্দকে অস্বীকার করি এবং এভাবে আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনববত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলি।

সমাজ হচ্ছে শব্দবৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা, প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহ করছে। আমরা যদি কখনও আমাদেব কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই, তাহলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ কববে ভাযা হয়ে কখনও জাগবণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতিব ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চান, তিনিও তাঁর শব্দকে মানব সমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতি-বিধিতে যতটা অঞ্চল আমরা পরিক্রম করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তার চেয়েও অধিক অঞ্চল পরিক্রমণ কবে, কিন্তু যেহেতু তা শব্দরূপে এবং যেহেতু শব্দ সকল মুহূর্তেই সমাজের অনুভূতির উত্তাপ তাই আমাদের সকল ইচ্ছা, কল্পনা ও স্বপ্ন আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার উৎপ্রেক্ষা মাত্র।

লেখার প্রাথমিক পর্যায়ে যে সবলতা থাকে তা জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য, কিন্তু সর্বশেষের সবলতা অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তার জন্য। আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, কিন্তু অবশেষে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং

অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক থেকে মুক্তবাক এবং অবশেষে সর্বসঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক—যে কোনও প্রধান লেখকের লেখক-জীবনের ক্ষেত্রে এ-উক্তি চরমভাবে সত্য। যাকে ইংরেজীতে বলে crystallization অর্থাৎ স্ফটিকবন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন করবে না। অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করবো। আমবা প্রতিদিন জীবনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিশ্বাস গ্রহণ করছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে সঞ্চয় অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে, একজন লেখকেব জীবনে তা যেমন সত্য, অন্য কারোও জীবনে তেমন নয়।

পাঠকের বুদ্ধিকে দীপিত করা এবং আবেগকে পরিচ্ছন্ন করাব দায়িত্ব লেখকের। শব্দের বিন্যাসের মধ্যে নতুন ধ্বনিব্যঞ্জনা দান কবে, বক্তব্যকে একই সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের মধ্যে শিহবিত করে পাঠকেব আপন বোধের রাজ্যে লেখক তার সত্তাকে কম্পিত দেখবেন। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ এ-মুহূর্তেব সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মবণচিহ্ন হবে। জ্ঞানের পবিধি বর্তমানে অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমবা যা জানি তা আমাদের প্রতিদিনেব প্রয়োজনেব অনেক বেশী অর্থাৎ যতটা আমাদের ব্যবহারে লাগবে তার চেয়ে অনেক বেশী। একজন লেখককে এ জানার অসম্ভব প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে লেখক সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধিমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই পাঠককে লেখকের কাছে পৌঁছুতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে একথা খুবই প্রযোজ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রতাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন, শব্দকে তরা বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।

প্রতিদিনের জীবনের লঘুসম্পর্কের যে শিহরণ আছে, ক্ষণকালীন যে

কৌতুক আছে, সময় অপহরণের জন্য কয়েকজন মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের যে কল্লোল আছে মুজতবা আলীর বলার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার কোন বচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আমরা অনুভব করি যে আসরের অন্যান্য লোকেরাও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। এই অসাধারণ দক্ষতার ফলেই মুজতবা আলী তাঁর বচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাঙ্‌ময় করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ অনুযোগ করেন যে, মুজতবা আলী ইচ্ছা করলে তাঁর বিচিত্র জ্ঞানেব নির্যাস নিয়ে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত কোন কিছু আমাদেরকে দিযে যেতে পারতেন। হয়ত বা পারতেন কিন্তু তাহলে আমরা সদাহাস্যময় মুজতবা আলীকে প্রাত্যহিক জীবনের লঘু স্পর্শের আনন্দ-কল্লোলেব মধ্যে পেতাম না।

মুজতবা আলী অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, বিশেষ করে জার্মানীতে। সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময়-ক্ষেপণেব যে সমস্ত উপকরণ ছিল সেগুলো তিনি আযত্ত করেছিলেন। আমবা সাধাবণত যে জার্মানীকে জানি শিলার, গায়টে অথবা হাইনেব রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মানী সে জার্মানী নয়, তাঁর হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগব জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর-মুহূর্তের জার্মানী। এ জার্মানীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিযাবের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যে ও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধাবণত এ জার্মানীকে দেখেনি। মুজতবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মানীকে দেখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বচনায় তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে তাঁব দৃষ্টিপাতই আমরা আবিষ্কার করি। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পবিচায়ক নয়। মুজতবা আলীর রচনায় আমবা হিটলারের সমসাময়িক জার্মানীকে পাচ্ছি, আবার হিটলারের পরবর্তী জার্মানীকে দেখছি এবং একেবারে শেষে নতুন শোভায় সমৃদ্ধ নতুন জার্মানীকে পাচ্ছি। এক-কথায় বলতে গেলে তিনি জার্মানীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন

এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। জার্মানীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের কল্লোলের মধ্যে তিনি জার্মানীকে আবিষ্কার করেছেন।

ঠিক একইভাবে তিনি কলকাতাকেও চিনেছিলেন এবং তার পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। কলকাতার যে পরিচয় সাহিত্যে অথবা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের জীবনযাত্রায়, সে কলকাতাকে মুজতবা আলী তাঁর প্রয়োজনের সামগ্রী করেননি। বর্তমানকালের অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় যে মানুষ প্রতিদিন জীর্ণ হচ্ছে, সে মানুষের পরিমণ্ডলের আনন্দের মধ্যে যে আনন্দের উপকরণ আছে, সে আনন্দের উপকরণকে তিনি সংগ্রহ করবাব চেষ্টা করেছেন। মুজতবা আলীর রচনায় সকল মানুষকে একই আসরে উপস্থিত হতে দেখি। পর্যাপ্ত রসিকতার মধ্যে বিনয়ের লঘুস্পর্শে চতুর সংলাপেব মধ্যে যে সব মানুষকে আমরা দেখেছি তারা সর্বতোভাবে বর্তমান মুহূর্তের মানুষ। যদি সময়কে স্পষ্টভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় যে মুজতবা আলীর রচনায় আমরা ঠিক এই মুহূর্তের চলমান বর্তমানকে পাই। কতদিন এই বর্তমান থাকবে জানি না, কিন্তু যতদিন থাকবে ততদিন মুজতবা আলীর রচনাকে আমরা বর্তমান সময়ের অন্তঃসার হিসেবে গণ্য করব।

প্রত্যেক লেখকের বচনার প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিফলিত মানসিকতার বাণীরূপ। কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও অবজ্ঞায়, কখনও নিরাসক্তিতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করি তখন আমাদের বর্ণনার শব্দসজ্জায় কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তি ধরা পড়ে। তথ্যের ব্যতিক্রমের সঙ্গে অনুভূতির ব্যতিক্রম যে সর্বত্র হবে তা বলা চলে না। তথ্যের সমৃদ্ধি তার স্থিততায়, এবং অনুভূতির সমৃদ্ধি তাব প্রবাহে। 'তিনি কবি', 'তিনি কবিতা লিখবার চেষ্টা করেন', 'তিনি কবিতা লেখেন'—এ তিনটি উক্তি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করেছে। প্রথম উক্তিতে একটি তথ্যই আছে যে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি কবি কিন্তু তিনটি উক্তি তিনটি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করছে। প্রথম উক্তিতে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় উক্তিতে অবজ্ঞা এবং তৃতীয় উক্তিতে নিরাসক্তি স্পষ্ট। স্টাইল বা বাগ্ধারা এভাবেই লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা।

লেখকের মানসিকতার পশ্চাতে সক্রিয়রূপে অথচ প্রায়শই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা। যে সমাজ ও পরিবেশ লেখককে লালন করেছে এবং যার প্রশ্রয়ে তিনি সমৃদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত তার মানসরূপ নির্মাণকার্যে সে সমাজ সর্বদাই প্রতিশ্রুত। যে পাঠক্রম এবং শিক্ষার ধারায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন সে শিক্ষা তার বক্তব্যকে বুদ্ধিদীপ্ত অথবা নির্বিকার, চাতুর্যময় অথবা নিরাভরণ, দ্বিধাহীন অথবা শংকিত, প্রশান্ত অথবা অশোভন করে।

গদ্য লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ এজন্যই দুরূহ কর্ম। আমরা সকলেই কথা বলি গদ্যে, আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ের ভাষা গদ্য, তাই বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনার মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে তা আমাদের নির্ণয়ে আসে না। কবিতা সম্পর্কে গভীর অনুধাবন সহজে সম্ভবপর না হলেও যে কোনও লোক একথা বলতে পারেন যে কবিতার একটি বিশেষ গঠনসৌষ্ঠব আছে, ছন্দ আছে, শব্দের পুনরাগম আছে। কবিতা সম্পর্কে এ কথাই সব কথা নয এবং হয়তো বিশিষ্টার্থক কোনও কথাই নয। কিন্তু বিশ্লেষণবিহীন হঠাৎ মন্তব্যের জন্য এ কথাই আপাতত চূড়ান্ত। গদ্য সম্পর্কে এভাবে হঠাৎ কোনও মন্তব্য করা চলে না। মুজতবা আলী প্রসঙ্গে এ কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁব স্বভাব, মানসিকতা, চিত্তগত প্রবণতা তাঁর শব্দের সম্ভাবেব মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।

দেশ-বিভাগেব পূর্বে বিদেশ প্রত্যাগত সুদর্শন যৌবনময় সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন রমণীরঞ্জন। সবাই বলতো, প্রেমে তিনি ছিলেন উদাব এবং নিষ্কুণ্ঠ। এক ভদ্রমহিলা সৈয়দ মুজতবা আলীকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি নাকি রমণী-রঞ্জন? কলকাতায় প্রেমের বৈকুণ্ঠ বসিয়েছেন?" উত্তরে মুজতবা আলী বলেছিলেন, "রমণী শব্দটি রমণ থেকে এসেছে। সুতরাং একান্ত নিরামিশি বৈষ্ণব না হলে যে-কোনও যুবপুরুষ রমণী-সান্নিধ্যে নিশ্চয়ই ইতিকর্তব্য পালন করবে।" মহিলা লজ্জিত ও পরাভূত হয়ে আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পাননি। এ-ঘটনাটি আমি মুজতবা আলীর মুখেই শুনেছি।

মুজতবা আলী সাহিত্যের, সঙ্গীতের এবং নৃত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। কোনও একান্ত আশ্রম তাঁর ছিলো না, সর্বত্রই ছিলো তাঁর অবাধ গতিবিধি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিদেশীকে জেনে এবং তাদের ভাষা ও স্বভাবে

পারঙ্গম হয়ে সে-সব দেশের শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অধিগম্যতা ঘটেছিলো। এ-অধিগম্যতা তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞ করেনি, করেছিলো সুরসিক। তিনি যখন কথা বলতেন তখন শীত-রাত্রে কম্বলের তলার উষ্ণতার মতো সবাই যেন জমাট বেঁধে থাকতো। কত বিচিত্র কথা, কত বিচিত্র উল্লাস। আনন্দের যথার্থ রসজ্ঞ না হলে কেউ মুজতবা আলীকে চিনতে পারবে না।

বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি।

লেখাটি বাংলাদেশের 'উষালোক' (২ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, নভেম্বর-জুন, ১৯৮৩-৮৪) পত্রিকা থেকে সংকলিত। রচনাটি সন্দীপ দত্তের লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত।

মুজতবার হিটলার

ইমানুল হক

অধিকাংশ 'ইমেজ কনসাস' মানুষের মতো হিটলারের 'হিপোক্র্যাসি'ও ছিল ষোল আনা। বলা ভালো, ষোল আনাব জায়গায় আঠারো আনা। 'প্রেম' করেন নি, রাত্রি যাপন করেছেন। কম করে আটটি মহিলার সঙ্গে। গোপনে। কামিয়েছেন টাকা। মিটিয়েছেন যৌন ক্ষুধা। প্রচারে থেকেছেন 'ব্রহ্মচারী'। সৎ আর নির্লোভ। 'বিয়ে' করেছেন মাত্র একজনকেই। মৃত্যুর মাত্র ৪০ ঘণ্টা আগে পনেরো বৎসরের 'বন্ধুত্বের' স্বীকৃতি দান করে বিয়ে করেছেন এফা ব্রাউনকে।

হিটলারের 'গুপ্তিপ্রেম'-এর 'প্রেমিকা' অন্তত আট। এই আট জনের নামই আমরা জানি। পিয়ানো নির্মাতা ধনী কার্ল বেখস্টেইনেব স্ত্রী হেলেন, তাঁর মেয়ে, কোটিপতি প্রকাশক হুগো ব্রাডমানের স্ত্রী, ফিনল্যাণ্ডের ধনী কাগজ মিলের মালিক গারট্রুড সিডলিৎস, 'ভাগ্নী' গেলী রাউবাল, উইনি ওয়াগনার এবং নাৎসী অলিম্পিকের 'নারী পুরোহিত' লেনি। বলা বাহুল্য, এফা ব্রাউন এই তালিকার বাইরে।

মুজতবা আলীর মতে, 'হিটলার তাঁর জীবনে সবশুদ্ধ ½+১+½ - দুইবার ভালোবেসে ছিলেন'। মুজতবা আলীর বক্তব্য, ''প্রথম 'হাফ'টি হিটলারের 'কাফ লাভ''। অর্থাৎ 'বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো' আর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুরে মরা। এটি মুজতবার'র 'টিন এজার' হিটলারের 'সত্যকার রোমাণ্টিক প্লাতনিক প্রেম'।

এর প্রায় বাইশ বছর পরে 'হিটলার পুরা পাক্কা ভালোবেসে ছিলেন গেলী রাউবাল নামে এক কিশোরীকে'। 'হিটলারের প্রেম' প্রবন্ধে মুজতবা আলী লিখেছেন এঁর কথা। এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও নাকি

আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিলেন। বন্ধু হফম্যানের জন্য এই কাজটি তাঁর আর করা হয়ে ওঠেনি।

হিটলারের শেষ '২ প্রেম' এফা ব্রাউনের সঙ্গে। মুজতবা আলী এঁকে 'রক্ষিতা' আখ্যা দেওয়ার বিরোধী। কারণ? 'যে রমণী দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে, তাকে 'রক্ষিতা' আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়'। সর্বোপরি, 'এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী'।

হিটলারের প্রতি মুজতবা আলীর বিদ্বেষ যেমন প্রকট নয়, তেমনি সহানুভূতিও খুব বেশি নয়। তবু সরসতা দিয়ে খানিকটা যেন ঢাকতেই চাইছেন হিটলারকে। এফা ব্রাউনকে হিটলারেব বিয়ে না করার যুক্তিকে কার্যত খানিকটা শক্তিশালীই করে ফেলেছেন মুজতবা আলী। পক্ষান্তরে এ তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। তিনি অবশ্য তাঁর একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সবকটা ভুয়ো নয। এবং হিটলার সর্বদাই এ জাতীয় আলোচনার সর্বশেষ মধুরেণ সমাপয়েৎ করে বলতেন, 'জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড' = জর্মনি আমাব (জীবনের মরণের বধু) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

হিটলারকে নিয়ে নানা মন্তব্য ছড়িয়ে আছে মুজতবা আলীর রচনায়। আগেই বলেছি তিনি বিদ্বিষ্টও নন, আমার সহানুভূতিশীলও নন। খুব বেশি হলে বলা যায়, এফা-প্রেমিক হিটলার সম্পর্কে মুজতবা আলীর মনোভাব 'নরম'। তার মানে এই নয় যে, কোথাও তিনি হিটলার সম্পর্কে 'চরম' মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নৈর্ব্যক্তিক। খানিকটা ঐতিহাসিকের 'নিস্পৃহ' মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার রচনাভঙ্গীর সরস প্রসন্নতা। দুইয়ের যোগে হিটলার 'দানবীয়' হয়ে ওঠেন না। কিন্তু তাঁর দানবসত্তার, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার চিত্র আমরা পেয়ে যাই।

হিটলার সম্পর্কে মুজতবা আলীর মনোভাব যাই হোক না কেন, এফা ব্রাউন সম্পর্কে কিন্তু মুজতবা আলী দুর্বল। তাঁকে এঁকেছেন দরদের

সঙ্গে। উপলব্ধি করেছেন তাঁর যন্ত্রণাকে।

জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী'র ইমেজ রক্ষা করতে ব্যস্ত হিটলারের জন্য নষ্ট হয়েছে এফা ব্রাউনের নারীজীবন। হিটলারের জার্মানিব চ্যান্সেলার হওয়ায় তাঁর যন্ত্রণা যায় আরো বেড়ে। সে কথা লিখেছেন মুজতবা আলী।

মুজতবা আলী হিটলারকে নিয়ে লিখেছেন 'হিটলাব'। এতে আছে দুটি প্রবন্ধ। একটি দীর্ঘ। অন্যটি বড়োই ছোট। প্রথমটির শিরোনাম 'হিটলারের শেষ দশ দিবস'। দ্বিতীয়টি 'উত্তর হিটলার'। শেষটিকে ঠিক প্রবন্ধ বলা অসমীচীন। বলা ভালো, প্রথমটির উপসংহার। এছাড়াও 'কত না অশ্রু জল' গ্রন্থে 'হিটলারের শেষ প্রেম' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'রাজা-উজির' গ্রন্থে আছে 'হিটলারের প্রেম' বচনাটি। প্রকৃতপক্ষে 'চাচা কাহিনী' থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রন্থে হিটলার সম্পর্কিত নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মুজতবা আলী প্রথম জার্মানি যান ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। হিটলার তখনো জার্মানিতে সুপবিচিত হননি। মুজতবা আলীর জার্মানি বাসকালেই শক্তি বাড়লো হিটলারের। ১৯৩২ সালে তিনি দেশে ফিরলেন। ১৯৩৩ সালে হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলার। '৩৪ সালে লেখক আবার জার্মানিতে। এক বছর কাটালেন সেখানে। দেখলেন হিটলারেব শাসন। ১৯৩৮-এ আবার গেলেন। থাকলেন চার মাস। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ কবলেন। ১৯৩৯ সালে লাগলো বিশ্বযুদ্ধ।

বিশ্বযুদ্ধের পর লেখক কিনলেন হিটলার ও তাঁর বাজ্যশাসন সম্বন্ধে শতশত বই। জার্মান, মার্কিন, ফরাসী, ইংবেজ ইত্যাদি লেখকের। লেখকের মতে, তাঁরা সকলেই পক্ষে অথবা বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু লেখকের মতে, তিনি নিজে নিরপেক্ষ।

হিটলারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেন নি মুজতবা আলী। সে উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। তাঁর লেখায় যেমন হিটলারের প্রেম এসেছে, তেমনি এসেছে তাঁর রাজ্য শাসন পদ্ধতির নানাদিক। ফুটে উঠেছে মৃত্যুর আগের দশদিন ব্যাপী 'ব্যক্তি' হিটলারের অসহায় অবস্থার কথা।

দাম্ভিক, ক্ষমতালোভী এক মানুষ, যিনি মনে করতেন তৃতীয় রাইখ এক হাজার বছর স্থায়ী হবে, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিনষ্টের পরিণতির কথা শুনিয়েছেন

লেখক। দেখিয়েছেন তাঁর অন্তিম পরিণতির কথা। একদিন যাঁব অঙ্গুলিহেলনে কেঁপে উঠতেন সবাই, শেষমুহূর্তে তাঁর শবদেহ দাহের জন্য পেট্রোল পর্যন্ত জুটছে না। অতিকষ্টে তা জোগাড় করতে হচ্ছে। দু'একজন ছাড়া সব বন্ধুই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জেনেছেন হিটলার। নিজেও জানেন, হিটলারী-জার্মানির দিন শেষ, তবু বিশ্বাস করছেন না। ম্যাপ সাজাচ্ছেন।

কি অদ্ভুত এক অসহায় অবস্থা। সমস্ত স্বৈরাচারীব-ই এই পরিণতি হয়।

একদিন যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, রাশিয়ায় জার্মান চাষী-মজুর দিয়ে কলোনি বানাবেন, সেই হিটলার শেষ মুহূর্তে রুশ সৈন্যদের হাতে ধৃত হবার ভয়ে আত্মহত্যা করলেন।

হিটলারেব ভয় ছিল রাশিয়ানরা তাব মৃতদেহ লটকে দেবে রাস্তায়—তামাশা দেখাব জন্য। তাই আদেশ দিযেছিলেন পোড়াতে। কিন্তু হিটলারের পোড়া কপাল—লাশ পোড়েনি। তবে রাশিযানরাও তা লটকায়নি রাস্তায়। লুকিয়ে বেখেছিল নিজেদের কাছে। কেন না রাশিযানরা জানে, জার্মানরা শহীদ পূজারী। তাই ..

মুজতবা আলীর হিটলাব---প্রেমিক, ক্রোধী, চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্বলও। যৌনতাড়িত। তাই যৌনক্ষমতাবর্দ্ধক ইঞ্জেকশন নেন। আবাব আবেগও আছে। অপবিণামদর্শী, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। মুজতবা আলীব হিটলার কোন একপেশে চরিত্র নয়। দোষে-গুণে মেশানো মানুয। সাদা অথবা কালো বঙে একবগ্‌গাভাবে আঁকা হয়নি হিটলারকে। আঁকোনি মুজতবা আলী।

কারণ, মৃত্যুর ৪০ ঘণ্টা আগে বিয়েব সিদ্ধান্ত নেন একজন নিষ্ঠুরতম স্বৈরাচারী। যিনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কিংবা গ্যাস চেম্বাবে মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার আদেশ দেন, তিনিই বিয়েব পার্টি দেন জীবনে শেষ দিনে।

'ইমেজ কনসাস' মানুষরা হিপোক্র্যাট হতে বাধ্য। জানতেন মুজতবা আলী।

তাই 'জর্মনিই আমার বধূ' বলা হিটলাবের বধূ এফাই সহানুভূতি পান মুজতবার। হিটলার নন।

প্রেমই বড় হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। রাজনীতি নয়।

'শবনম' রচয়িতা নিজেকে আড়াল করবেন কি করে?

সাংবাদিক মুজতবা

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাম। এই মধুর স্বভাবী ও মিষ্টভাষী লেখক মানুষটি সারা জীবন ধরে নানা ধরনের সাহিত্য কর্ম করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বনামে ও ছদ্মনামে অসংখ্য লেখা লিখেছেন। 'বেলে লেটার্স' (bells-letters) বা রম্যরচনায় যে জনকয়েক মুষ্টিমেয় লেখক বাংলা সাহিত্যে চিরকালের জন্য—চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন—সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁদের মধ্যে প্রধানতম।

'বেলে লেটার্স' বা রম্যরচনা আমাদের সাহিত্যে নবীন। সবচেয়ে আগে বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র 'লোক রহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' লিখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন—এবং প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়জনকভাবে সাফল্য লাভ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথও এ ধরনের উৎকৃষ্ট রচনা লিখেছেন। যা হাস্য, পরিহাস এবং কৌতুকরসে সমুজ্জ্বল। বিদেশে বিদেশী সাহিত্যে—বিশেষ করে ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে রম্যরচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর আগে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'বেলে লেটার্স' লিখে সাফল্য লাভ করেন।

'বেলে লেটার্স' বা রম্য রচনা যাঁরা লিখেছেন—একটা বিস্ময়জনক জিনিস ও সাদৃশ্য তাঁদের মধ্যে দেখা যায়—তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে কিম্বা সাময়িকপত্রের জন্য নিয়মিত কলম ধরেছেন। হয় প্রথমে সংবাদপত্রের 'ফিচার কলম' লিখেছেন—অথবা সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে কিম্বা সামায়িকপত্রে 'ফিচার কলম' বা 'বিশেষ স্তম্ভ' লিখেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে রুডিয়ার্ড কিপলিঙ, চার্চিল, বার্ণাড শ, হেমিংওয়ে ও স্টেইনবেকের নাম উল্লেখ করলাম। আরো আগের যুগের ডিকেন্স প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র বসু, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের যে নামেই অভিহিত করুন—সাহিত্য ও সাংবাদিক সত্তা—এঁদের পরতে পরতে মিলে মিশে ছিল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক হিসেবেই সমধিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁর সাংবাদিক সত্তাও বাদ দেবার মত নয়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম দীর্ঘকায় সাহিত্যসৃষ্টি ও খ্যাতি—'দেশে-বিদেশে' নামে একটি বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী লিখে। সে সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিকাল পরে—বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনা বা বেলে লেটার্স-এর যুগ এসেছে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাফল্যই এর কারণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসও প্রকাশিত হয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' ধারাবাহিক রচনা হিসেবে সাপ্তাহিক 'দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে। 'দেশে-বিদেশে' সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগায়, আলোড়ন তোলে। এই নতুন লেখকের দিকে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয। পাঠক ক্রমে ক্রমে জানতে পারেন লেখকের পরিচয়। 'দেশে-বিদেশে'র লেখক মধ্যবয়স্ক—শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহছায়ায় বর্ধিত। উচ্চ শিক্ষার জন্যে জার্মানী ও মিশরে অনেকদিন ছিলেন। বহুভাষাবিদ্ ও বহুদেশ ভ্রমণকারী। 'দেশে-বিদেশে' তাঁর বড় সড় আকারের সাহিত্যকর্ম হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য চর্চা করেছেন। এই সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হলো সাংবাদিকতা। তিনি দিল্লী ও কলকাতায় অনেক সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্রমে পাঠকের আরো কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হলো এক কথা জেনে—তিনিই 'সত্যপীর' ও 'রায় পিথৌরা' নামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ 'ফিচার কলাম' বা 'নির্বাচিত স্তম্ভ' লিখেছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁর 'দেহলী প্রান্তে' নামে 'ফিচার কলাম' বা সংবাদস্তম্ভটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মন কেড়ে নিয়েছিল। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন দিল্লীতে দীর্ঘকাল ধরে ভারতের

স্বাধীনতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশের নেতাদের আলোচনা চলছে। ব্রিটেনে লেবার পার্টি মন্ত্রীসভা গড়েছে। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মিঃ অ্যাট্‌লি। ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে দেশের ভাগ্য ও ভাঙা-গড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি প্রত্যেক সপ্তাহেই দিল্লীর খবর কলকাতার সংবাদপত্রে পাঠাতেন। রাজনৈতিক সংবাদের সঙ্গে নানা অম্লমধুর টীকাটিপ্পনী সঙ্গে জুড়ে দিতেন। লেখার যাদুতে সংবাদপত্র পাঠকের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। Indian Council for Cultural Relations-এ যোগ দিয়েছিলেন। তারপর রেডিওর চাকুরীতে যোগ দেন। তিনি 'দেশে-বিদেশে'র পরে সারাজীবন ধরে নানা ফিচার কলম লিখলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিকে। যদিও মৌলিক রচনাও সৈয়দ মুজতবা আলীর কম নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে—মনোযোগ দিয়ে তাঁর সাহিত্য-কর্ম বিচার করলে—দেখতে পাওয়া যাবে—তার রচনার ঢংয়ের অনেকটাই সংবাদপত্র-ধর্মী এবং প্রধানত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্যেই যেন রচিত হয়েছে।

পববর্তী জীবনেও জীবিকার জন্যে তিনি অধ্যাপনাকে ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন 'রেডিও'র চাকুরী এবং সংবাদপত্রে ফিচার-ধর্মী কলম লেখা। এই ফিচার-ধর্মী স্তম্ভ লেখা—তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লিখেছেন। তাঁর এই ধরনের লেখাব প্রতি পাঠকদের আগ্রহ ও কৌতূহলের কখনো নিবৃত্তি আসেনি—একথা আগেই বলেছি।

এই ধরনের লেখাব পাশাপাশি সৈযদ মুজতবা আলীর মৌলিক রচনাও কম নয। তিনি অনেক সুখপাঠ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। গল্প ও উপন্যাসে তাঁর হাত ছিল খুবই বাস্তবধর্মী ও সুমিষ্ট। স্কুলের পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে লেখা তাঁর গল্প কে ভুলবেন? নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের জাহাজের সেলর্ বা খালাসিদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি কৌতুকরসের সঙ্গে বেদনার অশ্রুতে মেশানো। এমন গল্প বাংলা সাহিত্যে আর কটা আছে? গল্পগুলির পড়ার পরে চোখের জল রাখা যায় না। আরো অনেক বিশিষ্ট রচনা তাঁর আছে। অনুবাদ-কর্মও তাঁর আছে।

১৯৪৫ খ্রীঃ থেকে দেখা যায় সৈয়দ মুজতবা আলী দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সত্যপীর ও টেকচাঁদ ছদ্মনামে কখনো সাধু ভাষায়, কখনো চলতি

ভাষায় প্রতিবেদন লিখে পাঠাচ্ছেন। সংবাদপত্রের জন্যে সাধু ভাষায় লেখা প্রতিবেদনগুলিও মূল্যবান। বেশ জোরালো ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখা ঃ অনেক প্রতিবেদন প্রবন্ধ আকারে লেখা। মনে হয় সে সময় তিনি রায় পিথৌরা নামেও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ প্রতিবেদন লিখতেন। উৎসাহী গবেষকরা পুরনো হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর পাতা খুঁজে দেখতে পারেন।

'সত্যপীর' ছদ্মনামে নিয়মিত 'আনন্দবাজাব পত্রিকা'য ফিচার লিখতে থাকেন ১৯৪৫ খ্রীঃ জুলাই-আগস্ট মাস থেকে। কিছু আগে থেকে লেখাও বিচিত্র নয়। কিছু লেখার শেষে তাবিখ পাওয়া যায়। কিছু লেখায় তারিখ নেই। সবচেয়ে আগের তারিখ বোধহয় ২৭ জুলাই ১৯৪৫। তিনি 'এষাস্য পরমা গতি ?' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। এ ধরনের শিবোনাম দিয়ে আরো দুটি লেখা পাওয়া যায়। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাআচার্যের প্রয়াণে ২ সেপ্টেম্বব ১৯৪৫ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' লিখেছিলেন—'মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগী'। আরো একটি লেখা হচ্ছে 'ঘরে-বাইরে'। 'আনন্দমেলায' বের হয়েছিল। ওই পত্রিকাব ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে লেখাটি বের হয়। তাছাড়া ওই পত্রিকাতেই 'হ য ব র ল' নাম দিয়ে বিভিন্ন সপ্তাহে বিভিন্ন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। 'হ য ব র ল'-এর প্রথম লেখাটি হচ্ছে ২৮ আগস্ট ১৯৪৫, দ্বিতীয়টি ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, তৃতীয়টির তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বব ১৯৪৫, চতুর্থটির তাবিখ ২২ সেপ্টেম্বব ১৯৪৫, পঞ্চমটির তারিখ ৬ অক্টোবর ১৯৪৫ এবং যষ্ঠ ও সপ্তম প্রতিবেদন দু'টির তাবিখ ১ ডিসেম্বব ১৯৪৫ ও ১২ জানুয়ারী ১৯৪৬। আবো কিছু তারিখ-বিহীন লেখা আছে। এগুলি রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'বিচিত্রা' শিরোনামে বেবিয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী'র নবম খণ্ডেও কিছু কিছু গ্রন্থ-আকাবে অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। 'রচনাবলী'র সম্পাদকেরাও সে লেখাও বহু আয়াস করে পেয়েছিলেন। রচনাগুলি 'সত্যপীরের কলমে' নামে রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর কলমের শক্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তীব্র। তিনি লিখতেও পারতেন দ্রুত। লেখার উপস্থাপনায় সবসময়ই কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত। ছোট ছোট ফিচার-ধর্মী সংবাদপত্র-ঘেঁষা রম্য রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি 'সত্যপীর', 'টেকচাঁদ' ও 'রায় পিথৌরা' প্রভৃতি*

নামে লিখেছেন তো বটেই—'দেশ', 'মাসিক বসুমতী'তেও অনেক লেখা লিখেছিলেন। তিনি 'পঞ্চতন্ত্র', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি সুন্দর নামে তাঁর ফিচার-ধর্মী কলম নিয়মিত লিখেছেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ দুঃখ করে লিখেছিলেন ঃ 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। নাট্যকার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন—অবসর গ্রহণ করলে, নাট্যমঞ্চের পাদপীঠ থেকে অপসৃত হলে কেউ মনে রাখে না। সাংবাদিক তিলে তিলে আত্মত্যাগের দ্বারা সংবাদপত্রের ডালি সাজিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা চিরকাল নেপথ্যে থেকে যান। সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদকের কলমে স্বনামে লেখা খুব কমই বের হয়। সাংবাদিকরা হরিয়ে যান।

আমাদের সৌভাগ্য যে সৈয়দ মুজতবা আলীর বেলায় সেটা ঘটেনি। তিনি কিছু সময় বাদ দিয়ে স্বনামেই লিখতেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য-খ্যাতি সংবাদপত্রে বেনামে লিখে বিনষ্ট হয়নি। তবুও মনে বোধহয় একটু সূক্ষ্ম ক্ষোভ থেকে গিয়েছিল। তিনি স্থির হয়ে প্রশান্ত চিত্তে বোধহয় লিখতে পারেন না—এর জন্যে মনে ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল। তিনি তাঁর বন্ধু পরিমল গোস্বামীকে ২৫ মার্চ ১৯৬০ তারিখে লিখেছিলেন ঃ

'.....Pot-boiler না লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক বই লেখার বাসনা ছিল। বছর তিনেক লাগত। ততদিন খাব কি? তাই অবসর সময়ে 'পূরবী'র একটি টীকা লিখছি। ('পত্র স্মৃতি', পরিমল গোস্বামী, পৃ ৩৪৫)।

মনে মনে একটা বেদনা ছিল। তবে বহু ভাষাবিদ্ ও বহুদেশ ভ্রমণকারী এবং জ্ঞানের পরিধি তাঁর এত ব্যাপক ছিল যে, নিরবচ্ছিন্ন কথাসাহিত্য সৃষ্টির কাজ সব সময়ে সম্ভব হয়নি। তবুও তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যা দিয়ে গিয়েছেন—বাঙালী পাঠক-পাঠিকা চিরকাল তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন।

* সৈয়দ মুজতবা আলী আরো ছদ্মনামে লিখেছেন। তার মধ্যে 'ওমর খৈয়াম', 'প্রিয়দর্শী' ও 'দারা শিকো' ছদ্মনাম উল্লেখযোগ্য।

কত না অশ্রু জল

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

ষাট এবং সত্তরের দশকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর কিছু রচনা নিয়ে ১৯৭৮ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী 'কত না অশ্রুজল' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। যদিও বইটির নামকরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্য রক্ষা করে এমন রচনার সংখ্যা মোট ১৭টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সৈনিকরূপে একে অন্যকে নিধন করতে হয়েছিল তাদের শেষ চিঠি, ডাইরির শেষ পাতা সম্বলিত কিছু রচনা নিয়েই কত না অশ্রু জল।' যদিও লেখক অপর একটি সংকলন গ্রন্থ থেকে চিঠি ও ডায়েরির পাতাগুলি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু উল্লেখ করেননি গ্রন্থটির নাম কী, লেখকই বা কে এবং কোন্ ভাষায় তা প্রকাশিত। মুজতবা আলী লিখেছেন 'একখানা অপূর্ব সংকলনগ্রন্থ অধীনের হাতে এসে পৌঁচেছে। পুনরায় বারংবার বলছি অপূর্ব, অপূর্ব! এ বইখানিতে আছে, মানুষের আপন মনের আপন হৃদয়ের গভীরতম আত্মপ্রকাশ। কারণ মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ অতি অল্প অবস্থাতেই মিথ্যা কয় বা সত্য গোপন করে। এবং এটি একটি দেশের একজন মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী নয়; বহু দেশের বহু জনের। ফ্রান্স, জর্মনি, ভারতবর্ষ, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফিনল্যান্ড, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি—বস্তুত হেন দেশ নেই যার বহু লোকের বহু কণ্ঠস্বর এ গ্রন্থে নেই।' মুজতবা আলী বইটির মুখবন্ধে লিখছেন 'এ পুস্তকের সব লেখাই "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বেরোয়। সেই সময় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগণিত চিঠি আমার কাছে আসে। তাদের অনেকগুলি 'কত না অশ্রুজলে' ভরা ছিল। একাধিক মাতা, ভগ্নী আমাকে পুত্রের, ভ্রাতার শেষ পত্র পাঠান। বস্তুত যখন দেশ পত্রিকায় অধমের 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হয় তখনও এত পত্র আমি পাইনি।' তবে আজকের দিনে পাঠকরা 'কত না অশ্রুজল' পড়ে কতটা আবেগরুদ্ধ হবেন বলা মুস্কিল, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এজাতীয় রচনা এতদিনে

বাঙালী পাঠক অনেক পেয়েছেন, বিশেষ করে 'আন্ ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি' আজ আর তেমন অপঠিত নয় এবং তা বাঙলা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। বরং জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধু দাউদ হবস্টারের অগ্রজ কার্ল হবস্টারের সম্পর্কিত রচনাটিতে লেখকের জাত চেনা যায়। এ জাতীয় রচনা বাঙালী পাঠককে একমাত্র মুজতবা আলীই দিতে পেরেছেন। হিটলারের নাৎসী বাহিনী কীভাবে ডাইনি খোঁজার মত জার্মান কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছিল, তা কার্ল হবস্টারের কাহিনী থেকে জানা যায়। কার্ল ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির এক যুক্তিতর্কসিদ্ধ সদস্য ও উত্তম বক্তা। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পর তাঁকে জেলে আটক করা হয়। ক্রিসমাসের কোনও এক সন্ধ্যায় তিনি জেলখানায় আত্মহত্যা করেন। লেখককে লেখা কার্লের ভাই পাউলারের চিঠি অনুযায়ী 'কোনও এক সদাশয়' জেল গার্ড দাদাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেয়—গোপনে। দেশলাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে সিগারেটের খোলে সে লিখে দিয়েছে 'মাকে সান্ত্বনা দিয়ো।' গার্ডটিই আমাকে সেটা পৌঁছিয়ে দেয়। 'কত না অশ্রুজল' পর্বে কার্ল হবস্টারের স্মৃতিচারণটিই এক্ষেত্রে অনন্য, কারণ নাৎসী উন্মাদনায় আক্রান্ত জার্মানির কার্ল তথা পাউলার পরিবারের প্রসঙ্গটি পাঠকের কাছে আসে কোনরকম হাতবদল না হয়ে। এই হলো সৈয়দ মুজতবা আলীর ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্ট। সেক্ষেত্রে রচনাটি লেখকের অগ্রাধিকার পেলোনা কেন বোঝা দায়। মুজতবা আলী নিজেই লিখেছেন ঃ 'পাঠক হয়ত শুধোবেন 'কত না অশ্রুজলে' আমি কার্লের শেষ চিঠিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গোড়ার দিকেই ছাপলাম না কেন? কিন্তু যেখানে আমি অত্যুৎকৃষ্ট শেষ বিদায়ের চিঠিগুলো অনুবাদ করছি, সেখানে মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে তিনটি মাত্র শব্দ, সেগুলোর কী অধিকার ওদের সঙ্গে সমাসনে বসার।' এক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না, কারণ 'তিনটি মাত্র শব্দ'র যে প্রেক্ষাপটটি লেখক নিজ মুন্সিয়ানায় হাজির করেছেন তার আলাদা সাহিত্যমূল্য অবশ্যই আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় আরো কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। তার মধ্যে ত্রিমূর্তি প্রবন্ধটি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে 'ত্রিমূর্তি' অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন প্রধান সেনানায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইজেন হাওয়ার, গ্রেট ব্রিটেনের মন্টগোমারি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জুকফ্ প্রসঙ্গে লেখক আলোচনা করেছেন। মূলত মার্শাল জুকফের স্মৃতিচারণ বিষয়ক গ্রন্থটির প্রসঙ্গেই এ

আলোচনা। সেই সময়ে স্তালিন বিরোধী প্রচার তুঙ্গে হওয়া সত্ত্বেও মুজতবা আলীকে লিখতে দেখা যায় 'এই তিনজনই হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন, ইংরেজ (ফরাসীও) যদ্যপি স্বীকার করতে রাজী হন না, আমার নিজের বিশ্বাস হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকফের। সুতরাং গত বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন ইতিহাস জুকফের বিবরণীহীন ইতিহাস যেন হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক।' জুকফ যে তাঁর বইতে স্তালিন-বিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় সায় দিতে পারেননি এবং স্তালিনকে তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি এতে লেখক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া মুজতবা আলীর এক বিশেষ রচনা বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই বৈঠকী মেজাজের গদ্যরীতি সম্পর্কে বাঙালী পাঠক অবহিত। জগৎ সংসারের কত না বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল," বিশ্বেব কত না ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও সেই ভাষার সঙ্গে জুড়ে থাকা পরিবেশ ও মানুষকে বাঙালীর চৌকাঠে পৌঁছে দিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তবে লেখক সজাগ ছিলেন বর্তমান 'কাজের কথার' যুগে চঞ্চল পাঠক চান টু দি পয়েন্ট উত্তর। তাই 'ন্যাকামো' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন 'পাঠক হয়ত ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম।' কিন্তু আলী সাহেবের অনবদ্য সাফাইটি লক্ষ্য করুন। তিনি লিখেছেন 'বুঝিয়ে বলি। এ লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু'লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামল ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হলো আপনাদেব সঙ্গে দু' দণ্ড বসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই। ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই সেই রুদ্ররসে।' এক্ষেত্রে মুজতবা আলী প্রকৃতির দোহাই দিয়েছেন, আবার অন্য রচনায় আশ্রয় করেছেন অন্য কিছুকে, কিন্তু তা নিতান্ত ধৈর্যহীন পাঠককেও লেখার প্রতি মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থে 'বনে ভূত না মনে ভূত', 'দর্পণ', 'চুম্বন', 'সিংহ মূষিক কাহিনী', 'রাবাৎ-ইনসেন্ট', 'আল-মসজিদ্-উল আফ্‌সা', 'বিশ্বভারতী প্রাগ' প্রভৃতি রচনাগুলি লেখকের বিদগ্ধ মন ও সরস রচনাশৈলীর সাক্ষ্য বহন করে।

এছাড়া 'রহস্য লহরী' প্রবন্ধটি সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের স্মরণে ও 'মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই' শীর্ষক রচনাটি সেই অধ্যাপকের স্মৃতিচারণ।

তবু মনে হয় পাঠকের ধৈর্যের কাছে (অথবা পত্রিকা সম্পাদকের তাগাদার কাছে) সৈয়দ মুজতবা আলীকেও আপস করতে হয়েছিল। ফলে কিছু কিছু রচনা যা তাঁর কলমে অনায়াসে গভীরতর মননের মাত্রা পেতে পারত, তা অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। এইরকমই 'আধুনিকের আত্মহত্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসোর প্রতি যেন কিছুটা অবিচার করে বসেছেন। ফর্ম ভালোভাবে না জানলে যে ফর্ম ভালোভাবে ভাঙা যায় না, আর্টের এই মৌলিক কথাটিকে লেখক ঐ প্রবন্ধের গোড়ায় স্বীকার করেছেন। আধুনিক ফরাসী কবিদের প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত কবিতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন 'সেগুলো শুনে, পরে পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। অনবদ্য এক একটি কবিতা। কতখানি পরিশ্রম, কতখানি সাধনার প্রয়োজন এরকম অত্যুত্তম কবিতা রচনা করতে। অর্থাৎ এঁরা 'ব্লাফ মাস্টার' নন। প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার টেকনিক্, স্কিল, কৌশল সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর এঁরা যে কোনও কারণেই হোক খুব সম্ভব নিজের সৃষ্টিতে ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি না পেয়ে--ধরেছেন অন্য টেকনিক বা বলা যেতে পারে, চেষ্টা করেছেন নতুন এক টেকনিক আবিষ্কার করার' সেজানের ছবি দেখে অজ্ঞজন মনে করে, এরকম 'এলোপাথাড়ি তুলির বাড়ি ধাপুস-ধপুস মারা' তো যে কোনও পাঁচ বছরের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেজান যখন প্রাচীন একাডেমিক টেকনিকে আঁকতেন তখনকার ছবি দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়।' অথচ লেখক পিকাসো সম্পর্কে দ্রুত মন্তব্য করেছেন, 'এই লোকটি আর্ট সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল, একাডেমিক ধারণা পোষণ করেন, আর অন্যদিকে তিনি এঁকে যাচ্ছেন----তাঁর ভাষাতেই বলি---'বিজার', 'গ্রোটেস্ক' যতসব মাল।' পিকাসোর একটি সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শিল্পী পিকাসোকে বড় দ্রুত ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। অথচ এই পিকাসো যেভাবে অঙ্কনে, ভাস্কর্যে একের পর এক ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন তা ফর্মকে আত্মস্থ না করলে তো সম্ভব হত না। গুয়ের্নিকার স্রষ্টা নিজেকে যতই ছোট করে দেখান, বাস্তবে তিনি ততটাই বড়।

জীবনের মর্মমূল থেকে

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়

না, তাঁর দেখে যাওয়া হয়নি বঙ্গললনার, বিশ্বসুন্দরী হওয়া, বাঙালি মেয়ের ইংরেজি গল্পের বই লিখে পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া। দেখে যেতে হয়নি তাঁর রচনায় অমর হয়ে থাকা কাবুল কান্দাহারে তালিবানি ঔদ্ধত্য। দেখতে হয়নি শান্তিনিকেতনে ভুবনডাঙার রাঙা বাউল মৃত্তিকায় ঝটতি পাকেটসঙ্গীত, কলকাত্তাইয়াদের স্ফূর্তিতে উইক এন্ড কাটানোর জন্য হলিডে রিসর্ট বানানো। সহ্য করতে হয়নি বঙ্গ সংস্কৃতির স্বঘোষিত অভিভাবক সেজে কতিপয় পত্রিকাকুলের দাদাগিরি, জীবনে বইয়ের পাতা ওল্টায় না, এমন লোকেদের নিয়ে রাজপথে 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' নামক ভাঁড়ামি, খাপ্পা টিভি সিরিয়াল ও জীবনমুখী গানে মজে থাকা বঙ্গ সংস্কৃতির গঙ্গাযাত্রা। ভালই হয়েছে তিনি চলে গেছেন অনেক আগেই। থাকলে এই 'iron time of doubts dispute and fears'-এর মধ্যে জ্ঞানী, পণ্ডিত, উদার অথচ আদ্যন্ত রসিক এই বাঙালি কষ্ট পেতেন। দেশে বিদেশে তাঁর ঘোরা, বিশ্ববীক্ষা, মানবপ্রেম, রহস্যকৌতুকী—সবই অনিবার্যভাবে চাপা পড়ে যেত হালের 'বিশ্বায়ন' নামক ঢক্কানিনাদের আড়ালে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিপুল জনপ্রিয়, সত্তর ও আশির দশকেও বহুলপঠিত তাঁর রচনা একালের নবীন পাঠকপাঠিকাদের ক'জনের হাতে ঘোরে বলতে পারব না। শুধু মনে হয়, সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা না-পড়া, বাঙালী হিসাবে জাতীয় (অবশ্যই বাঙালী জাতি, এপার-ওপার মিলিয়ে) অপরাধ। বিষাদগ্রস্ত হয়ে মাঝেমাঝে মনে হয়, হাটের বাদ্যিতে কি বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বলে কিছুই থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে?

বিষাদের কথা থাক। যে বাঙালী আজও বাঙালিত্বের আত্মানুসন্ধানেই সাগ্রহে পড়েন তাঁর রচনা, সে লেখায় আপন আনন্দ-বিষাদ হর্ষের সাজুয্য খোঁজেন, সান্ত্বনা পান, হয়তো বেদনাও—মুজতবার দুটি অনতিদীর্ঘ রচনা নিয়ে দাঁড়ানো যাক তাঁদের দরবারে।

'টুনি মেম' ও 'বড়বাবু'। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যাপক সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধু এ দুটি কেন—সে প্রশ্ন উঠবেই। আসলে মুখ্য যে রচনাগুলির জন্য মুজতবার জনপ্রিয়তা—এ দুটির কোনওটিই তার মধ্যে পড়ে না। তা বলে গৌণ সাহিত্যকর্ম হিসাবে এ দুটিকে ধরলেও অন্যায় হবে। তবু বহুল পঠিত রচনা সম্ভারের বাইরেও মুজতবার লেখায় অন্য ধরনের কী রস আছে তার সন্ধানেই এ প্রচেষ্টা। না হলে শুধু 'টুনি মেম' ও 'বড়বাবু'-কে বেছে নিয়ে সেই আলোকে যদি মুজতবার সমগ্র দৃষ্টিকর্মের বিচার করতে যাই, তবে মানহানির মামলায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। এ যেন একখানা ছবি দিয়ে পিকাসো, আধখানা ভাস্কর্য দিয়ে রদ্যাঁ বা এক কলি গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাপতে বসা। অমন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে বরং এই দুই ক্ষুদ্র রচনায় মুজতবাকে নিজের অনুভূতিতে কেমন করে পাই, সেই চেষ্টাই করা যাক।

মুজতবা প্রয়াত হয়েছেন আড়াই দশকেরও কিছু বেশি হয়ে গেল। (জন্ম করিমগঞ্জে ১৯০৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ঢাকায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালে ১৯৭৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।) জীবনের প্রায় পঞ্চাশটি বছর তিনি নিবিষ্ট ছিলেন লেখালেখি নিয়ে। ছাত্রজীবনে হাতে লেখা পত্রিকা 'কুইনিন' দিয়ে যার শুরু, তার শেষ 'তুলনাহীনা' উপন্যাসে (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। অধ্যয়ন ও বিভিন্ন পেশা এবং কাজে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশে এই 'মুসাফির' ঘুরে বেড়িয়েছেন। বার্লিন, রাইনল্যান্ডের বন, কায়রোর আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, পি এইচ ডি লাভ করেন বন থেকে। প্রথম জীবনে কৈশোরে ছাত্র হিসাবে এবং পরে ১৯৫৬ সালে আকাশবাণীর চাকরি ছেড়ে অধ্যাপক হিসাবে শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেছেন দীর্ঘদিন। চাকরি থেকে অবসর নিয়েও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বোলপুরে। ভাষাশিক্ষার অভূতপূর্ব আকর্ষণে দেশবিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে বসে শিখেছেন সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাতি, আরবি, ফার্সি, জার্মান, ফরাসি, রুশ, ইতালিয়ান, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা। তাঁর বিচিত্র জ্ঞান ও জীবনচর্চার সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলার কারণ, প্রকৃতপক্ষেই ভবঘুরে এই মানুষটির মানস-ভাণ্ডার কী অপরিমিত দানে সমৃদ্ধ ছিল তা বোঝাতে। 'টুনি মেম' ও 'বড়বাবু'তেও আছে তার উজ্জ্বল আভাস। আমাদের সৌভাগ্য—সিলেট, ঢাকা,

শান্তিনিকেতন, রংপুর, প্যারিস, কায়রো, কাবুল, ইস্তাম্বুল, রোম এবং তাদের বিচিত্র মানুষ পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ভবঘুরে, মুসাফির, দেশে-বিদেশে, শবনম—প্রভৃতি অজস্র রচনায় বিচিত্র বর্ণে উপস্থিত। আমাদের দুর্ভাগা—বিশ্বঘোরা, প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক এই মানুষটি অনেক গুণসম্পন্ন হয়েও চিরকেলে টিপিক্যাল বাঙালীর মহৎ দোষ আলস্য কাটাতে পারেননি। ফলে তাঁর পাকা আর্টিস্টের হাতে আঁকা অজস্র স্কেচ আমরা উপহার পেলেও ঢিলেঢালা স্বভাবের জন্য দীর্ঘ কাহিনী খুবই কম পেয়েছি। এতে সব থেকে ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যেরই। 'টুনি মেম' ও 'বড়বাবু' মুজতবাব এই দোষগুণ নিয়েই।

কিন্তু ক্ষোভপ্রকাশ করে লাভ নেই। বেঁচে থাকতে স্বয়ং মুজতবাকে তাঁর অনেক ভক্ত ও অনুবাগীই এই লৈখিক আলস্যের অনুযোগ করেছেন। আর পা থেকে মাথাব চুল অবধি (শেষ জীবনে অবশ্য বিরলকেশ) রসিক মুজতবা হো হো করে হেসে তা উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রয়াত সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষ কুমাব ঘোষ ও আবও অনেকেব কাছে শুনেছি শান্তিনিকেতনে থাকাকালে তাঁব আস্তানায় প্রায়শই জবরদস্ত একটি 'আড্ডা' বসত। (পাঠক অবশ্যই পড়ে নেবেন তাঁব 'আড্ডা' ও 'খোশগল্প') মূল কথক বলাই বাহুল্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মধু ভাণ্ডাবী আলী সাহেব। সেই আড্ডাব বসে নিষিক্ত হয়েছেন এমন অনেকেই আক্ষেপ কবেন সেখানে কথকেব ভূমিকায় বেনাবনে মুজতবা যে মুক্তো ছড়িয়েছেন তার এক দশমাংশও যদি লিপিবদ্ধ থাকত, তবে বাংলা সাহিত্যে তা হয়ে থাকত এক স্থায়ী সম্পদ। কিন্তু মুজতবা মুজতবা হয়েছেন, তাঁব এই আগোছালো ঢিলেঢালা বাঙালীত্ব নিয়েই। এখানেই তাঁব জোব, এখানেই তাঁব দুর্বলতা। গোছানো, পবিপাটি, প্রখর আত্মসচেতন হলে মুজতবাকে অন্য ধরনেব কৃতবিদ্য এক লেখক হিসাবে হয়তো পেতাম, কিন্তু হাবাতাম রসিক, দিলদরিযা, গভীব সংবেদনশীল মনোভাবেব আদ্যন্ত বাঙালী, কাছেব মানুষ মুজতবাকে। মুজতবার তন্নিষ্ঠ পাঠক জানেন লেখক প্রখর জ্ঞানী হয়েও কখনওই মাস্টারির ভূমিকা নেননি, তিনি পাঠকের বন্ধু, চিরসখা।

'টুনি মেম', (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৭০) ও 'বড়বাবু' (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৭২)—দুটি রচনাই ইংরেজি মতে ষাটেব দশকে লেখা। মুজতবার অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, পঞ্চাশ ও ষাটেব দশকে জনপ্রিযতম লেখক

ছিলেন তিনি। মৃত্যুর ৩৬ বছর পরেও মুজতবার গ্রন্থাবলী 'বেস্ট সেলার'-এর তালিকাভুক্ত না হলেও রুচিশীল মরমী বাঙালী পাঠকের কাছে এখনও আকর্ষণীয়। যদিও বেদনার সঙ্গে বলতেই হয়, টিন এজার বা নবীন প্রজন্মের কাছে মুজতবা আর তেমন জনপ্রিয় নয়। বঙ্গ সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদেই যখন ঘুণ ধরেছে তখন এমন হওয়াটাই বোধহয় ভবিতব্য। বলা যায় মুজতবা যখন খ্যাতির মধ্যগগনে সেই পর্যায়েই লেখা নাতিদীর্ঘ গল্প 'টুনি মেম' এবং ষোল পাতার ক্ষুদ্র রম্যরচনা (লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে প্রবন্ধ) 'বড়বাবু'। দুটি ক্ষুদ্র রচনারই বৈশিষ্ট্য, মুজতবা তাঁর শৈলীর ষোলো আনা দোষগুণ নিয়ে এখানে উপস্থিত। মুজতবা সর্বাধিক জনপ্রিয় তাঁর অনতিদীর্ঘ সরস রম্যরচনাগুলির জন্যই। দীর্ঘ রচনা, উপন্যাস খুব বেশী তিনি লেখেননি, হয়তো এ ধরনের রচনায় নিজে তেমন স্বস্তি পেতেন না বলেই। ছোটগল্পও তাঁর খুব বেশি নেই। 'টুনি মেম' গল্পের নামাঙ্কিত যে বই তাতে 'টুনি মেম' ও 'এর পুরুষ' নামে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ একটি গল্প ছাড়া বাকিগুলি প্রায় সবই রম্যরচনা ও রাজনীতি-সাহিত্য ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ। এছাড়াও আছে চেকভের একটি গল্প ও একটি নাটকের অনুবাদ। বস্তুত মুজতবার সব রচনাই এক অর্থে রম্যরচনা। তাঁর লঘুভার রম্যরচনায় হাসি কান্নার দ্বন্দ্বমধুর আবরণে প্রায়শই লুকিয়ে থাকে গল্পের আভাস। আবার গল্পের মধ্যেও থাকে যেন ফিচারের ছায়া। নানা জ্ঞানের চকিত উজ্জ্বল স্পর্শ (কিন্তু কখনোই মাস্টারিসুলভ জ্ঞানের বাণী বিতরণের কায়দায় নয়)।

'টুনি মেম' শুরু হয় যেন এক খুনের রহস্যকাহিনী হিসাবে, কিন্তু শেষ হয় এক সাঁওতাল কুলি রমণীর অনবদ্য ট্র্যাজিক কাহিনীর দীর্ঘশ্বাসে। বিহারী কুলি রামভজনের স্ত্রী টুনি অসময়ে এক চা-কর সাহেবের বাংলোয় কাজ করতে এসে ইওরোপীয় সাহেব ও' হারার রক্ষিতা বনে যায়। বিহারী কুলিরা তার নাম দেয় 'টুনি মেম'। কিন্তু রক্ষিতা বললে ও' হারা ও টুনি মেম দুইজনের প্রতিই অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনিকে রেখেছিল রাণীর সম্মান দিয়ে। আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালবেসেছিল লায়লী যেমন মজনুকে ভালবেসে ছিলেন। সাহেব টুনিকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে ইংরেজি শেখায়, ভাল ভাল গান গায় ও কবিতা শোনায়। কুলি-কামিন নিতান্ত সাধারণ মেয়ে টুনির উত্তরণ ঘটে

দেহ ছাড়িয়ে এক অমল প্রেমের স্তরে। দেহ-মনে সে রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিত্বশালিনী এক পূর্ণাঙ্গ নারীতে। আইরিশ ও'হারা সাহেব জানায়, কলকাতার গির্জায় গিয়ে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে তাকে। কিন্তু চা বাগানের অন্য ইওরোপীয়ানরা এজন্য সাহেবকে বিদ্রূপ ও নিগ্রহ করলে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ও'হারা প্রতিশোধ নিতে ডাকে ছ'জনকে বিষ মাখানো চকোলেট পাঠায়। কারও মৃত্যু না ঘটলেও খুনের চক্রান্তে সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে টুনির। তার গর্ভের তখন ও'হারার সন্তান। বাংলো থেকে বিতাড়িত হয়ে টুনি সাহেবের সন্তানকে বাঁচাতে এক বাবুর্চির কাছে আশ্রয় নেয়। সাহেবের সন্তানের জননী হয়েও পরে আবাব এক সন্তান হয় তার। ইতিমধ্যে বাবুর্চি তাকে ছেড়ে পালায়। ততদিনে তৃতীয এক সন্তান তাঁব গর্ভে। টুনি মেমেব শেষ আশ্রয় জোটে কুলি লাইনের ঝোপড়িতে। এবং অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যে তৃতীয সন্তানের জন্ম দিয়ে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

মুজতবার পাকা হাতের ছোঁযায 'টুনি মেম' এক অসাধাবণ গল্প হযে উঠেছে। তবে গোড়াতেই জানিযে বাখা ভাল কাহিনীগত আকর্ষণে নিটোল গোল গল্প যাঁবা খোঁজেন এ কাহিনী তাঁদেব হতাশ কববে। তাঁব বন্ধু পূর্ব পাকিস্তানী এক পুলিশ অফিসাব খানেব জবানিতে অ শনাক্ত এক পচা গলা মৃতদেহেব খুলিতে গুলিব দাগ কোথা থেকে এল এবং মৃতদেহটি টুনিব ভূতপূর্ব স্বামী বামভজনেব কিনা এমন এক জিজ্ঞাসা দিযে গল্প শুরু। কিন্তু গল্প শেষে সে জিজ্ঞাসার কোন উত্তব নেই। কারণ খানেব জবানিতে লেখক নিজেই জানিযে দিয়েছেন '..ভাবিস নে তোকে একটা বগরগে খুনেব কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা।. স্বর্গ আমি দেখিনি। কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি।...'

অক্লান্ত পাঠক মুজতবা তলস্তয, চেকভ, পুশকিনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। রুশ লেখকদের ভাগ্যবিড়ম্বিতা নায়িকাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বহু রচনাতেই পরিস্ফুট। 'টুনি মেম'-এও হয়তো রযেছে তাব দূরাগত ছায়া। রবীন্দ্র-সাহিত্যেব বাইরে এমন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী চরিত্র (শরৎচন্দ্রের প্রেক্ষিতটাই কিঞ্চিৎ ভিন্ন) খুব বেশি নেই। অসম, সিলেটবাসের সূত্রে চা বাগানের জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিশ্চযই তাঁর ছিল, তাব সঙ্গে কল্পনাব মিশেলে 'টুনি

মেম'-এর কায়া গড়ে উঠেছে। সাধারণভাবে মুজতবা আলীর রচনায় তাঁর নিজ জীবনে দেখা প্রত্যক্ষ চরিত্ররাই ভিড় করে আসে, যেমন, 'টুনি মেম'-এ পুলিশ অফিসার খান। ইনি আসলে রফিকুর রহমান খাঁ, মৌলভিবাজার হাইস্কুলে মুজতবার সহপাঠী ছিলেন, পরে পুলিশ সুপার হন। পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ও বহুল অভিজ্ঞতাই মুজতবার চরিত্র সৃষ্টির মূলে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন থেকে সরাসরি তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। আবার এ কথাও ঠিক গয়নার মতো গল্প গড়তেও কিছু খাদ লাগে। কল্পনার যে খাদ মুজতবা মিশেল দিয়েছেন তার সম্ভাবনাও কিন্তু উৎসারিত তাঁর দেখা জীবনের মর্মমূল থেকেই।

বীরভূম শান্তিনিকেতন সিলেট—মুজতবার রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এমন কি 'টুনি মেম'-এও। বোলপুরগামী ট্রেনের কামরায় এ গল্পের শুরু। তাছাড়া, 'গাড়ি তখন খানা জংশনে লুপ লাইনে ঢুকবে' ./ 'আমার অভিমান হল সাঁওতালী আমার প্রতিবেশী মেয়ে. '/..'ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে এদের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনও মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা সৌন্দর্য আছে'।

আর রবীন্দ্রনাথ? মুজতবার বিশ্ববীক্ষার দীক্ষাই বলা যায় শান্তিনিকেতন থেকে। তাঁর মন-বোধি চেতনার পরতে পরতে রবীন্দ্রনাথ। 'টুনি মেম'-এ অন্তরে না হলেও কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর ছায়া আছে বলে আমার বিশ্বাস। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো 'টুনি মেম'-এরও গল্পের শুরু ট্রেনের কামরায়, দুই গল্পেই কথক বহিরাগত, দুই গল্পেই ব্যর্থ অভিশপ্ত প্রেম, দুই গল্পেই কথক গল্প অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিয়েছেন। এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' যেমন ভূতের গল্প নয়, তেমনই 'টুনি মেম'ও নয় খুনের গল্প। আর দুই গল্পেই দুই লেখক যে গোল গল্পপ্রিয় পাঠকের গালে থাপ্পড় কষিয়েছেন তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে অবশ্যই দুই গল্পের আস্বাদ ও আবেদন সর্বতোভাবে পৃথক।

অনেকেরই ধারণা, করুণরসের প্রতি মুজতবার প্রবল পক্ষপাত ছিল। টুনি মেম' করুণরসের গল্প সন্দেহ নেই কিন্তু নিছক কারুণ্যই তার বৈশিষ্ট্য নয়।কৃষ্ণাঙ্গী নিছক এক কামিন জীবনের এক পর্যায়ে অভাবিত ভালবাসার স্বাদ

পেয়ে ধন্য হয়েছিল; উত্তীর্ণ হয়েছিল প্রেমের ঊর্ধ্বলোকে। দুর্ভাগ্য তাকে দুর্দশা, দারিদ্র্যের অতল তলে ছুঁড়ে ফেললেও টলাতে পারেনি প্রেমের আসন থেকে। পুলিশ কর্তার নির্মম নির্লজ্জ জেরার মুখেও অটল থেকেছে মৃত্যুমুখী টুনি। 'স্বামী'-র অকল্যাণ হবে এমন একটি কথাও বেরোযনি তার মুখ থেকে। অসহায়ের মতো মৃত্যুতেও নিবাত নিষ্কম্প থেকেছে তার প্রেমের দীপশিখাটি। এমন প্রেমের গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বিত, পরাজিত, খেয়ালি আপনভোলাদের জন্য যে কোনও মহৎ সাহিত্যিকের অন্তরেই নিহিত থাকে বাড়তি কিছু সহানুভূতি। শেক্সপিয়র, গ্যেটে, ডিকেন্স, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, রবীন্দ্রনাথ, জ্যাক লণ্ডন, ও হেনরি— এঁদের সবার রচনাতেই এমন নিদর্শন মিলবে। মুজতবার 'নেড়া-র বাধা' ও 'কালো মেয়ে'-র কথা এ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বেই। হেরে গিয়েও 'টুনি মেম'-এর জয় এখানেই।

অতঃপর 'বড়বাবু'। 'বড়বাবু' দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্যই ভাগ্য বিড়ম্বিত পুরুষ নন। কিন্তু বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সত্ত্বেও শিশুর মতো সরল। কিন্তু এ সারল্য শুধু 'বড়বাবু'-কেই মানায়। শান্তিনিকেতনের পুরনো আবাসিকদের স্মৃতিচারণায় পেয়েছি আপনভোলা 'বড়বাবু' যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকতেন। পাখিরা এসে নির্ভয়ে বসত তাঁর গায়ে মাথায়। ঋষিতুল্য এ মানুষটিকে এই ক্ষুদ্ররচনায় মুজতবা একে বারে জীবন্ত করে এঁকেছেন। হাইনের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজতবা এক জায়গায় লিখেছেন 'হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া।' যে সারল্য 'moves at ease in a large world' এ কথা প্রযোজ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে মুজতবার 'বড়বাবু' এক আশ্চর্য রচনা। পুরাতন সামন্ততন্ত্র বা জমিদারির সূত্রেই ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বল উত্থান হয়েছিল এক সময়। সে এখন দূরের ইতিহাস। কিন্তু দোষেগুণে ভরা সে ব্যবস্থারই সন্তান ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথসহ একাধিক গুণী ব্যক্তিত্ব। পরম ক্ষ্যাপা পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথও। বহু সদস্যের পরিবারে একালের দৃষ্টিতে তিনি একেবারেই অকেজো নিষ্কর্মা এক লোক। যিনি এক অর্থে

কিছু না করেই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। বাঙালী যৌথ পরিবারে এমন নিষ্কর্মা পুরুষের সংখ্যা একদিন কম ছিল না। ধনী পরিবারে এঁরা থাকতেন বিলাসব্যসনে ব্যপ্ত। আর দরিদ্র পবিবাব হলে সকলেব অনুকম্পার পাত্র। বাঙালী জাতির সৌভাগ্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ এই গড় হিসাবের বাইরের মানুষ। তিনি সংসাবে থেকেও মুক্তপুরুষ এক জ্ঞানী। অসামান্য জ্ঞানী অথচ শিশুর মতো সরল এই পুরুষকে বাঙালী হয়তো এতদিনে ভুলেই যেত যদি না 'বড়বাবু' শীর্ষক রচনায পরম শ্রদ্ধাব আশ্চর্য তুলিতে মুজতবা তাঁকে এঁকে রাখতেন রূপদক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্যে।

মুজতবা লিখেছেন—'বর্তমান লেখকেব বিদ্যাবুদ্ধি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তবে আমাবই মতো অজ্ঞ একাধিকজনের জানবার বাসনা জাগতে পারে আমি কাদের পণ্ডিত মনে কবি। আমি দেখেছি দু'জন পণ্ডিতকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইয়োরোপবাসের পরও'। মুজতবাব নিজের সম্পর্কে বিনয়বাচনটি অবশ্যই অমান্য করতে হবে কিন্তু বাকিটুকু ধ্রুব সত্য। স্বযং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জীবনে তিনি দু'জন সত্যকাব পণ্ডিত দেখেছেন। একজন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অন্যজন তাঁর বড়দা। এবং রবীন্দ্রনাথ এও বলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁব বড়দাদা বলেই তিনি একথা বললেন এমন কথা ভাবাটা অনুচিত।

শ্রদ্ধেয পবিমল গোস্বামী বলেছেন—'আপন স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা এই বিশেষণটি দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশি খাটে। গভীব চিন্তাশীলতার সঙ্গে শিশুর সারল্যেব এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথে। ঠাকুর পরিবারে অনেকেই ছিলেন ছিটগ্রস্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ কেন যে ঘোষিত উন্মাদ হননি এও এক পরম বিস্ময়। তাঁব অগাধ পাণ্ডিত্যের অন্তঃস্থলে খেলা করে বেড়াত এক শিশু ভোলানাথ। তাঁব স্বভাব ছিল গুরুভাব যে কোনও লেখা সভায পড়ার আগে কাউকে পড়ে শোনাতেন। একদিন কাউকে না পেয়ে 'সার সত্য' নামক দর্শন বিষয়ক এক প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলেন বাড়ির বুড়ি ঝিকে। মাথায ঘোমটা টেনে অটল গাম্ভীর্যে তাকে তা শুনতে হয়েছিল।'

আশ্চর্য এই প্রতিভাকে মুজতবা তাঁর অনবদ্য লেখনীতে চিত্রিত করেছেন 'বড়বাবু'-তে। ছুঁয়ে ছুঁযে গিযেছেন এই প্রতিভাব বিভিন্ন দিক। বাংলায মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা রচনা, গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষায

অনায়াসচর্চা, গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা, দর্শন ও শব্দতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনা, বাংলায় শর্টহ্যান্ড প্রচলনের চেষ্টা, বক্সোমেট্রির খেলা এবং এর পাশাপাশি তাঁর শিশু সুলভ সাবল্য--বিচিত্রমুখী খেয়ালী প্রতিভার সর্বদিকই এই ক্ষুদ্র রচনায় উন্মোচিত। বস্তুত মাত্র ১৬ পাতার সংক্ষিপ্ত রচনায় মুজতবা যে তথ্য দিয়েছেন তার সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকশো পাতার এক মহা আকরগ্রন্থ রচনা করা যেত। আব এখানেই মুজতবা সম্পর্কে ক্ষোভ জাগে। কেন এ কাজ তিনি নিজে করে গেলেন না? পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বড় কাজ কেউ নিশ্চয়ই করবেন---মুজতবার 'বড়বাবু' হবে তার পথ নির্দেশিকা। পাঠক হিসাবে আমাদের আক্ষেপ অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, মুজতবা যদি তাঁব আলস্য ঝেড়ে একটি সিরিযাস কাজ কবতেন ভবিষ্যতেব বাঙালি শুধু এই একটি গ্রন্থের জন্য চিবঋণী হয়ে থাকত তাঁব কাছে।

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই

ঊর্মি দাস

ভ্রমণ কথা পড়তে যখন বসি, তখন আমাদের পাঠকদেব কিছু বছব-পুবোনো ধারণা থাকে। আমরা তৈবী থাকি চলাব পথেব বিববণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, ইতিহাস-ভূগোলেব পরিচয ইত্যাদি ইত্যাদিব জন্য। কিন্তু মুজতবা আলী 'মুসাফিব' বইটির শুরুতেই লণ্ডনে বাসস্থানেব সমস্যা নিবসন কবেন যখন এইভাবে—'আমি বললুম, 'বাবাজী, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। বসুই বামুন না হলেও তুমি তো ব্রাহ্মণসন্তান বটে। হাটে গিয়ে চাল-ডাল নিয়ে আসবে, আমি ততক্ষণে বটগাছতলায় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে বাখবো। শুনেছি লণ্ডনের উপব বিস্তর বোমা পডেছিল, ইঁট পেতে অসুবিধা হবে না'। এযাবপোর্ট থেকে বেবিয়ে বিস্তব খোঁজাখুঁজিব পবও যখন বটগাছ পাওযা গেল না, তখন বাধ্য হযে হোটেলে উঠতে হল'। এবং হোটেল ও বটগাছতলা প্রসঙ্গে চলে যান প্রাচ্য-প্রতীচ্যেব সভ্যতার পার্থক্যে আব সেখান থেকে তবতর কবে সাহিত্যে, শিল্পে, বাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচরণে 'সেকুবিটি'ব প্রশ্নে—আমবা বুঝতে পাবি এ বয়েব জাত আলাদা। আলাদা গডন, চলন। ভ্রমণেব সূত্রেই এ কাহিনী, কিন্তু তাতে না আছে পথেব হদিশ, না সন তাবিখেব বালাই। একজন 'ভবঘুবে' বা 'মুসাফিব' তাঁব চলার পথে কুডিয়ে নিয়েছেন যে অভিজ্ঞতা, তাঁব মনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে যে সমস্ত উতবোল তাকেই ভাগ কবে নিতে চেয়েছেন পাঠকেব সঙ্গে। তাঁর স্টাইল হাল্কা, মেজাজ আড্ডাব, কিন্তু তাব মধ্যেই বিদগ্ধ অথচ হাসামুখব মনটি সজাগ থাকে।

'ছন্নছাড়া, গৃহহারা, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, যাযাবর—কত হবেকরকম রঙবেবঙেব শব্দই না আছে বাঙলাতে ভ্যাগাবণ্ড বোঝাবাব জন্য'। কি দেখেন 'ভবঘুরে'? 'কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলুম, কত জানা জনের দুর্ব্যবহাব, হিটলারের মত বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে বড বড জিনিস প্রায ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এই সব ছোটো-

খ্যাটো কিছুতেই ভুলতে পারিনে'। আব 'কোনো দেশেব জ্ঞানীগুণীরা কি ভাবেন, কি চিন্তা করেন, সে কথা জানবার জন্য সে দেশে যাবাব কোনো প্রয়োজন আমি বড একটা দেখি নে। আপন দেশে বসে বসে সে দেশেব উত্তম অধম পুস্তক, মাসিক, খবরেব কাগজ পড়লেই সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধাবণা জন্মে। কিন্তু সে দেশেব টাঙ্গাওলা, বিড়িওলা, ড্রাইভাব, কারখানাব মজুব কি ভাবে, কি চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই'। এই সাধাবণ মানুষের সঙ্গে পথচলতি অভিজ্ঞতা গেঁথে গেঁথে তৈরী হয়েছে তার ভ্রমণচরিত। সন্দেহ হয়, দেশ বেড়ানোটা তার কাছে উপরি। আসল উদ্দেশ্য মানুষ দেখা। দেশ বিদেশেব নির্মোকটি ছাড়িয়ে অন্তরাটকে দেখা। ' but you are coming into the closest touch with the mind and hearts of a people. and then your come to the grand discovery, how alike they are, all over the world '

এই আবিষ্কারে তিনি রোমাঞ্চিত।

'ভবঘুরে' ও 'মুসাফিরে'র এক একটি ঘটনায় মুজতবা সেই এক মানুষকে দেখে বাব বাব শিহরিত হয়েছেন। সেই এক মা, এক নাবী, এক শিশু, এক অতিথি পরায়ণ গৃহস্বামী। দূব ভাবত থেকে মাকে ছেড়ে পড়াশোনা করতে এসেছে শুনে ড্রাসলডর্ফ শহরে সহপাঠী পাউলেব মা 'দহাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন পাশেব ঘবে'। আব দেশে ফিরে লেখক জেলে পাউলের দাদা কালের আত্মহত্যাব খবব তাঁব মাকে দিলে 'মা দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেমাজেব ঘবেব দিকে চলে গেল'। লড়াইয়েব সময় মাবিযানাব ঠাকুমা দিনরাত দরজার পাশের চেয়াবটায় বসে থাকতেন, যাতে ছেলে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিবলে সব থেকে আগে তাকে দেখতে পায়। কিংবা লণ্ডনের শবাবখানাব সেই বৃদ্ধা। যার জীবনেব সমস্ত আলো নিভে গেছে। কেবল একটি ছাড়া— 'আমি তাব আশা এখনো ছাড়তে পারি নি। হঠাৎ পেছন থেকে শুনতে পাবো 'মা''।

বাংলা ভ্রমণকাহিনীগুলিতে রোমান্টিক নায়কেব দেখা আমরা হামেশাই পেয়েছি। মুজতবা আলী ঠিক সে ধাবায় চলেন নি। তবু মাবিযানা, কোটি বা শার্লট এসেছে। কিশোবী মারিযানার নিঃসঙ্কোচ ভালোলাগায় ববীন্দ্রনাথের লাইন

মনে পড়েছে—'অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় নয়নপাতে'। এ মেয়ে একদিন বড় হবে। ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ কাকলীতে'। কোটে কথা বলে রবীন্দ্রভঙ্গিতে—'তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন (যেন, হুবহু, রবীন্দ্রনাথের ভাষা)। মানুষ হঠাৎ একদিন প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক, সে প্রেমিক হয়েই জন্মায়। যাদের কপালে প্রেমের দুর্ভোগ আছে তাদের জন্ম থেকেই আছে'। শার্লট বা লটে, তার সঙ্গে লেখকের দেখা হয় চল্লিশ বছর পরে। 'বিদেশে' বইতে এ প্রসঙ্গে তার দীর্ঘশ্বাস 'দেখা হইল না রে, শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে'। টুকরো টুকরো পরিচয়ে ভরে উঠেছে তার ভাঁড়ার। আঁদ্রে দাঁপো, একজন ভারতীয়র সঙ্গে পরিবারের আলাপ করানোর জন্য যিনি অধীর। গডেসবের্গ, চল্লিশ বছর ধরে মুজতবার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা যার। অটো, ধর্মের ডাকে যার প্রেম ত্যাগেও বাধা নেই। লীজেল, ফ্রিডি—অকৃত্রিম বান্ধবী। টেরমের দম্পতি এবং আরো অনেকে।

অধিকাংশ ভ্রমণকাহিনী—তাতে যত না থাকে ভ্রমণ, তার বেশি কাহিনী। মুজতবা চলেছেন অন্য রাস্তায়। পর্যটনের চলতি হাওয়ার পরোয়া না করে তিনি ঢুকে পড়েছেন ভিন্ দেশের অন্দরমহলে। পর্যটন দপ্তরের বিজ্ঞাপনকে আমল না দিয়ে বরং পৌঁছেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, দেখেছেন বিশ্বের নানা গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর সমীহ আদায় করা তফাৎ। ঢুঁ মেরেছেন শরাবখানায়, বিবিসি'র দপ্তরে, পথ-চলতি মানুষের আড্ডার কেন্দ্রে আর ভাগুার-ফোগোল বা উড়ুক্কু পাখী হিসাবে কত অজানা অতিথি পরায়ণ গৃহে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরি পথে পথে, ঘরে ঘরে, মানুষে মানুষে, মনন উসকে দেওয়া চিন্তাচর্যায়। বাংলা ভ্রমণকাহিনী যে বারে বারেই হেলে পড়ে ভ্রমণোপন্যাসের দিকে, সে হাতছানি এড়িয়ে এ এক ভিন্নপথের ঋজু যাত্রা।

যাত্রাপথে দেখছেন যতটা, ভাবছেন তারও বেশি। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর গতায়াত। ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ইংরেজ চরিত্র, জার্মানীর ভারত শ্রদ্ধা, নাৎসী ও নাৎসী বৈরীদের বর্বরতা, ঔপনিবেশিক মানসিকতা আর সর্বোপরি রন্ধনকলা। ভ্রমণকাহিনীর ছলে যেন আমাদের পড়িয়ে দেওয়া হল প্রবন্ধ অথবা প্রবন্ধের ছলে রম্যরচনা বা রম্যরচনার ছলে রঙ্গকথা।

বক্তব্যে যতই গাম্ভীর্য থাক, মেজাজে তার ছিঁটেফোঁটা রেশও নেই। মুজতবা তাঁর লেখনীর ঘোড়াকে ছুটিয়েছেন দুলকি চালে। যেন একটা জমাটি আড্ডার পরিবেশ। পাঠকেরাও সেই আড্ডায় সামিল। সেখানে লেখকই বক্তা। অজস্র তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের মশলাদার সংগ্রহ। গুরুগম্ভীর বিষয়ও পিংপং বলের মতো লাফিয়ে ওঠে তাঁর রঙীন রসের টুসকিতে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গুঁজে দেন চুটকির মশলা। রাইনল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক সমস্যা বলতে গিয়ে বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃতি — 'পাত্রী চাই! পাত্রী চাই! পাত্রী চাই! আপন নিজস্ব সর্বস্বত্বসংরক্ষিত বাড়ি ঘর আছে এমন পাত্রী। বাড়ির ফটোগ্রাফ পাঠান'।

ইংরেজের পশুপ্রীতির নমুনা হিসেবে 'মিশর পরাধীন থাকাকালীন এক ইংরেজ হাকিম যখন এক মিশরী খচ্চরওয়ালাকে জরিমানা করে জন্তুটাকে পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়ার জন্যে---তখন সে মনের দুঃখে বলেছিল, আমি ত জানতুম না হে খচ্চর, আদালতে তোর এক দরদী ভাই রয়েছে।'

যুদ্ধাতঙ্ক প্রসঙ্গে 'এ দেশের সরকার এটম বমের বিরুদ্ধে উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। বম্ ফাটার সম্ভাবনা দেখলেই আকাশবাণীর কোনো স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়ো। সেখানে কোনো রেডিও অ্যাকটিভিটি নেই।

কিংবা কিছুটা তির্যক, মেমসায়েবের বর্ণনায়---বার তিনেক না ঘোরালে বোঝা যায় না কোনটা সামনের দিক, কোনটা পেছন। যেন মডার্ন পেন্টিং। গ্যালারীতে দেখে আমাদের মত বেকুবদের মনে সন্দ জাগে উল্টো টাঙায় নিত?' এক লাফে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে হাসির নিচু জমিতে পড়েই পরক্ষণে প্রসঙ্গ পালটানো। গাম্ভীর্য আর কৌতুকের এই অনায়াস জায়গা বদলে মুজতবী রচনা আমরা তাড়িয়ে তারিয়ে উপভোগ করি।

কিন্তু এহো বাহ্য। তাঁর লেখায় আমাদের মুগ্ধ করে এক সম্পূর্ণত বাঙালী মনের উপস্থিতি, বাঙালী কথনের আন্দাজ। বাঙালী সংস্কৃতি তার বহুধারা ধর্ম নিয়ে, পরিবার নিয়ে, লোকাচার নিয়ে, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে, ভাষা নিয়ে মুজতবায় আমূল জড়িয়ে আছে। রাবীন্দ্রিক চেতনা তাঁর মজ্জায়, চণ্ডীদাস প্রাণে, বাংলাদেশের লোককবির গান তিনি কখনো ভোলেন না। দেশে, বিদেশে যেখানেই যান না কেন, তার সতেজ বাঙালীত্ব জাগরূক।

এই বাঙালীটিকে—চেনা মানুষটিকে—আপনার জনটিকে খুঁজতেই যেন তাঁর পর্যটন। বাইরে বেরিয়ে যেমন নতুন কিছুর স্বাদ পেয়েছেন, তেমনই খুঁজেছেন পুরোনো আস্বাদও। পম্পেই-র টিলার নীচে এক করবীগাছ দেখার যে শিহরণ, পাউল বা ক্যেটের মায়ের মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পাওয়ার যে বিহ্বলতা, মারিয়ানার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ফুটে ওঠার যে বিস্ময়—তার জন্যই তো ভ্রমণ। 'সার্থক ভ্রমণ কাহিনী-লেখক তাই নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপ প্রকাশ করেন'। ভ্রমণ তো উপলক্ষ।

কবি না হয়েও মুজতবা কবি কেন

অভিজিৎ চক্রবর্তী

"Why must I write a lot of rhy med rubbish, in order to be known as a poet? Does the little lark on the maple tree ever publish anything? It only sings"

—My Poetry and Modernism, Kate Fowler

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। আবার যথাবিধি সংজ্ঞানুসারে কবি না হয়েও কেউ কেউ কবি হয়ে ওঠেন। কবিদের সনাতনী পংক্তিভোজ ছেড়ে এঁদের অন্তরিত চারুতা আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা মেটায় সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মাধ্যমে। সৈয়দ মুজতবা আলী শেষোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে নৈকষ্য-কুলীন।

মুজতবা আদৌ কোনদিন কবি হতে চেয়েছিলেন কি না, বলা দুষ্কর। এমনকী, দু'পায়ের নীচে দু'দানা সর্ষে নিয়ে না জন্মালে, সম্ভবত হাতে কখনো কলমও তুলতেন না। তাঁর সচেতন ও অচেতন অস্তিত্বের একীভূত ষড়রিপু ছিল বাউণ্ডুলেপনা। প্রতিভা আর অর্থ অপচয় করেছেন দেদার। ফলত, যা লিখেছেন তা আপাতভাবে গণতোষ হলেও, শেষ বিচারে সেই গোষ্পদে তাঁর বারিধি-সদৃশ প্রতিভার সংকুলান হয়নি।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—মুজতবা তাঁর অননুকরণীয় গদ্যরীতি সৃষ্টির পূর্বেও কবিতা লিখেছেন, আবার বাংলা গদ্যের আসর গুলজার করতে করতেও কবিতাকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেননি। এখানে কবিতা বলতে অবশ্য পত্রিকা বা সংবাদপত্রের কবিতা বিভাগে মুদ্রিত, পুরোদস্তুর শিরোনামসহ রচনার কথাই বলছি। বাদ রাখছি তাঁর অনূদিত ও স্বরচিত অজস্র দু'চার ছত্রের পদ্য।

হাইনে থেকে খৈয়াম, চণ্ডীদাস থেকে হাউসম্যান—বিভিন্ন ভাষার কবিতা মূল ভাষায় উদ্ধৃত করে পরমুহূর্তেই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন বারবার। এই পদ্যগুলি তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় ঝরে পড়া শিউলির মতো বিছানো থাকে।

ফুলের মতো দু'দণ্ডের সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এরা নিয়ত জন্মায় ও মরে। লেখক বোধহয় নিজেও কখনো এদের খুব গুরুত্ব দেননি। আনপড় পাঠককে বিভাষিক চৌকাট ডিঙানোর আমন্ত্রণ জানাতেই তিনি ফিরে ফিরে নিশিপুষ্পা কুড়িয়ে অঞ্জলি পুরেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলানুগ হতে হতে গিয়ে কাব্যরসের অল্প-বিস্তর হানি ঘটেছে। যেমন—

আজ হুনরে হালে খরাব্ মমন্ শুদ ইস্লাহ পজীর
হম্চু ওয়রানে কি আজ গন্জে খুদ্ আবাদ ন্ শুদ্।
এত গুণ ধরি কি হইবে বলো দুরবস্থার মাঝে?
পোড়ো বাড়িটাতে লুকোনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে?

(শবনম)

অথবা,—

ধন্‌গে ওতন্ অজ্ তখতে সুলেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্ গুলে রেহান বেহতর,
দেশের পাথর সুলেমান শা'র তখতের চেয়ে সেরা
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়, দিশী কাঁটা প্রাণকাড়া।

(দেশে-বিদেশে)

এই ধরনের অনুবাদে তাঁর কাব্যানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে যত, কবি দক্ষতা ততটা নয়। তাই এগুলি আলোচনার বাইরে রেখে বরং তাঁর নিখাদ কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সমস্যা হল তাঁর 'আক্ষরিক' ও 'সাহিত্যিক' অর্থে 'কবিতা'র অপ্রতুলতা। দীর্ঘ জীবনে সর্বার্থে কবিতা একুনে পঞ্চাশটি লিখেছেন কি না সন্দেহ। ১৯৪৫-এ শুরু। ওই বছর ২৮শে জুলাই সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশ হয় 'এষাস্য পরমা গতিঃ'। 'সত্যপীর' ছদ্মনামে রচিত মুজতবার এই কবিতার বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষের যুগ-প্রাচীন গরিমা বর্ণনা। ব্যালাড-ধর্মী এই কবিতার পরেই ওই বছরের ২৫শে নভেম্বর 'দৈনিক আনন্দবাজার' এ লিখলেন 'তপঃশান্ত'। এবার বিষয় অগ্নিগর্ভ সমকালীন রাজনীতি। অতঃপর মাঝে মাঝেই লিখেছেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী বা জন্মশতবর্ষে কবিপ্রশস্তি গেয়েছেন। কখনো ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। কখনো আবার খেলাচ্ছলে ছন্দে গেঁথেছেন দু'চারটি চট্‌জলদি ভাব।

তবে প্রথম কবিতা প্রকাশের (১৯৪৫) বহু পূর্বেই যে মুজতবা কবিতা লিখতেন তার উল্লেখ 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে। সময় ১৯৩৯। ট্রেনে যেতে যেতে পশ্চিম ভারতের রুক্ষ প্রকৃতির বর্ণনা লিখতে গিয়ে যে পদ ক'টি উৎসারিত হয়েছিল—তার কিয়দাংশ উদ্ধৃত করছি।

'হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধাবে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।'

এ প্রসঙ্গে কবির অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, 'কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।'

নিষ্করুণ এই আত্মসমালোচনায় অবশ্য ভুল নেই বিশেষ। গদ্যভাষায় মুজতবা যেমন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান, পদ্যভাষায় তিনি তেমনই আড়ষ্ট ও পরমুখাপেক্ষী। এখানে 'পরমুখ' বলতে প্রধানত 'গুরুমুখ'—কেন না 'কবিগুরু' প্রাকৃতজনের ব্যাকরণে সম্বন্ধ তৎপুরুষ হলেও মুজতবার জীবনে সর্বদা কর্মধারয় রূপে সমাসীন।

ফলত, মুজতবার কবিতা লেখা যেন অবনতমস্তকে গুরুগৃহে পদার্পণ। চোখ দু'টি অধশ্চর—তাই গুরুপদ ব্যতীত কিছু নজরে পড়ে না। তাঁর অধিকাংশ কবিতার ভাব, ছন্দ ও মিলে উজ্জ্বল রবি-উপস্থিতি প্রায়শই অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। দু'একটি উদাহরণ দিই—

'তারপর তব জয়রথ
বাহিরিল ঘর্ঘরিয়া, রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
বঙ্গভূমি কেন্দ্র করি রবিরশ্মি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
দিক হতে দিগন্তরে, বিশ্বলোক মানিল বিস্ময়
সর্বকণ্ঠে শুনি তব জয়।'.. (বৈশাখী রবি)

অথবা, '....'এস সর্বজন,
জাতিবর্ণ নাহি হেথা। মুক্ত এ প্রাঙ্গণ

আচণ্ডাল তরে।' শুনি সে উদাত্ত বাণী
শান্ত হল অভিযান, যুদ্ধে হানাহানি।' (এষাস্য পরমা গতি?)

মুজতবা যখন এই ভাষায় কবিতা লেখেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার বহু পূর্বে কবিতার আধুনিক আঙ্গিক নিয়ে নানা সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। তাঁর পদচিহ্ন ধরে এসেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্র দত্ত প্রমুখ। মুজতবা প্রকৃতপক্ষে জয়দেব ও খৈয়ামের ভাবশিষ্য— ভাবলোকের চিরস্থিত বাসিন্দা। যন্ত্রযুগের যন্ত্রণার বাস্তবে পা রেখে কবিতার তদুপযোগী আধুনিক ভাব ও ভাষার সন্ধানে প্রবল অনীহা তাঁর। অতএব, সচেতনভাবে যখন 'মডার্ন' কবিতা লিখতে বসেন তখন উৎপাদিত বস্তুটি আসলে সমসাময়িক কবিদের প্রতি নামান্তরে শ্লেষ হয়ে দাঁড়ায়—

'আজ সকাল থেকে ভ্যাপসা গরম।
কি করি, কি করি, কি করে গরম ভুলি।
এমন সময় এক বন্ধু এলেন এক ঠোঙা কালো জাম নিয়ে'
কত বৎসরের পরে কালো জাম!
মনে পড়ল,
বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল,
আমি যখন একদিন এই রঙের একটি মেয়েকে ভালবেসে ছিলুম,
কারণ, আমার রঙ তখন ছিল ফর্সা,
—আজ আমার ছেলে ফিরোজের মত—।
হার্টটা দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেল।' (মুজতবার দিনলিপি থেকে)

এই কষ্টকল্পিত রূপকালঙ্কার ও শেষাংশে দুর্বোধ্যতা 'মডার্ন' কবিদের সজ্ঞান প্যারডি ছাড়া কিছু নয়।

বরং তাঁর মজার কবিতাগুলি উৎরেছে চমৎকার। সীতু মিত্র ছদ্মনামে লিখিত 'মার্জার-নিধন' কাব্যের কথা না বললেই নয়। একটি প্রচলিত কৌতুকী নানা বিচিত্র ছন্দে গেঁথেছেন কুশলী ব্যঙ্গ-রসিকের মতো। এ ছাড়া বরোদায় বাসকালে ওখানকার কীর্তিমন্দিরে দেওয়াল-চিত্র আঁকার জন্য নন্দলাল বসুকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সূত্রে নন্দলালের আঁকার Modus operandi রূপণে যে কবিতাটি লেখেন, স্নিগ্ধ কৌতুকরসে তা আগাগোড়া জারিত।

'সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা, সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে।' (নন্দলালের দেযাল-ছবি)

তবু এগুলি সার্থক কবিতা নয়। শেষ জীবনে লিখলেন 'সোক্রাতেসের প্রার্থনা'—

'এই যে দেহেব রক্তে অবশিষ্ট আছে যৌনক্ষুধা,
নির্মূল করিয়া দাও পরিপূর্ণ শান্তিবস সুধা।'

এখানেও কবিতা তাঁর মননেব আত্মীয নয়—নিছক ছন্দোবদ্ধ পংক্তি-সমষ্টি। তাই মুজতবাকে 'কবি' বলা কঠিন।

অথচ কবি না হয়েও তিনি কবি। এই অধ্যাসটি বুঝতে হলে তাঁব গদ্য-সাম্রাজ্যে পদব্রজে সফর করতে হবে। যখন তিনি নিছক অনুবাদক বা রবির পরচ্ছন্দ উপগ্রহ মাত্র নন—তখনই সহসা তাঁব কাব্য-নির্ঝরেব স্বপ্নভঙ্গ। শব্দ-প্রতিমার মুখে রূপটান দেন দক্ষ শিল্পীর তুলিতে—

'আজ শবনম সেজেছে।.

দু-কানে দুটি মুক্তোলতা ঝুলছে আর তার শেযপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রবি। শুভ্র মরালকণ্ঠেব ববফের উপব যেন দু'ফোঁটা তাজা বক্ত পড়েছে। এই এখ্‌খুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আবম্ভ কববে।'

(শবনম—দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম অধ্যায)

এখানে শুধু প্রেমিকাব ভা-চিত্রিক রূপকল্পনে নয—আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্ববর্তিতামূলক প্রতীক রূপে ব্যবহৃত 'বক্তবিন্দু'র উপমায় কবিতাব প্রচ্ছন্ন, কিন্তু সোপচার অর্চনা করেছেন লেখক। রসিকজন জানেন যে, হাসি নয, মহৎ কবিতা সতত-ই বেদনা থেকে জন্ম নেয়। এখানে মুজতবা কাঁদছেন, আব তাই তাঁর কাব্যবস স্বপ্রভ দীপ্তিতে কয়েক বিন্দু অশ্রুর মতো ঝিকমিক করে উঠেছে। সারা জীবন ধরে লেখা অজস্র belles-letters-এর ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি এমন কেঁদেছেন, গদ্যের আপাতকঠিন প্রস্তরগাত্রে কবিতার দ্রোণপুষ্প ফুটেছে।

আবার যখন তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত শোকগাথার সুর ছাপিয়ে স্পষ্টতর শোনা গেছে বিশ্বমানবাত্মার হৃদয়ের সন্তপ্ত 'লাব্‌ডুব্'—কবিতা হযে উঠেছে মহত্তর।

'সাতভাই চম্পা আমাকে চেনে, আর বুড়ীগঙ্গাব পারে নির্বাসিতা ওই বিদেশী ফুলকেও চেনে .ওই তো হচ্ছে, ঐ ওপারে, তারা প্রদীপের মালার বদল। স্বর্গের দেযালীর গন্ধে পৃথিবীর দেযালীতে মিলে আলোক শিখীব আলিম্পন।' (বুড়ীগঙ্গা, বাংলাদেশ)

এখানে মুজতবা কাঁদছেন দুই বাংলার আরও কোটি কোটি 'বিদেশী' ভাই-বোনেব সাথে। তাই এই গদ্যাংশে নিবিষ্ট পাঠক সহজেই খুঁজে পান আমাদের দেশের প্রথম প্রতিবাদী কবিতা 'মা নিযাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম'র শাশ্বতী সুযমা। বোঝা সহজ হয, কবি না হযেও মুজতবা কবি কেন।

অনুবাদক মুজতবা

মুনমুন চট্টোপাধ্যায়

প্রচুর দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতায় এবং বিচিত্র বিষয়ের পড়াশোনায় মুজতবা আলী হয়ে উঠেছিলেন বহুভাষাবিদ। তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা জানিয়েছেন, পনেরোটি ভাষার অধিকারী ছিলেন তিনি। এর মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাচ্য দেশীয় ভাষা তো ছিলই, আরো ছিল ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, ইত্যাদি পশ্চিমী ভাষাসমূহ। শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথের কাছেই কাব্যপাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেসময় সেখানে যে-সব স্বনামধন্য অধ্যাপকদের কাছে মুজতবার পড়ার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরা হলেন বেনোয়া, বগদানফ, সিলভাঁ লেভি, তুচ্চি, ভিনটারনিৎস। এঁদের সকলের প্রভাবেই নানাবিধ ভাষাকে সহজাত দক্ষতায় আত্মীকৃত করে নেন মুজতবা আলী। স্বভাবতই মনে হতে পারে, মাতৃভাষার দপ্তরে ভিনদেশী ভাষার সাহিত্যকর্ম অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনিই যথোপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর তাবৎ রচনাকর্ম ঘেঁটে এ-বিষয়ে নিরাশ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। উপন্যাস, গল্প, নাটিকা, প্রবন্ধ এবং বাধ্য হয়ে দু-চার ছত্র কাব্যের অনুবাদ এতই সীমিত যে আশাহত হতে হয়। তবে অনুবাদ-রচনা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং রীতি-নীতি প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মতবাদ মেলে দুটি প্রবন্ধে। 'পঞ্চতন্ত্র' প্রথম পর্ব (আষাঢ় ১৩৫৯), 'পঞ্চতন্ত্র' দ্বিতীয় পর্ব (১৯৬৬ সাল)—এই দুটি গ্রন্থেই 'অনুবাদ সাহিত্য' নাম দিয়ে তাঁর দুটি পৃথক প্রবন্ধ আছে।

প্রথম প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্যকে 'অদ্ভুত' এবং 'বেতালা সাহিত্য' আখ্যা দিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কারণ দেখিয়েছেন। গীতিকাব্যে যে সাহিত্য আকাশচুম্বী দক্ষতার অধিকারী, অনুবাদ সাহিত্যে, সে-ভাণ্ডার একেবারে 'এঁদো কুয়োর ভেতরে খাবি খায়'। এর কারণ হিসেবে অনুবাদ-কার্যে

রবীন্দ্রনাথের প্রায়-অনুপস্থিতিকেই তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রানুসারীরা তাঁরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেছেন আর বাংলা সাহিত্যেব এই শাখায় একটি ব্যাপক শূন্যতাব সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুবাদ সাহিত্যের ধারাবাহিক যাত্রাপথ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহেব এবং রাজশেখর বসুর মহাভারত অনুবাদের কথা এসেছে। বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ঈশান ঘোষের জাতক, তাছাড়া বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি অনূদিত গ্রন্থের জনপ্রিয়তাব কথা বলেছেন। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে এই আলোচনাটি আছে 'পঞ্চতন্ত্র' ২য় পর্বের 'অনুবাদ সাহিত্য' প্রবন্ধে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে মালিক মহম্মদ জায়সীব 'পদুমাবৎ' কাব্যেব আলাওল কৃত অনুবাদ পদ্মাবতীর কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ই উসুফ-জোলেখা, লায়লা-মজনু, আরব্যোপন্যাস, হাতিমতাই, চহার দরবেশ প্রভৃতিব পর ভিনদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদকে বাহন কবে আমাদেব সাহিত্যের ভাণ্ডারে এসেছে রবিনসন ক্রুসো, গালির্ভাস ট্রাভেল, লা মিজেরাবল প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেব 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ কবে তাঁকে তিনি ছন্দেব যাদুকর থেকে অপব একটি নতুন অভিধায় উন্নীত কবেছেন--'অনুবাদের যাদুকব'। হীবেন দত্তেব 'তিনসঙ্গী', দীনেন্দ্র কুমাবেব 'রহস্য লহবী', মুজতবাব কাছে অনন্য অনুবাদ। লক্ষণীয, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদেব ধাবার পাশাপাশি মুজতবাব দুটি প্রবন্ধেই বিশেষ আলোচনাব জায়গা কবে নিয়েছে পিয়ের লোতিব 'ল্যাদ সাঁজাংলে'-এব জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব-কৃত অনুবাদ 'ইংরেজবর্জিত ভারত'। এটিকে মুজতবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব 'অনুবাদ শশাঙ্কে কলঙ্ক' মনে কবেছেন। তাব কারণ, অবিবত ধ্বনিব অনুকবণে অনুবাদেব বিশিষ্টতা নষ্ট হযে গেছে। এ থেকে একটা ব্যাপাব স্বচ্ছ হযে ওঠে, যে মূলের হুবহু অনুকৃতিতে অনুবাদের মাধুর্য সর্বদা বক্ষিত হয না, এই সত্যটিতে মুজতবা বিশ্বাস রাখতেন। লোতির ভাণ্ডারে জাপান, তুর্কী আইসল্যাণ্ড, মেরু, সমুদ্রের বর্ণনায় শব্দেব সঙ্কুলান ছিল অনবদ্য। দীন ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন করে এর অনুবাদ করা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত জ্ঞান ছিল উত্তম, তিনি প্রায় সব ক্লাসিক সংস্কৃত নাটককেই বাংলায়

রূপ দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে মুজতবা আলী একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—'অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন'। একমাত্র ইংরেজীর পরিধিতে আবদ্ধ না থেকে প্রয়োজন অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া। কারণ যে কোনো সাহিত্যই অন্যের সাহচর্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, নব অনুপ্রেরণায় নতুন পথের অভিযাত্রী হয়। তবে একইসঙ্গে মুজতবা আলী বাজার চলতি ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সৈযদ মুজতবা আলীর অনূদিত সম্ভারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'প্রেম' উপন্যাসটি। মূল রচয়িতা —নিকোলাই সেমোনোভিচ্ লেস্কফ (১৮৩১—১৮৯৫)। গ্রন্থটির নাম ছিল—'মৎসেন্স্ক জেলার লেডি ম্যাকবেথ' ; প্রকাশকাল ১৮৬৫। মুজতবা আলীর অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫তে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। তলস্তয়, তুর্গেনিয়েফ, মপার্সাঁর রচনাকর্মের সেই যুগে 'প্রেম' উপন্যাসের রচয়িতা ছিলেন নেহাতই অখ্যাত। অনুবাদক রচনাকারের একটি অনবদ্য সৃষ্টিকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। কাতেরিনা ব্যবসায়ী ধনী পরিবারের পুত্রবধূ। তার নিঃসঙ্গ জীবনের অতৃপ্ত প্রেমদৃষ্টি যখনই কর্মচারী সের্গেই-এর উপর পড়ে, তখন থেকেই শুরু হয় রুদ্ধশ্বাস প্রেমের যাত্রা। এই পথে বাধা এসেছে বারবার, তাতে অবশ্য কাতেরিনাকে ঠেকানো যায় নি। অনবদ্য সাহস এবং নৈপুণ্যে সে হারিয়ে দিয়েছে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে। শ্বশুর বরিস তিমোতেইয়েভিচ্, স্বামী নিনোভিই বরিসিচ এবং সবশেষে সম্পত্তির অংশীদার নাবালক দেবর ফেদিয়াকে ঠাণ্ডা মাথায় চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কাতেরিনা দ্বিধা বোধ করে না। সের্গেই-এর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম তাকে এমনই শক্তি জোগায়, যার সাহায্যে সে অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারে সামাজিক মননের রীতি-নীতিকে। কিন্তু এহেন প্রেমকেও হার মানতে হয় কপট প্রেমিক-পুরুষের যথেচ্ছাচারে। কাতেরিনা অবশ্য পরাজয় মেনে নেয় নি, তাই প্রতিযোগিনী নারী সোনেৎকাকে সঙ্গে নিয়ে জলের অতলে তলিয়ে যায়। কাতেরিনার সমগ্র জীবনটাই একটি শব্দ দ্বারা চালিত হয়েছে—তা হল প্রেম। প্রেম শেষ হয়ে যেতেই এই নারী নিজেকে বিনষ্ট করতে একমুহূর্ত

সংশয় করেনি এবং অবশ্যই সেরগেই-এর জীবন থেকে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিনীকেও সরিয়ে দিয়েছে। এই অনন্যসাধারণ কাহিনীটি সম্বন্ধে স্বয়ং অনুবাদকের মন্তব্য— 'বীভৎস রসের সঙ্গে সঙ্গে এতে আছে অতি মধুর গীতিরস, রুশ নিদাঘ-দিনান্তের অপূর্ব বর্ণনা, প্রেমের আকুতি-মিনতি, অভিমান, ক্ষণকলহ, মিলন-বিচ্ছেদ এবং সর্বশেষে দয়িতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ'। কাতেরিনার জঘন্য পাপাচার সত্ত্বেও একনিষ্ঠ প্রেম মুজতবা আলীকে বিমুগ্ধ করেছে। কাহিনীটিকে 'নভেলিকা' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, এর সঙ্গে হয়ত মপাসাঁর 'বেল্ আমি'-র সাদৃশ্য আছে। বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে পরিবেশননীতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী সৈয়দ মুজতবা আলী। রুশ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে গিয়ে ইকন্, সামোভার, আপেল গাছ, ভলগার সাহায্যে রুশীয় আবহাওয়া রচনা করেছেন এবং কাতেরিনার চারিত্রিক সঙ্গতি বজায় রাখতেই আদিরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এছাড়া তাঁর কিছু টুকরো, বিচ্ছিন্ন অনুবাদকর্ম ছড়িয়ে আছে। শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি 'লিখন্' থেকে সাধু বঙ্গানুবাদ করেছেন—'ভারতীয় নৃত্য'। মুজতবা সুলভ ভাষা ও শাব্দিক পারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয় আন্তন চেখভের নাটিকার বাংলায় অনুবাদ 'বিয়ের প্রস্তাব'-এ। 'আলফঁস দোদের শব্দে শব্দে অনুবাদ'—'বুড়োবুড়ী' গল্পটি। রিচার্ড কনেলের একটি রোমাঞ্চকর গল্পের অনুবাদ 'সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার'। 'ভেন্দেত্তা' -মাতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের করুণ গল্প। উত্তর ইতালির এই কাহিনীটি বেরিয়েছিল সুইস কাগজ ভেল্টভখেতে।

মুজতবা আলী কিছু খণ্ড কবিতার অনুবাদও করেছেন। এগুলি দুর্মূল্য হলেও তিনি মাঝে মাঝেই দায়ে পড়ে অনুবাদের অজুহাত দিয়েছেন। ওমর-এর কিছু পদ অনূদিত করে একথাও জানিয়েছেন—'লেখকের অ্যামেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না!' এ-সব উক্তিকে অগ্রাহ্য করেই মণিমুক্তার মত ওমর খৈয়াম, জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান ও হাইনরিখ হাইনের কিছু কিছু অনূদিত পদ পাওয়া যায়। তাঁর রোজনামচাতেও এরকমই কয়েকটি সম্ভার আছে, সেগুলো আরবী-ফার্সী-উর্দু-হিন্দী, জার্মান-ইংরেজী থেকে অনূদিত। কাজী নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর

খৈয়াম'-এর অনুবাদের ভূমিকাংশ লিখেছেন সৈযদ মুজতবা আলী। এ প্রসঙ্গে তিনি নজরুলের ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন ক্ষমতা, তাঁর রোমাণ্টিকভাষা, রাজনীতি এবং ধর্মমতের ইতিহাস গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন। ওমর খৈয়ামের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করে তাঁর বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করিয়াছেন। তিনি ওমরের ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছেন, কারণ তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব প্রদর্শনই মুজতবার উদ্দেশ্য এবং এখানেই ওমর 'নজরুল ইসলামের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ'। দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে রচিত কয়েকটি চতুষ্পদী অনুবাদ করেছেন মুজতবা আলী। ওমরের প্রতিপাদ্য --'যতক্ষণ পাবো দর্শন-বিজ্ঞান সাঁই-সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো'। মুজতবার অনুবাদে—

'মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব- -লাও ঝটপট-রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মুর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে'।

'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন যে - 'যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে'। ঠিক এই একই বোধ আমাদের মনে গড়ে ওঠে মুজতবার অনুবাদ কর্মের স্বল্পতায়। সামান্য ইচ্ছে হলেই তিনি পনেরোটি ভাষার 'বিবিধ রতন' ও বঙ্গভাষার পরিধিকে সংযুক্ত করতে পারতেন। অথচ বহুভাষাবিদ হয়েও এ কাজে তিনি কখনোই 'সিরিয়াস' পদক্ষেপ নেননি; হয়ত কিছুটা মর্জি-ভরেই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকার্য 'প্রেম'-এর ভূমিকাংশে এই খেয়ালেই মন্তব্য করেছেন---'অনিদ্রারোগে অনুবাদকর্ম অতিশয় উপকারী'।

দ্বিতীয় পর্ব

অবিশ্বাস্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী এমনই এক আশ্চয শক্তিধব মানুষ ছিলেন, যাঁর কথা---আমি সাধাবণ সংক্ষিপ্ত জীবনীব কথা বলছি না—যদি কেউ সবিস্তারে লেখেন আজকের দিনে অনেকেই বিশ্বাস কববেন না। 'গাঁজা' বা 'গুল' বলে উড়িয়ে দেবেন।

অবশ্য আমাব জীবনে এমন বিবাট মানুষ আবও কয়েকজন দেখেছি। এঁদেব পাণ্ডিত্য, বসবোধ, দৃষ্টি এবং শিক্ষা নাযকত্বেব ক্ষমতা আজকেব আলস্যপ্রিয় চাতুর্য সম্বল স্বল্প-জ্ঞান মানুষদেব পক্ষে সম্যক ধাবণা কবা সম্ভব নয়। এখনকাব অধ্যাপকবা অনেকেই বিনা আর্থিক প্রয়োজনে বেশি পড়াশুনোয় বিশ্বাসী নন, সে অতিবিক্ত সময়টা নোট বই বা পাঠ্য পুস্তক লেখায় ব্যয় কবাব মূল্য তাঁদেব কাছে অনেক বেশি।

আমি যাঁদেব কথা বলেছি, এইসব পিগমীদেব তুলনায় তাঁবা ছিলেন পর্বত সদৃশ। আমি সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায, সুবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, যদুনাথ সবকাব, গোপীনাথ কবিরাজ---এঁদেব কথাই বলছি।

মুজবতা আলীব জ্ঞান-পিপাসাব সঙ্গে আর একটি অসামান্য গুণেব সংযোজন হয়েছিল---যা ঐসব মহান মানুষদেব এতটা ছিল না---তা হ'ল বসদৃষ্টি। বিশেষ করে সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁর যে আগ্রহ, গুণগ্রাহিতা, বোধশক্তি ও বিচাব শক্তি ছিল—তা অন্য কোন লেখকেব (অবশ্যই ববীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে) ছিল বলে আমাব জানা নেই।

এমনকি, একটা কথা যদি বলি, আপনাবা চমকে উঠবেন না—এই বসবোধ ও বসদৃষ্টিব জন্যই তাঁর রসসৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে। তিনি অসামান্য লেখক ছিলেন — কিন্তু বসসৃষ্টি করা অপেক্ষা সে রসে ডুবে থাকাই তিনি যেন বেশি পছন্দ করতেন। অমৃতে ডুবে থেকে সে রস উপভোগ করতে করতে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা যা

মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়—যশ প্রতিষ্ঠা অর্থ এসবের কথা ভুলে যেতেন। প্রতিষ্ঠার জন্য খ্যাতির জন্য অহরহ পরিশ্রম ক'রে এই মাধুর্য উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন—এ চিন্তাও বরদাস্ত করতে পারতেন না।

আর বিচারশক্তি বোধশক্তি অনেক বেশি ছিল বলেই নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে সজাগ সতর্কতা থাকত সর্বদা—বেশী লিখতে গিয়ে বাজে লেখা, 'বাজারে' লেখা লিখতে তিনি রাজী ছিলেন না। নইলে তিনি আরও অনেক—অনেকে লিখতে পারতেন। আর, আমাদের ধারণা—খুব বাজে কিছু লেখা তাঁর সাধ্যের অতীত।

সাধ্যের অতীত কথাটা শুনে অনেক হয়ত চমকে যাবেন; অনেকের বিশ্বাস ভাল লেখা সম্বন্ধে কথাটা প্রযোজ্য—খারাপ লেখা আবার এত কি কঠিন?

মোপাসাঁর সেই 'শিল্পী' গল্পটি মনে আছে আপনাদের?

নিজের স্ত্রীকে একটা বড় তক্তার সঙ্গে বেঁধে তার চারদিকে ছুরি ছুঁড়ে খেলা দেখাত লোকটি। ওর দেহ বাঁচিয়ে অথচ সেই দেহের পাশে পাশে গা ঘেঁষে ছোরাগুলো ছুঁড়ত। সেগুলো যেন ঐ দেহের রেখা রচনা করে কাঠে গিয়ে বিঁধত, একটার পর একটা। মাঝে মাঝে হয়ত একচুলের মতো ব্যবধান—কিন্তু মানুষটার গায়ে একটুও আঁচড়ও কাটত না।

লোকটি ছিল ওস্তাদ খেলোয়াড়। স্ত্রী অবিশ্বাসিনী তা জেনেছিল, ভাবত ঐ খেলার ছলেই একদিন স্ত্রীকে খুন করবে, দর্শকরা ভাববে সামান্য একটু হিসেবের ভুল। কিন্তু কোনদিনই পারত না। কারণ সে জাতশিল্পী, শিল্পের কাজে ইচ্ছে থাকলেও ভুল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

স্ত্রীও তা জানত, তাই সে প্রতিদিন ঐ খেলার-সময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে চ্যালেঞ্জ জানাত স্বামীকে, ক্রুদ্ধ করে তুলত। ও ক্রুদ্ধ হতও, চেষ্টা করত ভুল করতে—তবুও পারত না।

এ ক্ষেত্রে সেই উপমাই দিতে চাইছি। মুজতবা আলীর পক্ষে একেবারে বাজে লেখা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য, কম লেখার সে-ই একমাত্র কারণ নয়। আগেই বলেছি তিনি জ্ঞান ও সাহিত্যরসের মাধুর্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। বই লেখার থেকে বই পড়ার ঝোঁক ছিল বেশি। বলতেন, 'লিখি নিতান্ত পেটের জন্যে—ওসব পট-বয়লার। লিখতে আমার আদৌ ইচ্ছে করে না। আগেকার মতো তেমন কোন

রাজা-রাজড়া যদি থাকত, কিছু কিছু বৃত্তি দিত তো বেঁচে যেতুম, আর তাহলে এক লাইনও লিখতুম না। শুধু বই পড়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতুম।'

এটা যে কত সত্য তা বুঝেছিলুম ওঁর আর একটা কথাতে। সে সময় ওঁর স্ত্রী থাকতেন রাজশাহীতে, উনি বোলপুরে। অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন অপ্রীতির লেশমাত্র ছিল না। ছেলে দুটি ছিল বুকের মানিক—তা বড় ছেলে মুশারফ্ বা ফিরোজকে লেখা চিঠি থেকেই প্রমাণিত—তবু একা এখানে পড়ে থাকতেন কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে।

একদিন তা করেও ফেলেছিলাম, 'দাদা—এমন এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার ব্যবস্থা কেন, ওখানে গিয়ে বাস করলেই তো পারেন। ওদেশের সরকার আপনাকে পেলে মাথায় করে রাখবে। চলে যান না ওখানে।'

উত্তর এল, 'তুমি ক্ষেপেছ ব্রাদার। ওখানে বিশ্বভারতী কি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মতো লাইব্রেরী আছে? ওখানে এমন বই পাবো কোথায়, পড়ব কি?' পড়তেন যে কী পরিমাণ—শুধু বড় বড় দর্শন ইতিহাস রাজনীতির বই নয়, বা বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক বই-ই নয়—সামান্য লেখকের সামান্য রচনাও তাঁর চোখ এড়াত না—তা আমি নিজেকে দিয়েই বুঝেছি।

পাঠকেরা হয়ত ভাবছেন আমি সেই গতানুগতিক স্মৃতি-চারণের ছকে চেলে এলুম, বিখ্যাত লোকের খ্যাতির আলোতে নিজেকে দেখানোর আশায়। অর্থাৎ 'তিনি' আর আমি নয়—আমি আর 'তিনি'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হাস্যকর ব্যাপার ঘটে এটা সত্য। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—ওঁর এবং আমার পরমায়ুর অনেকখানি পেরিয়ে এসে, ক্রমে ক্রমে। আমার এই গোষ্পদ-প্রমাণ জলে ওঁর চিত্র যেটুকু ফুটেছে সেইটুকুই তো আমার সম্বল।

আমার একখানা আধা-ঐতিহাসিক উপন্যাস বেরোচ্ছিল 'মাসিক বসুমতী'তে 'সমুদ্রের চূড়া' বলে। তাতে 'আমির বা ওমরাহ্‌গণ' বা এই ধরনের একটা উল্লেখ। বস্তুত আমার তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল ও দুটো দুই ভিন্ন শ্রেণীর রাজপুরুষের পদবী। সহসা একখানি পোস্টকার্ড এসে হাজির, 'ব্রাদার, ওমরাহ্ হ'ল আমির শব্দেরই প্লুরাল, বহুবচন। ও দুটো আলাদা কোন শ্রেণী নয়।'

এতে আমার আনন্দ যত হ'ল—ওঁর মতো বিদগ্ধজন আমার লেখা মন দিয়ে পড়েছেন বলে—বিস্ময় তার থেকে অনেক বেশি। যিনি দিনরাত মূল্যবান বইতে

ডুবে থাকেন তিনি এইসব সাময়িক পত্রের ধারাবাহিক লেখা পড়ার সময় পান কি করে।

এর চেয়েও অবাক হয়েছিলাম আর একদিন।

উনি তখন বিচি রোডে এক বন্ধুর বাড়ি থাকেন। তার কিছু আগে এক পত্রিকায় (বোধহয় কোন পূজা সংখ্যায়) আমার একটি পৌরাণিক গল্প বেরিয়েছিল। সে দিন সে আড্ডায় আর একটি বন্ধু লোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে গল্পের একটি তথ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁর সন্দেহ নিরসনে এগিয়ে এলেন, আমি কোনও উত্তর দেবার আগেই, আলীদা স্বয়ং।

তবে সেটাও বড় কথা নয়—উনি মহাভারত থেকে অনেকখানি, মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে শোনালেন। তা বোধহয় উনিশ-কুড়িটি শ্লোক হবে। আমি তো বটেই, বলাবাহুল্য উপস্থিত সকলেই অবাক।

আমি বললুম, 'আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় অনেকবারই পেয়েছি কিন্তু এসব পৌরাণিক বইও এত ভাল করে পড়েছেন—তাও মূল সংস্কৃতে—আর এমন মনে রেখেছেন—এমন কখনও কল্পনাও করিনি। সংস্কৃত ভাষাতেও এত পাণ্ডিত্য আপনার। আশ্চর্য।'

'দূর পাগল। একে কি পণ্ডিতি বলে। তুমি আমাদের দাদাদের দ্যাখোনি—পাণ্ডিত হলেন তাঁরাই। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে বঝবে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য কাকে বলে! বিশেষ করে আমার বড়দা। আমি তো তাদের কাছে মুর্খ। বংশের কলঙ্ক।'

'তা তাঁরাই বা এত সংস্কৃত শিখলেন কোথায়?'

'আরে আমাদের বাড়িতেই যে টোল ছিল, চারশো বছরের টোল কি আরও বেশি। আমরা সেই অভিমন্যুর মতো কিছুটা জ্ঞান নিয়েই জন্মেছি।'

মনে পড়ে গেল সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের একটি কথা। শুনেছি ওঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখনই অনর্গল উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করতেন, শুধু তাই নয়, ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। বিপিন পাল মশাই ওঁর এই আশ্চর্য শক্তি দেখে নাম দিয়েছিলেন 'খোকা ভগবান'। সভাসমিতিতে নিয়ে যেতেন, কোলে করে দাঁড়িয়ে ওঁকে দিয়ে আবৃত্তি করাতেন। এটা আমার বাল্যকালেই শোনা ছিল, বহুদিন পরে আমার সঙ্গে পরিচয় হ'তে এই ব্যাপারের উল্লেখ করে বলেছিলুম,

'সত্যিই কি আপনার কোন ঐশ্বরিক শক্তি ছিল?'

তিনিও হেসে বলেছিলেন, 'আপনি কি ক্ষেপেছেন! ওসব কিছু না, ওটা হল ঐতিহ্যের ব্যাপার। আমাদের বাড়িতে আড়াইশো তিনশো বছরের চতুষ্পাঠী ছিল, আমরা ঐ পরিবেশের মধ্যেই জন্মেছি যে, আমাদের রক্তে সংস্কৃতচর্চা, শাস্ত্রচর্চা আছে, অভিমন্যুর মতোই তা নিয়ে জন্মেছি।'

আলীদার স্মৃতির পবিচয় আবও অনেক পেয়েছি। উনি বলতেন, 'যা বেদনাদায়ক, সেগুলো মনে বাখি না, যা আনন্দদায়ক তাই মনে রাখার চেষ্টা কবি বলে এত মনে বাখতে পারি। আমাব প্রতি কে কি অসৎ আচরণ করছে, কে ক্ষতি করেছে সে সব কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করি। সেটুকু শক্তি দিয়ে চিবন্তন সাহিত্যেব দুটো পংক্তি মনে বাখলে চিব-আনন্দ নির্ঝর হয়ে থাকবে।'

উনি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান মুখস্থ বলতে পাবতেন। সমস্ত বিখ্যাত কবিতা ছিল কণ্ঠস্থ। তবু কবিতা গান তো মনে রাখা সহজ, উনি বহু গদ্যাংশও উদ্ধাব কবতে পারতেন। একসঙ্গে তিন-চাব অনুচ্ছেদও অনায়াসে বলে যেতে শুনেছি। এমন ক্ষমতা আর একজনেব মধ্যে দেখেছি---কাশীব সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়েব, তখনকাব বহু লেখকেবই অন্তবঙ্গ সুধাদা, শবৎবাবুবও প্রিয় সুধা--ববীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন গ্রন্থেব কিম্বা অন্য সাহিত্য-বিযযক প্রবন্ধ পুস্তকের দু'তিন পৃষ্ঠাব মতো মুখস্থ বলতে পারতেন।

তবে সুধাদাব পাঠনা সীমাবদ্ধ ছিল। আমি যতদূর জানি বাংলা ইংরেজী এবং কিছু ফরাসী সাহিত্য এবং দর্শন-জাতীয় বিষয়েব বাইরে বিশেষ পড়াশুনো করেন নি। আলীদা তো শুনে যা মনে হ'ত—এদিকে ফার্সী ওদিকে ফবাসী জার্মানী (ইংরেজী তো বটেই) মাতৃভাষাব মতোই আযত্ব করেছিলেন। সম্ভবত লাটিনও জানতেন কিছু কিছু।

পাঠকের কাছ থেকে আর এক দফা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবাবও একটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলছি।

আমার একটি উপন্যাস, 'আমি কান পেতে বই' তখন একটি সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল।

এ বইয়ের প্রেক্ষাপট—কিছুটা শ' খানেক বছর আগেব কলকাতা, কিছুটা যাট সত্তর বছর আগেব বৃন্দাবন। যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে আলীদা তখনই

তা পড়েছিলেন। তবে ছাপা খারাপ—বহু পৃষ্ঠাব অনেকাংশই বিবর্ণ বা নিষ্কলঙ্ক থাকত। ভুল তো অজস্র। বইটি প্রকাশিত হলে সম্পূর্ণ পড়তে চেয়েছিলেন।

বই পড়া শেষ হ'লে আমাকে চেপে ধরলেন, 'ভাই গজাদা, তুমি আমাকে একবার বৃন্দাবন নিয়ে চলো। আমার বড় ইচ্ছে তোমাব সঙ্গে ঐ সব গলিতে গলিতে মন্দিবে মন্দিবে ঘুবব।' [বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন উনি পর্যায়ক্রমে আমাকে 'আপনি' 'তুমি'—কখনও কখনও 'তুই'ও বলতেন—যখন যা মনে আসত।]

আমি তো অবাক।

বললুম, 'ঐ বই পড়ে নায়ক-নায়িকার কথা ভুলে গেলেন। বৃন্দাবনটাই শুধু মনে রইল।'

'আবে ব্রাদার। তোমার পাকা হাত—চবিত্র সৃষ্টিতে অসম্ভবও সম্ভব করতে পাবো। সে কথা নতুন করে কি বলব। যদি বাংলা সাহিত্যেব একটা জরিপ কবতে পাবতুম তো তোমাব জায়গা কোথায় লিখে দিতুম। এ তো আরও বাহাদুবী—জায়গাটাকে পর্যন্ত লোভনীয় করে তুলেছো। এখন কবে যাবে তাই বলো।'

আমি একটু বিব্রতভাবে বললুম—প্রথমত আমি যে বৃন্দাবনেব ছবি এঁকেছি তা আমাব চোখে দেখা—সত্যিই পথে পথে ঘুরে আনন্দ পাওয়া যেত। কিন্তু সে উপলব্ধি বীথিপথ বা বোমাঞ্চকব গলিপথেব চিহ্নও নেই, ভেঙ্গে চুরে বড় বড় পথ বেবিয়েছে। টাঙ্গা ট্যাক্সি সাইকেল বিক্সায সে স্বপ্নের বৃন্দাবন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এমন কি সবচেয়ে বোমান্স বা বোমাঞ্চ যেখানে বোধ হ'ত, সেই বঙ্কবিহাবী কি পুরনো অন্য মন্দিব—আজ কাশী বিশ্বনাথের মন্দিবেব মতোই জনাকীর্ণ, ব্যবসার স্থান হয়ে উঠেছে। বাজে দোকানদার আব ভুঁইফোঁড পাণ্ডায পাগল করে দেয়।'

'মন্দিবগুলো তো আছে।'

'সে মন্দিরে তো আপনাকে ঢুকতে দেবে না।'

'কেন দেবে না?' নিমেষে যেন জ্বলে উঠলেন আলীদা, 'বৈষ্ণবদেব তো বিধর্মী-বিচার থাকার কথা নয়। ওদের কাছে মুসলমান ক্রীশ্চান সকলেই সমান। মহাপ্রভু নিজে হরিদাস ঠাকুরকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে সমাধি দিয়েছিলেন।

সর্ব বর্ণ সর্ব ধর্মের লোককেই তিনি সমান চোখে দেখেছেন।'

আমি একটু অপ্রতিভ ভাবেই বললুম, 'কোন্ মহাপুরুষের বাণীই বা আমরা স্মরণ রেখেছি বলুন, বা তাঁর আদর্শে চলেছি। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক—আমরা কথায় কথায় এঁদের দোহাই পাড়ি, কিন্তু তাঁদের উপদেশ কি মানি! এই দেখুন না, আমাদের সরকার বিপদে পড়লেই গান্ধীজীর দোহাই দেন। তাঁকে জাতির জনক বলেন, কিন্তু তাঁর বাণী বা উপদেশ-নির্দেশ কোন কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছেন—তা খুঁজেও পাওযা যায না। ভীমরতিগ্রস্ত বুড়ো কর্তার মতোই তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছেন।'

আলীদা অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'শ্রীচৈতন্য প্রেমের উদ্‌গাতা—তাঁরও এই হাল হয়েছে'.. এই দেশ থেকে সাম্প্রদাযিকতা দূর করার চেষ্টা! ছোঃ!'

তিনি নিজে এইসব সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকতেন। সাম্প্রদায়িকতার আভাস মাত্রে শিউরে উঠতেন। কোথাও তেমন কোন ঘটনা ঘটলে সকলকেই সমান কটূক্তি করতেন—কোন সম্প্রদায়কেই রেয়াৎ করতেন না।

একঠা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করব।

রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সাধু, স্বামী সারদেশানন্দ (ইনি বৃন্দাবনে থাকতেন) আরবী ভাষা গভীরভাবে আযত্ত করে মূল কোর-আন ও অন্যান্য গ্রন্থপাঠ করে হজরতের একটি জীবনচরিত রচনা করেন। খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছিলেন। আমি পড়ার পর উৎসাহ ভরে সে কথা আলীদাকে বলতে গেলে তিনি বললেন, 'তা বেশ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এ বই তিনি যেন ছাপাবার চেষ্টা না করেন।'

আমি বললুম, 'কেন, তাতে দোষ কি? সত্যিই তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন—'

'আরে ব্রাদার, শোনই আমার কথাটা। শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন সত্য হতে পারে—কিন্তু সে কতটা শ্রদ্ধা! ফ্যানাটিকদের মতো শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ না হ'লে হিন্দু সন্ন্যাসী এ কাজ করতে যাবেন কেন! আর সেইখানেই তো বিপদ। তিনি হয়তো কোথাও বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা দিয়ে ভেবেছেন যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হ'ল—আমরা সেটাকে নবীর প্রতি অপমানকর বলে মনে করব। না, না—এ বই তাঁকে আলমারিতে তুলে রাখতে বলো।'

রম্যরসিক সৈয়দ মুজতবা আলী

ডাঃ মহম্মদ আবদুল ওয়ালী

[ডাঃ মহম্মদ আবদুল ওয়ালী বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। কাছ থেকে তাঁকে নানাভাবে দেখেছেন। সেই অন্তরঙ্গতার বিবরণ লেখাটিতে ধরা পড়েছে। ডাঃ ওয়ালী আশি সালের শুরুতে মারা যান। রচনাটি মুজতবা-অনুরাগী শ্রীসত্যবান সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা বা গবেষণা এক দুঃসাধ্য কাজ। আলী সাহেবের সূক্ষ্মবোধ, রম্যরস, দূরদর্শিতা এতই অসাধারণ ছিল যে তাঁর সম্পর্কে সব ঠিকমতো অনুধাবন করে একটি বিশ্লেষণমূলক জীবনী লেখা সহজ নয়। তিনি তাঁর জীবন ও মনন দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সভ্যতা, সমাজনীতি, রাজনীতি, রন্ধনরীতি, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত জীবন, রসিকতা এবং গুরুভক্তি সব এক করে দেখতে হয়। তাই আলীসাহেবের জীবনচর্চার সঠিক রূপ ফুটিয়ে তোলা আপাতদুরূহ কাজ, তা থেকে দূরে সরে বরং তাঁর সূক্ষ্ম রস সৃষ্টির উপর আলোকপাত করা সহজতর।

প্রথম সাক্ষাতে সৈয়দ মুজতবা আলী তিনদিন নানাবিষয়ে অবিরাম কথা বলেছিলেন, সেই কথাবার্তা রস ও প্রজ্ঞায় ছিল ভরপুর, পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত ছিল না। বিদায়কালের ঠিক আগে এমনই একটি সরস গল্প তিনি আমায় বলেছিলেন যা এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বললেন, "ডাক্তার যাওয়ার আগে একটা কথা শুনে যাও। এই যে তিনদিন তোমার সাথে বক্‌বক্‌ করলাম—এরজন্য আমি বিন্দুমাত্র দায়ী নই। এর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ছোটবেলায় আমি যে চঞ্চল ছিলাম তা আমার এই তিনদিনের বৃদ্ধবয়সের আচরণেও হাড়ে হাড়ে বেশ বুঝতে পেরেছ। আমার মা যে সুগৃহিনী ছিলেন সে কথা আমার সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু জায়গায় আছে। মা পাড়ার

টীকাদারকে গোপনে বলে রেখেছিলেন, 'তুই (এই টীকাদারকে মা বাল্যাবস্থা থেকেই জানতেন) ছুটির দিন এসে আমার বাচ্চাদের টীকা দিয়ে যাবি।' এদিকে মা ছুটির আগেব দিন আমাদের জানালেন, 'কালকে সকালে তোদের সবাইকে একত্রে বসিয়ে নারকেল-মুড়ি খাওয়াব'। পরের দিন সকালে আমরা ভাই-বোনে মিলে মনের আনন্দে নারকেল-মুড়ি খাচ্ছি। মা ঘরের দরজায় একটি পাল্লার শিকল তুলে দোর গোড়ায় বসে রইলেন। এমন সময় টীকাদার এসে হাজির। মা তাকেও নারকেল মুড়ি খেতে দিলেন। মুড়ি খাওযাব আনন্দে টীকাদারের উপস্থিতিকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি নি। খাওয়ার শেষে মা টীকাদাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'টীকা দেবার সমস্ত সরঞ্জাম এনেছিস?' তখন আমবা টীকাদাবেব উপস্থিতির হেতু উপলব্ধি করলাম। টীকাদাব জিনিসপত্র বাব করতে কবতে হঠাৎ জিভ কেটে বললো, 'যাঃ ল্যানসেট্‌টা তো আনতে ভুলে গেছি।' মা বললেন, 'বোস্! আমি ব্যবস্থা কবছি।' এবপব দবজাটি পুরো বন্ধ কবে তিনি দ্রুতপদে অন্দরমহলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পবেই তিনি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এর গ্রামোফোনের পিন্ নিয়ে এসে হাজিব। মা বললেন, 'এই পিন্‌গুলো স্পিরিটে পুড়িয়ে লিম্প দিয়ে চিরে চিরে টীকে দিয়ে দে।' আমবা এই সমস্ত জানালা দিয়ে দেখছিলাম। একে একে সবাইয়েব টীকা দেওযা হলো। শেষে আমাকে টীকে দেবাব ব্যবস্থা হলো। বুঝলে ডাক্তাব! ঐ যে আমাকে রেকর্ড-পিন দিয়ে টীকে দেওয়া হলো, সেই থেকে হিজ মাস্টার্স ভয়েসেব yours faithful servant-এর মত সারা জীবন বকেই চলেছি।"

একদিন বিকেলে আলী সাহেব আমাকে শুধালেন, 'ডাক্তাব তুমি চা বানাতে পারো?' আমি বললাম, 'তা নিশ্চযই পাবি।' তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 'তাহলে প্রমাণ হয়ে যাক।' আমি জিজ্ঞেস কবলাম, 'চা তৈরির সাজসরঞ্জাম আছে?' তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ হোথা।' যখন আমি চা কবতে যাচ্ছি, তখন তিনি স্নেহভরে উচ্চরবে আমাকে শুধালেন, 'ডাক্তার কিছু মনে কবলে না তো!' আমি বললাম, 'No, no it is with pleasure.' উনি আমাকে স্নেহভরে ধমক দিয়ে বললেন, 'গাড়োল say, it is with fire.'

একবার ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি। বললেন, 'ওহে কবিরাজ কিছু ফেলে যাচ্ছো না তো'? আমি পাশের ঘরে প্রবেশ কবে সবকিছু ভাল করে

দেখে বললাম, 'কিছু ফেলে যাচ্ছি বলে তো মনে হচ্ছে না।' উনি হেসে আমায় শেখালেন, 'ওহে গাড়োলসা গাড়োল, বল I am leaving a part of my heart here.'

শরৎকালেব সকালে আলীসাহেবের প্রতিবেশী বন্ধুর বাসায় বসে চা তেষ্টা মেটাচ্ছিলাম। চা-পান শেষে আড্ডাচুড়োমণি আলী সাহেব আড্ডার স্বাভাবিক হিরো হয়ে উঠলেন। কথায় কথায় হিটলারের কথা উঠল। (সেই সময়ে তিনি হিটলারের বিষয়ে লেখা নিয়ে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন।) কি একটা ডাক্তারী বিষয় জানবার জন্য একটা সংশ্লিষ্ট বই আনতে হঠাৎ তিনি চেযার ছেড়ে তাঁব বাসগৃহের দিকে ধাবিত হলেন। বৃষ্টি পড়ছিল। আমবা সবাই বলে উঠলাম, 'ভিজে যাবেন। ছাতা নিয়ে যান।' কোন কথায কান না দিয়ে তিনি যেতে যেতে বললেন, 'আমি মিছবী না চিনি! যে ভিজে গলে যাব।' অল্পক্ষণেব মধ্যেই তাঁব ঈপ্সিত বইখানি নিয়ে এসে বলে উঠলেন 'যদি আব এক কাপ গবম চা মেলে তবে বৃষ্টি সম্বন্ধে আব একটি নরম-গরম হাস্যমধুব গল্প তোমাদেব শোনাই। তোমরা কি জান যে ইহুদিবা ছাতা কেনে না।' আমবা সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম, 'তা তো জানি না।' 'তবে শোন—(এই গল্পটি এক ইহুদি ভদ্রসন্তান আমায় বলেছিলেন) ইহুদিবা এতই বুদ্ধিমান ও হিসেবী যে তাঁবা বৃষ্টিব ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে হাঁটতে পাবে।'

পুজোব ছুটিতে আলীসাহেব এবং আমবা অর্থাৎ তাঁব ভক্তরা একত্রে কলকাতায আসছি। বোলপুর-হাওড়া ও বোলপুব-শেযালদার বেলওয়ে টাইমটেবিল তাঁর নখদর্পণে ছিল। হিসেব মত আমবা যথাসময়ে স্টেশনে এসে জানলাম যে ট্রেন প্রায ৪৫ মিনিট লেট্ আছে। উনি বললেন, 'চল হে, রেস্টুরেন্টে গিয়ে সময়েব সদ্ব্যবহাব কবা যাক।' আমবা মালপত্রগুলো স্টেশনে বেখে দলপতিকে অনুসবণ করলাম। আমরা চপ্ কাটলেট খেতে শুরু করেছি। এমন সময় একটি হুইশিল্ শোনা গেল। আমাদেব মধ্যে কেউ বলে উঠলেন, 'ওই বোধহয় ট্রেন এসেছে।' অর্ধসমাপ্ত খাদ্যসামগ্রী ফেলে হন্তদন্ত হয়ে প্ল্যাটফরমে এসে অবাক দৃষ্টিতে দেখলাম 'গুড্স্-ট্রেন।' আলী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'ডাক্তার, তোমাদের ডাক্তারী পবিভাষায এটাকে কি বলে?' আমি বললাম, 'এখন মাথায় কিছু আসছে না। খাবারটা ফেলে...।' উনি বললেন,

'ওহে নির্বোধ, একেই বলে False Labour Pain.'

একবার জুলজির এক নবীন অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গেছি। এ-কথা সে-কথার পর আলী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই তেজময় বুদ্ধিদীপ্ত ছোক্‌রাটি কি করে?' বললাম, 'এ আমার ছোটভায়ের মতন। প্রাণীতত্ত্বের লুকোচুরি নিয়ে সাগরদ্বীপে গবেষণা করে এবং কলকাতায় এক নামকরা কলেজে প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করে।' বক্রদৃষ্টিতে উনি শুধালেন, 'হঠাৎ এখানে এসে হাজির কেন?' নবীন অধ্যাপক ভয়ে আড়ষ্ট ও নীরব। আমি বললাম, 'আপনার সাথে পরিচিত হবার আগ্রহে এখানে এসেছে।' উনি বললেন, 'না! না! না' আসল মতলবটা হল এই চ্যাংড়া অধ্যাপকের রিসার্চ সেণ্টারে জন্তু-জানোয়ারের নিশ্চয় কিছু অভাব ঘটেছে। তাই আমাকে দেখতে এসেছে। পছন্দ হয় কি না?'

একবার ঈদ উৎসব উপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী এই অধমের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন অনেক ভাবী ভারী বিষয়ে উভয় গুরুর মধ্যে অনেক গুরু গম্ভীর আলোচনা হয়েছিল। আমরা নীরবে বিদগ্ধ আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। শেষে জ্ঞানী ও পণ্ডিতের মধ্যে কি তফাৎ এই প্রশ্ন উঠতেই আলী সাহেব তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিতো (অর্থাৎ সুনীতিবাবু) আমাদের সামনেই বসে আছেন আর আমি তাদেরই পণ্ডিত বলি যারা পাণ্ডিত্যের ভারে সব কাজ পণ্ড করে দেয়।' সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিবাবু একটি ফার্সী দ্বিপদী আমাদের শোনালেন ঃ

দিল্ বদস্ত্ আওযার কে হজ্জে আকবরাস্ত্
আজ্ হাজারাঁ কা'বা একদিল্ বেহতরাস্ত (মস্‌নবী-এ-রুমী)

অর্থাৎ— 'ভালো ব্যবহারে অপরের মন করিবে জয়
মহান হজের সমান ফল যে তাহাতে হয়।
হাজার হাজার কাবা হইতে জানিও ভাই,
একটি হৃদয় ভাল, তুলনা তাহার নাই।'

একদিন কথায় কথায় ইংরাজী সাহিত্যের কথা উঠল এবং সেই সুবাদে চার্লস ল্যাম্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। চার্লস ল্যাম্ব ইংরাজী সাহিত্যে যে একজন জনপ্রিয় রম্যরচয়িতা সে কথা সর্বজনবিদিত। কলকাতায় অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

অধীনে তিনি একজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল চঞ্চল। প্রবাদ আছে, তিনি স্থিরচিত্তে বসে লিখতে পারতেন না। ঘরের একপ্রান্তে দোয়াত-কলম থাকত এবং অপর প্রান্তের ডেস্কে লেখার কাগজ থাকত। এই দুই প্রান্তের আসা-যাওয়ার ফাঁকে তিনি বাক্য গঠন করে নিতেন। এরপরে আলীসাহেব চার্লস ল্যাম্ব সম্পর্কে একটি 'ছোটিসে ছোটি' সরস ঘটনা বর্ণনা করেন। একদিন ল্যাম্বের উপরস্থ অফিসার শুধালেন, 'ল্যাম্ব তোমার নামে অভিযোগ এসেছে, তুমি নাকি প্রায়শ দেরী করে অফিসে আস?' রম্যরসিক মাথা নীচু করে একটু নীরব থেকে বিনম্রভাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'স্যার! আপনার কাছে এই অভিযোগও কি এসেছে যে, I leave the office earlier?'

প্রথম সাক্ষাতের সময় আলীসাহেব শান্তিনিকেতনের International Guest House-এ আমার Bed and break-fast এর বন্দোবস্ত করেছিলেন। আগের রাতের কথানুসারে পরের দিন সকালে 'ব্রেক-ফাস্ট' খেয়ে ওঁর বাসায় হাজির হয়েছি। আলীসাহেব স্মিতহাস্যে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার প্রাতরাশে কি কি খেয়েছ? আমি সবিনয়ে বললাম, 'অনেক কিছু।' উনি চাপ দিলেন, 'কি, কি?' তখন বাধ্য হয়ে বললাম, 'দুধের সঙ্গে কর্ণফ্লেকস্, চার স্লাইস টোস্ট, পরিমিত মাখন, ডবল্ ওমলেট, জ্যাম, জেলি, একটি ফল ও একপট টী।' উনি এই লম্বা ফিরিস্তি শুনেই আঁৎকে উঠলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শেলফ্ থেকে একটি বই বার করতে করতে স্বগতোক্তি করলেন, 'এইজন্যেই ডাক্তাররা মরে না।' (পরে আলীসাহেবের নির্দেশানুসারে এই মেনু তৈরি করা হয়েছিল।)

একদিন আলীসাহেব হাজরা রোডের বিয়ে বাড়ির মজলিসে বসে খোসমেজাজে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আড্ডা শেষে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে এখনও দাগ কেটে আছে।

বেশকিছু নতুন আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে শাশুড়ির সঙ্গে জামাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। শ্যালক শ্যালিকারাও বাদ যায় নি। শ্যালকরা নানারকম ফোড়ন কাটছে ও শ্যালিকারা শালিক পাখির মত কিচির মিচির করছে। শাশুড়ির সঙ্গে প্রথম আলাপের পর চাটুজ্জে জামাই মুখুজ্জে শাশুড়িকে দুম করে শুধালেন, 'আপনি কিছুক্ষণ আগে জলে পড়ার কোন শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি?' শাশুড়ি

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। জামাই খুলে বললেন, 'অগ্নি সাক্ষী করে এই যে আপনি আপনার মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন, তার কি কোন আওয়াজ শুনতে পান নি?' (শাশুড়ি প্রসঙ্গে দাদাঠাকুরের একটি কথা মনে পড়ছে। দাদাঠাকুর বললেন, 'বাবা, শাশুড়ি মানে জানো কি?' আমরা বললাম, 'অভিধান দেখতে হবে।' উনি বললেন 'অভিধানে পাবে না। শাশুড়ি মানে হচ্ছে যাকে দেখলে শ্বাস উড়ি উড়ি করে।')

একদিন ডাক্তারদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে আলীসাহেব বলে উঠলেন যে, যত বড় ডাক্তার তার হাতের লেখা তত জঘন্য। সেই সূবাদে একটি বিদেশী গল্পও শুনিয়ে দিলেন। একদিন এক ফরাসী সুন্দরী তন্বী গট্‌মট্ করে দোকানে ঢুকে সোজা বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারের কাছে চলে গেলেন। তার সঙ্গে নিভৃতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করার পর খুশিতে ডগ্‌মগ্ হয়ে আরও দ্রুতপদক্ষেপে চলে গেলে দোকানের মালিক কম্পাউণ্ডারকে শুধালেন, 'কি ব্যাপার? মেয়েটি এল এবং গেল। কোন ওষুধ কিনল না?' কম্পাউণ্ডার চশমাটি নামিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'স্যার আমাদের পূর্বতন খ্যাতনামা ডাক্তার এই মেয়েটিকে একটি billet doux (love letter) লিখেছে। কিন্তু ডাক্তারের হাতের লেখা এমনই বদ্‌খত যে উক্ত চিঠির পাঠোদ্ধার করতে না পেরে আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়।'

আলী সাহেব একদিন এককভাবে আমাদের বাসায় খেতে এলেন। খাওয়া দাওয়ার শেষে বিদায় কালে দোর গোড়ায় আমরা উভয়েই দাঁড়িয়ে আছি। সেইসঙ্গে আমার স্ত্রীও; স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন বলবে অনেক কষ্ট দিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। তার উত্তরে আমি আগে ভাগে বলি, আবার এরকম কষ্ট দাও।' এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা হাসপাতালে ইভনিং রাউণ্ড দেবার সময় যেমন রুগীদের চিকিৎসা বিষয় সংক্ষেপে লেখো 'repeat', আমিও বলি ডাক্তার : Repeat the same course.'

একদিন সন্ধ্যায় বৈঠকি আড্ডায় তাঁর সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে। এমন সময় পাঁচফোড়নের গন্ধ নাকে এবং শিল-নোড়া ঘষার আওয়াজ কানে এল। ভোজন রসিক আলীসাহেব চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওহে বৎসগণ! আজকে তোমাদের খাওয়া প্রসঙ্গে 'নোড়ার গল্প' শোনাব। এক বেহিসেবি

বন্ধুপ্রিয় লোক প্রায়ই বিনা-নোটিশে, সময়ে-অসময়ে বন্ধু নিয়ে এসে হাজির হতেন এবং খাইয়ে ছাড়তেন। স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে মনে মনে একটি ফন্দি আঁটলেন। গৃহস্বামী বন্ধুকে ঘরে বেখে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। গৃহ পত্নী মশলা পিষতে শুরু করেছিলেন এবং অতিথির সাথে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতিথি লক্ষ্য করলেন বন্ধুপত্নী সরবে কাঁদছেন। অতিথি এই অবস্থায় বারবার তাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কান্নার হেতু কি? আমি কোন উপকারে আসতে পাবি কি না?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেশ কিছুক্ষণ পরে মহিলা মুখ খুললেন এবং বেদনাতুর স্বরে যা বললেন তা রোমহর্ষক যেমন, 'পঞ্চব্যঞ্জন সহকাবে অতিথি সৎকারের পর গৃহস্বামী নোড়াটি অতিথির মুখে পুবে দেন। এটিই তার আনন্দ।' আসন্ন বিপদের কথা স্মবণ করে ভীত, সন্ত্রস্ত অতিথি ত্রস্ত পদে প্রস্থান করতে উদ্যোগী হলেন। এমন সময় গৃহস্বামী বাজার থেকে ফিরছিলেন। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে বিমূঢ় গৃহস্বামী শুধালেন, 'কি ব্যাপার?' ক্রন্দরবতা গৃহকর্ত্রী জবাব দিলেন, 'উনি হঠাৎ আমার কাছে নোড়াটি চেযেছিলেন।' কথাটি শোনামাত্রই অতিথি-বৎসল গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ নোড়াটি হাতে নিযে উচ্চরবে বলতে লাগলেন, 'আপনি নোড়া নিযে যান, নোড়া নিয়ে যান।' অতিথি বিপদেব সত্যতা সম্বন্ধে confirmed হয়ে দৌড়ে প্রাণ বাঁচালেন।

বাংলাদেশ হওযাব পব আলীসাহেব এবং আমরা আগে পিছে ঢাকায গেলাম। আলীসাহেব আগেই পৌঁছেছিলেন। আমি আমাব বড় ভাযেব সঙ্গে আলীসাহেবের বাড়িতে সাক্ষাৎ কবতে গেলাম। দেখা হওয়া মাত্রই আমাকে সম্ভাষণ কবে বললেন, 'আজকেই খববেব কাগজে দেখলাম কলকাতা থেকে কযেকজন গুণ্ডা বিতাড়িত হযেছে এবং তুমি তাব মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছ'। এরপবেই স্নেহ ভবে বললেন, 'ডাক্তাব তোমরা সপবিবাবে একদিন খেতে এস।' পরিপাটিভাবে খাওয়া দাওযাব পরে জোৎস্নারাতে উনি আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুটা পথ এগিযে দিতে এলেন। আমরা বাববাব বলছি, 'আপনাকে আর আসতে হবে না।' কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। তিনি শেষকালে আমাদের শুনিয়ে দিলেন, 'আমি আমাব বন্ধুদের ঠিক সেই পর্যন্ত এগিযে দিয়ে যাই যেখান থেকে তাদের ফিবে আসার আর সম্ভাবনা থাকে না।' এরপর তিনি একদিন ঢাকায় আমার দাদার বাড়িতে খেতে এলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হওয়াব পর উঠি উঠি ভাব কবছেন, এমন সময় আমার কিশোরী ভাইঝি অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে এসে হাজির। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনিও প্রসন্ন

মনে বলে উঠলেন ঃ

'এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা,
খাও তবে কচুপোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।'

বলেই তিনি পবিত্র কোরান-শরীফে যে কয়েকটি পংক্তি প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই কয়টি আরও সুন্দরভাবে আরবী হরফে লিখে দিলেন, যার বাংলা সারাংশ হল ঃ 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকেব নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তবিন্দু হতে, ঘোষণা কর তোমার প্রতিপালক অতি দানশীল, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা মানুষ জানত না।' এরপর তিনি উঠি উঠি ভাব কবছেন। আমবা বললাম, 'বাড়ি ফিববেন?' উনি মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যাকবণে ভুল কবো না। আমি ভবঘুরে, আমার কি বাড়ি আছে? বলতে পাব, বিবিব বাড়ি যাচ্ছি।' আমরা সবাই মিলে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম।৮

এবং সেইটিই আমাদেব শেষ সাক্ষাৎ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর স্মৃতি

পরিমল গোস্বামী

এগারোই সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। চিন্তা করছিলাম অনাদি দস্তিদারের কথা। ভাবছিলাম ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীর এক খড়ের দোতলা ঘরে আমরা একসঙ্গে যারা ছিলাম, তাদের মধ্যে শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায় পূর্বে মারা গেছেন। সম্প্রতি অনাদি দস্তিদারের মৃত্যু ঘটল। একই গৃহবাসী বেঁচে রইলাম আমরা তিনজন—অনিলকুমার চন্দ, সৈয়দ মুজতবা আলী ও আমি। ৬টায় ইংরেজী সংবাদ শুনব, একটু আগে রেডিও চালিয়েছি—বাংলা সংবাদে হঠাৎ কানে এলো ঢাকা শহরে সৈয়দ মুজতবা আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

আমার চিন্তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। এ রকম আকস্মিক যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। অনেককে বলেছি এ-কথা।

সৈয়দ মুজতবা আলী এক পাশে, অনিলকুমার চন্দ একপাশে। মাঝখানে আমি: বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র। এখন ঐ ঘরের বাকি রইলাম দু'জন।

মুজতবাকে নিকট দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ ঐ সময়ে এসেছিল। ক্রমাগত কথা বলায় বেজায় পটু ছিল সে। তাই আমি বহুদিন আগে একস্থানে লিখেছিলাম দু'জন কথাশিল্পীর মাঝখানে আমি স্যানড়ুইচ হয়ে ছিলাম। মুজতবা আলী কলমে কথাশিল্পী, মুখেও, আর অনিলকুমার চন্দ এম. পি রূপে পার্লামেন্ট অধিবেশনে কথাশিল্পী রূপে পরিচিত।

তখন সে আমার একখানা খাতার প্রথম পাতায় নানা হরফে নিজের নাম লিখেছিল তা আজও আমার কাছে আছে। ইংরেজি, উর্দু, হিন্দী এবং বাংলায় সব দিকে তার একটি চাঞ্চল্য ছিল। সব দিকে আত্মপ্রকাশের আকুলতা। আমার অপেক্ষা সে সাত বছরের ছোট ছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যে অনেক বড়।

বহুদিন পরে আবার আমাদের দেখা—সে যখন কলকাতা রেডিও স্টেশনের

ডাইরেক্টর হয়ে এলো। তার আমন্ত্রণে সেইখানেই আমাদের মিলন। কিন্তু তখন তার কথার স্পীড এত বেশী বেড়ে গেছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত মনে হয়েছিল। এরপর থেকে চিঠি লেখার পালা আরম্ভ হল। তার অনেক চিঠি আছে আমার কাছে। তিন চারখানা পত্রস্মৃতিতেও প্রকাশ করেছি। তার একটি মাত্র লেখা আমি ম্যাগাজিন এডিটর থাকাকালে 'যুগান্তরে' পূজা সংখ্যায় (১৯৫৪) ছেপেছিলাম। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে লেখা, তা নিয়ে কিছু মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে রচনা, তাই তার নাম সে দিয়েছিল 'হরিনাথ দে স্মরণে'। বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে-কে স্মরণ করে তার রচনা, সে রচনায় হরিনাথ দে-র নামও ছিল না, সে সুযোগও ছিল না। কিন্তু কয়েকজন পাঠক ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন হরিনাথ দের কথা নেই, একদম ফাঁকি।

১৯৬৪ সনে মুজতবা আলীর একটি বেতার ভাষণের বিরুদ্ধে এক চিঠি ছাপা হয় 'যুগান্তরে'র বেতার-আলোচনা বিভাগে। এই উপলক্ষে আমি তখন তার পক্ষ সমর্থনে দাঁড়াই। সে সময় মুজতবা আলী আমাকে লেখে (৭-১১-৬৪) "তোমাকে মারবে তবে প্রশ্ন তোমাকে কি আর মারটার হওয়ার লাকসারি এনজয় করতে দেবে?

"গুরুদেবকে বিচক্ষণরা যখন সাবধান করলেন তাঁর 'সভ্যতার সংকট' বেরোবার পর---ইংরেজ জেলে পুরে দেবে, তখন তিনি বললেন প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি, বিশ্বকবি---সবই হয়েছি। এখন শুধু বাকি শহীদ হয়ে মরার সম্মান। ইংরেজ কি সে লাকসারি আমাকে জেলে মরে ভোগ করতে দেবে?"

১৯৬০ সনে ৩রা মার্চ লিখছে 'পট্-বদলার না লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক বই লেখার বাসনা ছিল। বছর তিনেক লাগত। ততদিন খাব কি? তাই অবসর সময় 'পূরবী'র একটি টীকা লিখছি। বিপদ হয়েছে সাধারণ পাঠক কতখানি রবীন্দ্রনাথ বোঝে তার স্ট্যাণ্ডার্ড ধরতে পারছি না। বাংলায় এম এ. পাস ছোকরার কবিতা বোধ শকতি দেখে তো নিরাশ হতে হয়।"

এই জাতীয় কাজের কথা আর অকাজের কথায় ভরা কত চিঠি।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১, সে এসেছিল আমার কাছে—নার্সিং হোম থেকে ডাক্তারের গাড়িতে। প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল। এবং তার এই আসা নিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটে ছিল। গাড়ির পিছনে ইংরেজিতে 'ডক্টর' লেখা

এবং যদিও মুজতবা আলীও 'ডক্টর', তবে সে ডাক্তার তো নয়। ডাক্তার মার্কা গাড়িতে আমার দরজায় এতক্ষণ ডাক্তারেব অবস্থান দেখে আমি ভীষণ অসুস্থ মনে কবে অনেক প্রতিবেশী পবে আমার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ তাব যাবাব সময তাকে দেখে কাজী নজরুল ইসলাম মনে কবেছিলেন।

মুজতবা সেদিন আমাকে তার পূর্ববঙ্গেব ভাষা বিষযক বইখানি উপহাব দিযেছিল কিন্তু তাব উপহার পৃষ্ঠায যা লেখা ছিল তা ছাপা বিপজ্জনক। আমাদেব মধ্যে বিশেষ প্রীতিব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই তাব হঠাৎ মৃত্যু আমাকে বেদনার্ত কবেছে—ঠিক যেমন আমাব অন্যতম স্বগৃহবাসী অনাদি দস্তিদাবের হঠাৎ মৃত্যু কবেছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

নির্মল সেনগুপ্ত

আমি সৈয়দ মুজতবা আলীকে প্রথম দেখি দিল্লিতে। দিল্লিতে অল ইণ্ডিযা রেডিওব একটি বিভাগ আছে, তাব কাজ দেশ-বিদেশেব রেডিও শ্রোতাদেব কাছে ভাবতেব বক্তব্য পৌঁছে দেওযা। যে সমযেব কথা বলছি, তখন এই বিভাগেব ডিবেক্টব ছিলেন মেহবা মাসানি। তাঁবই আপিসে, ১৯৫০-৫১ সালের কোন এক প্রান্তে আমি মুজতবা আলীকে দেখি।

প্রথম দর্শনে বুঝিনি ইনিই তিনি। শ্রীমতী মাসানি আমাকে আলাপ কবিয়ে দিলেন তাঁব আপিসে উপবিষ্ট একজন ভদ্রলোককে, 'ইনিই ডক্টব আলী।'

তিনি যে বাঙালী তাও বুঝিনি। এক সময়ে শ্রীমতী মাসানি কোন কাজে বাইরে গেলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমাব নাম মুজতবা আলী।'

আমি বোধহয আবেগেব আতিশয্যে চেয়াব থেকে প্রায লাফিয়ে উঠেছিলাম। কাবণ—

—যুদ্ধের সময আমি প্রায দশ বছব ছিলাম একটি ব্রিটিশ ইউনিটে। তার মধ্যে বেশ কিছুদিন ছিলাম বিদেশে। দেশে ফিরে আমি আমাব বোন পূর্ণিমাকে বলেছিলাম যে আমি বছব দশেক ভাষাব দিক থেকে নির্বাসনে থেকেছি, এবার অবাধে বাঙলা পড়তে ও শুনতে পাবি। এতদিন কথাবার্তাও হয়নি মাতৃভাষায়। সুতবাং আমার এখন একান্ত প্রয়োজন কযেকখানি ভালো বাংলা বই পড়া।

পূর্ণিমা আমাকে ন'দশখানা বাংলা বই কিনে দেয়। তাব মধ্যে ছিল 'দেশে-বিদেশে'। সব ক'টি বই-ই ভালো ছিল। কিন্তু, আমি সবচেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম 'দেশে-বিদেশে' পড়ে।

তাই সে অবিস্মবণীয বইযেব লেখককে হঠাৎ জলজ্যান্ত দেখে আমি উল্লসিত হযে উঠেছিলাম। বলে ফেললাম, 'দেশে-বিদেশে'?

সৈয়দ মুজতবা আলী বললেন, 'চুপ্! চুপ!' পবে বুঝেছি কারণটা নিছক

বিনয় নয়। এত লোক ওঁর এই বই পড়ে ওঁর fan হয়েছে যে তাঁদের স্তবস্তুতির প্রাবল্যে উনি বিব্রতই হয়ে পড়তেন।

একদিন কী একটা কাজের সুবাদে কলকাতায় মিত্র-ঘোষ কোম্পানিতে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। এই সময়টুকুতেই একজনের পর একজন এসে বই চাইল 'দেশে-বিদেশে'—মিনিটে প্রায় একজন করে। তখন বুঝলাম, কী ঝক্কি পোয়াতে হয় গুণকীর্তনপ্রিয় বাঙালির আক্রমণে বেচারি লেখককে।

শ্রীমতী মাসানি ঘরে ফিরে এলেন। কথা আর এগোল না। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলো ওঁর দিল্লীর তখনকার কনস্টিটিউশন হাউসে। এ সবাইটি অধুনা লুপ্ত। এর পত্তন হয়েছিল সম্ভবত যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে। এই একতলা সারির পর সারি ঘরের সমাবেশ করা হয়েছিল সৈন্য এবং সামরিক কর্মচারীদের একটা ডেরা খাড়া করবার জন্য। পরে যখন দেশ স্বাধীন হলো, দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা আবশ্যক হয়ে উঠল, তখন এই বাড়িটি হল কনস্টিটিউশন হাউস, যেখানে সংবিধান রচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা জমা হতে পারেন। থাকতেও পারেন।

কনস্টিটিউশন হাউস সংবিধান রচনার কাজ শেষ হতেই ভেঙে দেওয়া হয়নি। এখানে ১৯৪৭ সালে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স হয়েছিল। তখনই বাড়িটিকে প্রথম দেখি। ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুতান শাহ্‌রীয়েরের সহচর হয়ে। শাহ্‌রীয়ের এবং সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরাও এসে থেকেছেন এই বাড়িতেই।

১৯৫০-এ এই বাড়িটি হলো নানা মানুষের, নানা কাজে ও প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি সঙ্গমস্থল। 'মুসাফির' এবং 'স্থায়ী' দুরকম বাসিন্দাই এখানে আশ্রয় নিতেন এবং এর খাবার হলঘরে খেতেন।

এইখানেই আবার দেখা আলীসাহেবের সঙ্গে। সৈয়দ সাহেব এখানে প্রাতরাশ সারতেন, আমিও। আমি প্রাক্তন সৈনিক, যেখানে যে যা খেতে দিয়েছে তাই খেয়েছি। কিন্তু মুজতবা আলী খাদ্যরসিক। তিনি প্রাতরাশ মুখে দিতে দিতে বলতেন বিবিধ কটুবাক্য। পরে জেনেছি যে উনি সারাজীবন খাদ্যবিচার করেছেন তাঁর মায়ের হাতের খাবারের মানদণ্ড দিয়ে। কী সাধ্য কনস্টিটিউশনের

পাচকমণ্ডলীর মানের বিচারে সেই শিখরের কাছাকাছি পৌঁছয়।

একই টেবিলে বসতাম রোজ মুজতবা আলী সাহেবের সঙ্গে। আরও লোককে তিনি ডেকে নিতেন গল্প করবার জন্য। কোনও বোঝার উপায় ছিল না, যাকে তিনি ডাকছেন, তার সঙ্গে তাঁর আলাপ দু'দিনের না জন্ম-জন্মান্তরের। কত কথা শুনতাম, তার কোনও সীমা-সংখ্যা নেই। কখনও কথা উঠত কারওয়ারের-সেবানে দেখা সূর্যাস্তের। কখনও শান্তিনিকেতনে মোহনবাগান টিমের সঙ্গে বিশ্বভারতীব ফুটবল খেলার কথা। এবং সেই সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়েব স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ফুটবল খেলার প্রতি অনুবাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত—রুশ বগ্‌দানফ্ ও ইংরাজ কলিন্সের সম্পূর্ণ বিপবীত মনোভাব—তার উল্লেখ। এক কথা দুবার শোনা যাযনি।

এখানে থাকাকালীন আমাব চাকুরী জীবনেব একটি বদলি হলো। যখন আলীসাহেবের সঙ্গে দেখা হলো, ঠিক তাব আগেই আমি ছিলাম কবাচিতে—পাকিস্তানের ভারতীয দূতাবাসে। সেখান থেকে আমি এলাম অল-ইন্ডিযা বেডিওতে। পবম সুখে বইলাম তাতে—গান-বাজনা, নাটক, গদ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং প্রচুব স্বাধীনতা।

--সেখান থেকে এলাম অর্থদপ্তবেব এক বন্দীশালায। আমাব কাজ হলো সবকারের যাবতীয নিযম আত্মস্থ করা এবং নানান দপ্তরের ফাইলে ফতোযা জাবি করা।

আপিসখানাও সেইবকম। চাবতলাব উপব ছোট্ট কুঠবি—তাতে শুধু আছে সরকাবি নিয়মাবলী। জীবন দুর্বিষহ হযে উঠল।

একদিন সকালবেলায় মুজতবা আলী বিবসমুখে বললেন, 'কলকাতায় যখন ছিলাম, কাগজে কলম ঠেকাতেই তবতব কবে লেখা বেবিযে আসত। আব এখানে? সবই শুকিয়ে যায, মাথা খুঁড়লেও হাত দিযে লেখা বেবোয় না।'

আমি বললাম, 'বলেন কী? আমার তো হাত নিশপিশ করে লিখতে।'

'বটে!'

আমি বললাম, 'আপিসে বসে বাশি রাশি ফাইলে এমন সব মন্তব্য করা—যা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অবাক হয়ে ভাবি কী কবে শিক্ষিত মানুষ এইসব নিয়ম বুঝে না বুঝে মেনে চলে, কলম পিষতে পারে! ভাবি, চিৎকার করে বলি, বা

লিখি—শতাব্দীর দাসত্বে মানুষ হারিয়েছে তার স্বভাবদত্ত বিচার-বুদ্ধি আর তাদের স্বভাবজ বৃত্তি।'

মুজতবা আলী বললেন, 'বেশ বেশ, লিখে ফেলুন না যা প্রাণ চায়—'

সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম লিখতে, 'আমরা দিল্লিবাসী'। আলীসাহেব পড়ে বললেন, 'লিখেছেন সরকারি দপ্তরে বর্ণাশ্রমের কথা। একটু বুঝিয়ে লিখুন 'ওটা কী ব্যাপাব'।

লিখলাম। আলীসাহেব পড়ে বললেন, 'হুঁ! এব একটা নামকরণ দবকার। 'দিল্লি কা লাড্ডু' কেমন? আবও লিখুন।'

আরম্ভ কবলাম লিখতে ব্রহ্মার কাছে কীটপতঙ্গের ডেপুটেশন। আলী সাহেব পড়ে নাম দিলেন 'ব্রহ্মার্গুলা সংবাদ'।

তারপর দুটি লেখা পাঠিয়ে দিলেন 'দেশ' পত্রিকায় সাগবময় ঘোষেব কাছে। দুটি লেখাই বেবোল ওই পত্রিকায়।

★ ★ ★ ★ ★ ★

এবপর আবাব হলো বদলি। এবার কলকাতায়। মুজতবা আলীও এলেন কলকাতায়। দেখা কবতে গেলাম পার্ল বোডে।

অসংখ্যবাব দেখা হয়েছে আলীসাহেবেব সঙ্গে। যত কথা হয়েছে—অবশ্য আমি শ্রোতাই থেকেছি—কথা শুনেছি। তাব শুধু বিষয়গুলি উল্লেখ কবলেই একটা অভিধান হয়ে যায়। এইসব কথাব কিছু কিছু লেখা হয়ে কাগজে বেবিয়েছে, কিন্তু সেটা সমগ্রেব অতি ক্ষুদ্র অংশ।

আমি লিখতাম—তবে অত ঘনঘন নয়। মাঝে মাঝে লেখা আমার মনঃপুত হতো না। আলী সাহেব বলতেন, 'কী হলো? ওৎবালো না? নাই বা হলো। লিখে যান।'

তারপব লেখা বন্ধ হয়ে গেল। আলীসাহেব জিগ্যেস কবলেন, 'কী ব্যাপাব?' আমি বললাম, লেখা বেবোচ্ছে না।'

মুজতবা বললেন, 'হুঁ, তা হলে অনুবাদ করুন। আমি জোগাবো আপনাকে তাব বসদ।'

কিছুদিন বাদে পাঠালেন, 'চেকভ্-এর একটি গল্প। আমি লেগে গেলাম তার তর্জমা করতে। সৌভাগ্যক্রমে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হলো—তিনি

রুশভাষা খানিকটা জানেন। এবং বরাতক্রমে ঐ গল্পটাও তাঁর সংগ্রহের মধ্যে আছে। রুশ ভাষায় গল্পটার নাম 'দুশেচ্‌কা'।

'দুশেচ্‌কা' নামের মানে ও ধ্বনি অনুসরণ করে আমি আমার অনুবাদের নাম দিলাম 'দুলালী'। আলী সাহেব লেখাটা এবং নামটা দেখে খুশি হলেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়ান! চেকভের এই গল্পের একটি সমালোচনা করেছেন তলস্তয়। অনবদ্য। সেটিও তর্জমা করে গল্পটির সাথে একসাথে ছাপতে দিতে হবে।'

এ সমালোচনার ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ করতে গিয়ে আমাকে কেরী সাহেবের শরণাপন্ন হতে হল। তল্‌স্তয়ের সমালোচনায় বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ রুচিসম্মত নয়। তাই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে কেরী সাহেবের বাইবেলের অনুবাদ ধরে ধরে উদ্ধৃতির ভাষান্তর করা হলো।

আলী সাহেব দুটিই ছাপালেন তাঁর একটি লেখার মধ্যে। লেখাটি 'কবিরাজ চেকভ'।

শরীরের একটি ব্যাধি চাকরির কঠিনের চাপে হাত পা ছড়িয়ে দাপাদাপি করতে পারেনি। চাকরির অবসানের ফলে সেটি প্রবল হয়ে উঠল। কিছুদিন কাটল হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার অল্পদিন পরেই আলীসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমীর আলী অ্যাভিনিউ-এ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে।

মুজতবা আলী প্রথমেই প্রশ্ন করলেন লেখা প্রসঙ্গে। আমি বললাম শারীরিক অসুস্থতার কথা। সেটা সেরেছে, কিন্তু মন তখনও সুস্থ হয়নি। মনে হয় যেন কোনকিছুর সঙ্গেই আমার আর কোন যোগ নেই। আমি ত্রিশঙ্কুর মতো ভাসছি স্বর্গ-মর্ত্যের সান্নিধ্য-বর্জিত অন্তরীক্ষে।

আলী সাহেব শুনে অবাক হলেন। বললেন, 'এরকম অবস্থা আপনার হলো কেন?'

খানিক ভেবে বললেন, 'পড়ুন, একখানা বই।' বইটি 'Last days of Hitler'।

আমি এখনও জানিনা কেন উনি এই পুস্তিকাটি আমাকে পড়তে দিলেন।

উনি কি জানতেন যে ১৯২৯ সালে মিউনিখ শহরে নাৎসী তৈরির আয়োজন দেখা থেকে শুরু করে আমি উগ্র ফ্যাসিবাদবিরোধী এবং সোচ্চার।

হিটলারকে চাক্ষুষ দেখিনি, তবে তার গুণ্ডাবাহিনী—বেকার যুবজনকে উর্দি পরিয়ে পাখিপড়া শিখিয়ে তৈরি—তাদের বার্লিনে হৈ হল্লা করতে দেখেছি ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে। যুদ্ধে আমি যোগ দিয়েছিলাম। যুদ্ধটা ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদ এবং জাপানি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বলে। অতএব বইখানা আমি নিলাম এবং প্রায় একদিনেই শেষ করলাম।

তারপর পর পর একখানার পর একখানা বই দিতে লাগলেন ফ্যাসিজমের হোতাদের উত্থান ও পতনের বিবরণ দিয়ে।

আমার ক্লৈব্য দূর হলো। লেখা বেরোতে লাগল।

★ ★ ★ ★ ★ ★

দুঃসময়ে দেখেছি মুজতবা আলীকে। ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে সামরিক গুণ্ডামি শুরু করল। তার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধও আরম্ভ হলো। মুজতবা আলী তখন কলকাতায়, তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলে বাংলাদেশে, পূর্ব পাকিস্তানে। কোন খবর আসছে না তাদের। আলী সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত।

প্রথম খবর এল, বিদেশ ঘুরে। এদেশ থেকেও চিঠি যায় বিদেশে, ওদেশ থেকেও যায়। অতএব ঢাকা থেকে কলকাতায় চিঠি আসে বিদেশের বুড়ি ছুঁয়ে। তাছাড়াও মুক্তিসেনারা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকরা, উদ্বাস্তু-শিক্ষক-ব্যবসায়ী তাঁরাও এলেন এদেশে। সুতরাং খবর পাওয়া যেতে আরম্ভ করল।

এই সমস্ত সময়টা আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, অজস্র কথা শুনেছি, কখনও কখনও বেলা ন'টায় তাঁর ঘরে গিয়ে ফিরেছি সন্ধের মুখে। আগের মতোই আমি থেকেছি শ্রোতা।

একদিন খেদোক্তি করলেন, 'আমার গবেষণার বিষয় ধর্ম। পড়তে গিয়ে বুঝেছি ধর্ম শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, তার চর্চাও ধর্ম, এবং সেই ধর্মপালনের মধ্য থেকেই চেনা যায় সেই ধর্মকে যা লোকসাধারণের ব্যবহারের। নিয়ামক তাই আমি শুধু কোরাণ শরীফই পড়িনি, ইসলামী দেশ—যেমন মিশর দেখেছি। তার লোকের আচার আচরণ নিষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। গেছি ইজরায়েলে—

তাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমি জেনেছি বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত 'কালে'র কাছে। তাদের আচরণ দেখেছি ইজরায়েলে।

আর হিন্দুধর্ম তো এইভাবে দেখেইছি। তার নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মেরও প্রকাশ দেখেছি শান্তিনিকেতনে। খ্রীষ্টধর্ম দেখেছি জার্মানিতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে।

অথচ ধর্ম সম্বন্ধে এই দৃষ্টি দিয়ে প্রামাণিক একখানা বই লিখলাম না, সারা জীবন ভাঁড়ামি করেই কাটালাম।'

★ ★ ★ ★ ★ ★

শেষবার দেখেছি মুজতবা আলীকে ঢাকায়, বাংলাদেশ হবার পরে তাঁর নিজের বাড়ি ধানমুণ্ডিতে। স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত। আমার সঙ্গে ছিল একজন ফরাসি শিক্ষক। তার সঙ্গেও তিনি গল্পগুজব করলেন। হাতে সময় ছিল না। তাই বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি।

ভালোই হয়েছে যে এরপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন শুনলাম তিনি অসুস্থ, তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর তাঁর মৃত্যুসংবাদ বেরোল খবরের কাগজে।

রইল দেশেবিদেশে অসংখ্য মানুষের মনে তাঁর স্মৃতি। যারা তাঁকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে, তারা তাঁকে ভুলবে কেমন করে? এখানে সেখানে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠবে তাঁর টুকরো টুকরো স্মৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী প্রসঙ্গে

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদী রসরচনা স্রষ্টা সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছে প্রথম যাই ১৯৬০ সালে। সেই প্রথম কাছ থেকে দেখা, আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। অবশ্যই প্রকাশনার সূত্রে। সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যাপারে। প্রথম আলাপের জায়গা ৪২-এ হাজরা রোডে, 'নিরালা' বাড়িতে। প্যারীবাবুর বাড়ি। যাঁর কথা আলী সাহেব তাঁর একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছেন। পরে প্যারীবাবুর ছেলেদের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, তবে সে অন্যসূত্রে।

আলী সাহেবের কাছে তারপর অনেকবার গেছি। কখনও বোলপুরে প্রয়াত মটুবদার বাড়িতে এবং নিচুভাঙ্গায়, অথবা কলকাতায় ৫নং পার্লরোডে। কতবার তার আর হিসেব নেই। কলেজস্ট্রীটে বড় একটা আসতেন না। তবে একবার এসেছিলেন মনে আছে। একেবারে খাঁটি সাহেবী পোশাকে।

আলী সাহেবকে আমি দেখতাম গুরুজনের মতো। কাকার মতো। তবে কখনও সম্বোধন করি নি। মনের মধ্যে সমীহ ভাব থাকার জন্যেই। ঘরের বাইরে থেকে নিজের উপস্থিতি জানান দিলেই কিন্তু উদাত্ত আহ্বান আসতো, আরে এসো এসো ব্রাদার, আস্তেজ্ঞে হোক।

চিঠিতেও লিখতেন ভাই ভানু রায় বা ভাই ভানুমিঞা সম্বোধন করে। আমি কিন্তু কোনদিনই দাদা বলতে পারি নি। ঐ যে বলেছি, লেখা পড়েই হোক অথবা তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির জন্যেই হোক, মনের মধ্যে সমীহ ভাব থেকেই গিয়েছিল।

আমার মধ্যে সমীহ ভাব থাকলেও উনি কিন্তু আপন করে নিয়েছিলেন। বোলপুরে গিয়ে পড়লে তো তাঁর সম্পূর্ণ অধিকারে গিয়ে পড়তুম। বাড়ি পৌঁছনো থেকে সন্ধের ররাউনী ডাউন এক্সপ্রেসের সময় পর্যন্ত অনর্গল আড্ডা। আড্ডায় ওঁর নিজের কথাই অর্থাৎ উনি বলতেন প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় জুড়ে। একটা প্রসঙ্গ উঠলেই তার থেকে শাখা-প্রশাখায় কত যে প্রসঙ্গ উঠে

আসতো তার ইয়ত্তা নেই। আর জানতেনও কত বিষয়ে—ধর্মশাস্ত্র থেকে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে ইতিহাস, ভূগোল এমন কি কোথায় ভাল ধান, ভাল সুপুরী, কোথায় কোন্ খাবার বা মাছ ভাল পাওয়া যায় সব। অথচ আমি তো দেখেছি—নিজের ঘর থেকে বেরোতে তাঁর কি পরিমাণ আলস্য।

বোলপুরে প্রথম ওঁর কাছে যাওয়া আজও মনে পড়ে, ছবির মতো। তখন তাঁর স্ত্রী মিসেস রাবেয়া আলী এবং দুই পুত্র ফিরোজ ও কবীর ওঁর কাছে। আমরা যেতেই সহর্ষে ডাকলেন চেঁচিয়ে—বৌ, বৌ, দেখ কারা এসেছে। আলাপ করিয়ে দিলেন আমাদের সঙ্গে।

ফিরোজ ও কবীর তখন খুব ছোট। আমাদের বললেন—ছেলেরা আমার খুব বাধ্য। দেখবে?

বলেই ফিরোজকে বললেন—ফিরোজ, আমার পা-টা একটু টিপে দে তো।

ফিরোজ আমাদের সামনেই বাবার পা টিপতে বসে গেলো।

আমাদের বললেন—যাওয়ার আগে ফিরোজকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতন ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখো।

ফিরোজ বলেছিলেন—দাদা, শান্তিনিকেতনে আর শান্তি নেই এখন। শুধু নিকেতন।

ঐ টুকু ছেলের মুখে এই কথা শুনে আমরা, এমনকি আলী সাহেবও খুব হেসেছিলাম। কিন্তু আজ কথাটা মর্মান্তিক সত্য।

আলী সাহেবের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একদিন সকালবেলা গিয়ে পড়েছি পার্ল রোডের বাড়িতে। সাড়ে দশটা নাগাদ। আড্ডা দিতে দিতে বেলা ১টা। ওঠার তো উপায় ছিল না। প্রথমবার উঠি বললে বলতেন, ব্রাদার আর একটু বোসো।

দ্বিতীয়বার বললে বলতেন, দ্যাখো অতিথির ভদ্রতা হচ্ছে গৃহস্বামীর কাছে অন্তত তিনবার ওঠার অনুমতি নিতে হবে। সুতরাং আর একটু বোসো।

যখন ওঠার অনুমতি পেলাম, উঠতে গিয়ে দেখি এক প্রকাশক বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র। বললাম, এই শ্রাদ্ধ তো আজকে, কখন যাবেন?

ওঁর ব্যাপারটা মনেই ছিল না। চিঠিটা দেখাতে 'ইস্' বলে জিজ্ঞেস করলেন, না গেলে অন্যায় হবে, না?

আমি বললাম, বিয়ে বা আনন্দানুষ্ঠানে না গেলে দুঃখপ্রকাশ করে জানাতে

বাধা নেই। তবে পিতৃশ্রাদ্ধে বা মাতৃশ্রাদ্ধে যাওয়া উচিত, দায়-উদ্ধারের ব্যাপার তো আছে একটা।

আলী সাহেব আবারও বললেন, মুস্কিল, সকাল থেকে যে একটু বে-এক্তার আছি। আচ্ছা দেখি।

মুখ-টুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠে পড়লেন শ্রাদ্ধবাসরে যোগ দিতে। তখনও শ্রাদ্ধের কাজ কিছু বাকি।

উনি গিয়ে বললেন, আমি তো মুসলমান, তা আপনাদের কাজকর্ম মিটলে যদি একপাশে একটু বসতে দেন তো সেখানে বসে আমি সামান্য একটু গীতা পাঠ করি।

প্রকাশক থেকে ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে বললেন—সেকি কথা, আপনি এখনই এখানে বসে গীতা পাঠ শুরু করুন।

ওঁর জায়গা করে দিতে উনি বসলেন শান্তভাবে—সবাই ভাবছেন উনি পকেট থেকে গীতা বার করবেন বা একটা গীতা চাইবেন। কিছুই হল না। বসে চোখ বন্ধ করে—একাদশ অধ্যাযটি সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে পাঠ করলেন।

শ্রাদ্ধসভাব উপস্থিত মানুষ মাত্রই চিত্রার্পিতের মতো সেই পাঠ শুনলেন।

কোন কোন মানুষের কুৎসাপ্রবণতা আছে। তাঁরা বলে থাকেন, আলী সাহেবের পারিবারিক জীবনে বা দাম্পত্য জীবনে শান্তি ছিল না। এটি একেবারেই ভুল। ওঁর বিয়ে হয়েছিল একটু বেশি বয়সে, সম্ভবত ওঁর বয়স তখন ৪৭। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অথবা পুত্রদের সঙ্গে বন্ধন নিবিড় ও গভীর ছিল। মিসেস আলী তখনকার পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন। তাঁর এখানে আসার উপায় ছিল না। অথচ আলী সাহেব তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও খোলামেলা রাজনীতিক মতবাদের জন্য পাকিস্তানের মুসলীম লীগ সরকারের অধীনে কোন কাজ করতে পারলেন না। তাঁর মেজদা সৈয়দ মুর্তাজা আলী ডিভিসনাল কমিশনার থাকা সত্ত্বেও তিনি বগুড়া কলেজের কাজ লীগের অত্যাচারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

মিসেস আলী আমাকে বলেছেন, ছোটবেলা থেকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থাকার ফলে ও কলকাতা মেট্রোপলিশের আবেষ্টনীতে বেড়ে ওঠার পর ওঁকে পাকিস্তানে জোর করে আটকে রাখলে অত্যাচারই হোত। সাহিত্য সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেতো। সুগভীর পতিপ্রেম না থাকলে কেউ এমনভাবে

স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

১৯৬৫'র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দেখেছিলাম, স্ত্রী ও দুই পুত্রের জন্য আলী সাহেবের কী ভাবনা ও মানসিক যন্ত্রণা! আমাকে সাক্ষাতে বলেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এক পত্রিকা সম্পাদক এবং পত্রিকার বন্ধুদের প্রসঙ্গ। ভানু, এরা কি মানুষ! এই সময়ে কেবলই আমাকে চাপ দিচ্ছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কলম ধরতে। এরা কি বোঝে না যে আমি একটা কথা এখানে উচ্চাবণ কবলে পরদিনই পাকিস্তানী সেনা বা রাজাকাররা আমার বৌ-ছেলেদের গুলি করে মেরে ফেলবে!

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে অনেকে তাকে নানাভাবে হেনস্থা কবাব সুযোগ নিয়েছিল। আলী সাহেবেব স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে যান। একটা ঘটনা উল্লেখ করি। বিশ্বভাবতীর এক কর্তা তাঁকে একটি আরবী ভাষাব লেখা পত্র পাঠোদ্ধাব করতে পাঠিয়ে দেন। আলী সাহেব পত্রেব উল্টো দিকে মর্মার্থটি লিখে ফেবৎ দেন। সভার মধ্যে সেই কর্তা উল্টো দিক না দেখেই বলে ওঠেন, 'ডঃ আলী, আপনাকে পাঠোদ্ধার কবে দিতে বললুম চিঠিটার, তা আপনি না কবেই আবাব ফেবত দিলেন'।

আলী সাহেব সভার মধ্যেই সকলের সামনে বললেন, 'আপনি কি কোনদিন ভাজা মাছ উল্টে খান নি' চিঠিব উল্টো দিকে তো মর্মার্থ লিখে দিয়েছি'।

সভার সকলের উচ্চহাস্যে কর্তাটি লজ্জিত ও বিব্রত হলেন বটে, কিন্তু মনে মনে চটে রইলেন। এঁবাই পরবর্তীকালে পাকিস্তান যুদ্ধে, বাংলাদেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে আলী সাহেবকে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা কবেন।

এই সময়টা আলী সাহেবের কেটেছে খুব যন্ত্রণায়। ১৯৭০-৭১ সালের কথা। বাংলাদেশের চিঠি আসে বিলেত ঘুরে। যায়ও তাই। জীবন পদ্মপত্রে জলের চেয়েও অনিশ্চিত বাংলাদেশে। তার ওপর ঘনিষ্ঠ পত্রিকা-বান্ধবদের অসহযোগ। এইতেই ওর জীবনীশক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেল। তা না হলে আরও লিখতে পারতেন।

রাজনীতির কারণে দেশভাগে অনেক পরিবারে সর্বনাশ ঘটে গেছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো এক বরেণ্য লেখকের জীবনে ও পরিবারেও যে দেশভাগ জনিত এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে তা ক'জন জানে।

সৈয়দ মুজতবা আলী আর দেশে-বিদেশে

(কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি)

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৪৭ সালে আমায় আমাদেব একজন আত্মীয় চুনীলাল গুপ্ত তাঁব কর্মস্থল গিরিডিতে 'চেঞ্জে' নিয়ে যান। তিনি বাবগাণ্ডা আব পচম্বাব মাঝামাঝি মোহনপুবা বলে ছবির মতন সুন্দব একটি নিঝুম নির্জন জাযগায ছোট্ট একটা পাথরেব বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িব একদিকে ছিল গিবিডির বিখ্যাত খ্রীস্টান হিল, সামনে মাঠ, বড বড বট ও আবো নানান গাছ আব একপাশে পাথরের টিলা। যুদ্ধেব পবে অকৃতদাব চুনীবাবুকে কোলিযাবিব শ্রমিকদেব 'ব্যাশন' জোগাড় কবতে প্রাযই গঞ্জে বেবিয়ে যেতে হত। তাই আমি অনেক সময নিঃসঙ্গ হলেও সঙ্গে কবে এক ট্রাঙ্ক যে সব বই নিয়ে গিয়েছিলাম তাই পবে সাবাদিন মহানন্দে কাটাতাম।

এই সময় একদিন গিবিডিব বাবগাণ্ডা-নিবাসী শান্তবাবু বলে একজন ভদ্রলোক আমাকে বেশ কিছু 'দেশ' পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। তাতে তখন ধারাবাহিকভাবে 'দেশে-বিদেশে' বেবচ্ছিল। আমি তো তাব প্রথমটা পড়ে থ। লেখক দেখলাম কে একজন সৈযদ মুজতবা আলী, যাঁব নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি। এরপর তো আলী সাহেবেব পবিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আব 'দেশে-বিদেশে' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে জায়গা কবে নিল।

এসবই ঠিক। কিন্তু বইটির ক্ষেপে ক্ষেপে প্রকাশের সময়ে সেই প্রথম পরিচযের আনন্দ একটা নতুন আবিষ্কাবেব মতন মনে হয়েছিল। আলী সাহেবের 'দেশে-বিদেশে'-তে কাবুলে তাঁর মজাব মজার অভিজ্ঞতাব কাহিনী, বহু বিচিত্র চরিত্রেব সমাবেশ, ছত্রে ছত্রে বুদ্ধিদীপ্ত রসালো মন্তব্য ইত্যাদি সবই অপূর্ব; কিন্তু এই সবকিছুকেই তিনি চবম মুন্সিয়ানার সঙ্গে যে ভাষায রূপ দিয়েছিলেন তা তাঁব স্বকীযতায অতুলনীয। পণ্ডিতাগ্রগণ্য হবপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁব বাংলা ভাযা নিয়ে

বহু লেখার মধ্যে একটিতে বলেছিলেন যে আগেকার যুগের পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য বড় সংস্কৃত-ঘেঁষা হত আর তাঁর সময়ের নব্য শিক্ষিতদের ভাষা বড় ইংরেজি-ঘেঁষা হয়। তাঁর মতে, বাংলা সংস্কৃতও নয়, ইংরিজিও নয়, বাংলা বাংলাই। সেইজন্য তাঁর মতে, কথ্য বাংলার সঙ্গে পরিমিতভাবে ফরাসি মিশিয়ে লিখলে লেখকের মনের ভাব মজবুত করে ব্যক্ত করবার একটা উপায় হয়। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত মুজতবা আলী এই কৌশলটি কী চতুরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তার একটা প্রমাণ হল তাঁর 'দেশে-বিদেশে'।

এইবার আলী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথায় আসি। মোহনপুরায় মাস দুয়েক কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে জানলাম যে মুজতবা আলী তখন পার্কসার্কাসে ডাঃ গণি সাহেবের পার্ল রোডের বাড়িতে বাস করছেন, যে বাড়িতে আবু সৈয়দ আয়ুব মহাশয়ও একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন। 'দেশে-বিদেশে' পড়ার পর আমার ভয়ানক ইচ্ছে হয় যে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তিনি মানুষটি কেমন তা জেনে আসি। কিন্তু হুট করে আমি এক অজ্ঞাত কুলশীল যুবক তাঁর দ্বারস্থ হয়ে তাঁকে বিব্রত করা সমীচীন হবে না ভেবে মনের ইচ্ছে মনেই পুরে রাখলাম। তবে আমার ভাগ্যি ভাল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার একটা মওকা মিলে গেল। ১৯৩০-এর শেষের দিকে আলী সাহেব যখন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় সন্তোষকুমার রায় (কালুদা) সেখানে বেশ কয়েক বছর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে সাগরেদি করতেন। ফলে আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়, আর তিনিও জানতে পারি যে কালুদার গানের খুব তারিফ করতেন। কালুদাকে আমার আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছের কথা বলতেই তিনি আমাকে চটপট এক রোববার সকালে তাঁর কাছে হাজির করলেন। সৌম্যকান্তি আলী সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ উদার আর মিশুকে ভাব নিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানালেন। কালুদা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও আত্মীয়তা সূত্রে আমি মান্যে 'গুরুজন' বলে আমায় মামা ডাকতেন। কালুদা তাঁকে আমার পরিচয় দিতেই তিনি বললেন : 'আরে সন্তোষের তুমি মামা হও। তাহলে আমিও তোমায় শাঁটুল মামু বলে ডাকবো।' তখন আমার মনে হল যেন এককথায় আমি তাঁর আপনজন হয়ে গেলাম।

সেই সকালেই আমি বুঝলাম যে তিনি কী জাতের 'racounter'। দু-এক

ঘণ্টার মধ্যে কতরকম বিষয় নিয়ে কতরকম কথা, কতরকম ফরাসি আর বাংলা কায়দায় শানদাব বসিকতা, কত মজার পরচর্চা।

এরপর বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আড্ডা হয়। আলী সাহেবের বৈঠকি মেজাজ সম্বন্ধে বড় করে লেখার মতন আমার পুঁজি নেই। তবে আশার কথা যে তাঁর অন্তরঙ্গ মানী-গুণী বন্ধুদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই এই বইয়ে সে বিষয়ে লিখবেন। তবে তাঁব সঙ্গে স্বল্প পবিচয় সত্ত্বেও এই সদাহাস্যময় আমুদে পণ্ডিত মানুষটির সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। সেটা হল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা sensuous quality দেখেছিলাম, যা না থাকলে জীবনকে চোস্তভাবে উপভোগ কবা যায না। যেমন, দিশি-বিদেশি সুখাদ্য আব পানীয়ের বিষয়ে তাঁর ডঃ সাহেদ সুরাবর্দীব মতন তীব্র স্পৃহা আব চিকন রুচি ছিল, মহিলাদেব সম্বন্ধে ছিল অসীম উৎসাহ আব তাঁর স্বভাব আর কথাবার্তায নীতিবাগিশতার কোনো বালাই ছিল না, ছিল উদ্দাম ফূর্তি।

এইবাব আবাব 'দেশে-বিদেশে'ব কথায ফিবে আসি। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখাব পর 'এ কাবুল ডাইবী' নাম দিয়ে তাঁর 'দেশে-বিদেশে'-র একটা ইংবিজি সমালোচনা লিখি। সমালোচনাটা বেবোয ডাঃ জে. কে. ব্যানার্জির (বিনু বাবু) 'দি বিপাবলিক' বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায। বিনুবাবুব পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয যে তিনি বাংলা বায়োস্কোপেব আদি যুগেব প্রসিদ্ধ অভিনেতা ভানু ব্যানার্জীব ভাই আর ডঃ নির্মলকুমাব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের শ্যালক ছিলেন। বিনযকুমার সবকাবেব কথায বলতে গেলে বিনুবাবুব মতন 'ডানপিটে' বাঙালি আমি বিশেয দেখিনি বললে ভুল হবে না। আর একটু ব্যাখ্যা কবে বলি যে, ডানপিটে বলতে বিনযকুমাব বোঝাতেন সেইসব 'বাপকা বেটা'দেব, যাঁরা 'Could flourish under any conditions anywhere.' বিনুবাবু ১৯২০-এর গোড়ার দিকে রাজনীতিক কাবণে লুকিয়ে ইউবোপে পালিয়ে যান। তারপর ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি ইত্যাদিতে নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ আর ফ্রাংকো-বিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জার্মান বন্দী-শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায এসে তাঁব 'দি বিপাবলিক' পত্রিকা বেব কবেন। এর কয়েক বছব পরে তিনি আবার দেশ ছেড়ে চলে গেলে কাগজটা বন্ধ হয়ে যায।

সে যাইহোক আমার লেখাটা পড়ে আলী সাহেব যে কী খুশী হয়েছিলেন তা বলবার নয এবং সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে আমাকে এক কপি 'দেশে-

বিদেশে' উপহার দেন। এই উপহারের আসল মজাটা ছিল বইটির পুস্তিনে লেখা তাঁর স্বাক্ষরিত মন্তব্য ঃ 'শাঁটুল মামু তুমি আমার বইয়ের যে রকম বেশরম প্রশংসা করেছো তা থেকে পরিষ্কার মালুম হোচ্ছে তুমি আমার লেখাটা মন দিয়ে পড়নি। তাই যাতে ভালো করে পড়তে পারো সেজন্য এই বইটা দিলাম।' আমার আফশোসের সীমা নেই যে, কোনো একজনকে ধার দিয়ে বইটা আমি আর ফেরত পাইনি। তাই আমাব স্মৃতি নির্ভর আলী সাহেবেব উপরোক্ত মন্তব্য তাঁর লেখাটার বজনিস নকল না হলেও বিকৃত নয়।

এখানে এই সমালোচনাব ব্যাপাবে আর একটা কথা সেটা হল যে আমার আগে আলী সাহেবের বন্ধু আর তখনকাব বরোদার দেওযান রাজবন্ধু সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আগে তখনকার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' কাগজে 'দেশে বিদেশে'-র সমালোচনা কবেছিলেন। পরে আলী সাহেবেব মাবফৎ আমার লেখাটা তাঁর চোখে পড়ে। তিনি তখন আলী সাহেবকে একটা চিঠিতে জানান যে আমার সমালোচনাটা তাঁর লেখাটাব চেযে আবো ভাল এবং আবো 'witty' বলে তাঁর মনে হয়েছে। আলী সাহেব অত্যন্ত আহ্লাদেব সঙ্গে আমাকে সেই চিঠি দেখিয়ে বলেন, মামু, দেখো ইংরিজিতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত তোমাব লেখা সম্বন্ধে কী বলেছেন।' এই কথাগুলো পড়ে অনেকে মনে কবতে পারেন এটা আমাব একটা অহেতুক জাঁক। আসলে ব্যাপাবটা আমি এখানে তুললাম, কারণ সেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে একজন বিদ্বান লোকেব এই কথাগুলো বড্ড ভালো লেগেছিল।

এব কিছুকাল পরে মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে চলে যান। তারপর তাব সঙ্গে আমার আবাব দেখা হয ১৯৬১-ব জানুয়াবি মাসে যখন আমি টাটা স্টিলেব একটা কাজ নিয়ে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যাই। তিনি তখন একটা ফাঁকা জাযগায একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফিবে আসার আগে আলী সাহেব একদিন দুপুরে আমাদের নেমন্তন্ন কবে খাইয়েছিলেন। তাঁব সঙ্গে আমার কলকাতায় শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৫৮-র এক সন্ধেয যখন তিনি আমাদের বাড়িতে খেতে এসেছিলেন। তিন বছব বাদে তাঁকে দেখে যেন একটু নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদেব দেখেই এক সেকেণ্ডে তাঁব রূপ বদলে গেল। তাঁর কথাবার্তায় দেখলাম সেই পুরনো ফূর্তি, আচারে-ব্যবহারে সেই আন্তরিক ভালোবাসা। সেই শেষ সাক্ষাতের আনন্দময় স্মৃতি আমবা কখনো ভুলতে পারবো না।

একটি বৈচিত্র্যময় রবীন্দ্রস্নিগ্ধ জীবন

অমিতাভ চৌধুরী

আমরা ডাকতুম 'সৈয়দদা', বাইরের লোকেরা 'আলীসাহেব'। সৈয়দ মুজতবা আলী এক অসাধারণ চরিত্রের লোক। যিনি তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁকে ভালবেসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ভদ্রলোক তাঁর জীবন একেবারে পালটে দিলেন। সৈয়দদার জন্ম তৎকালীন সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে। তিন ভাই—সবাই কৃতী। সৈয়দদা সবচেয়ে ছোট ভাই। তাঁর বয়স যখন পাঁচ, আসামের চিফ সেক্রেটারী মিঃ হজলেট তাঁর বাবার অফিসে এসে ছেলেটিকে দেখে বলেছিলেন—'নেভার মাইণ্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস'। সেটা পরে সত্যি হয়েছিল। ডাকনাম 'সিতারা', ঘনিষ্ঠজনেরা ডাকতেন 'সীতু' বলে ওই যে মার্জার নিধন কাব্যের শেষ পঙক্তিতে আছে 'দীন সীতু মিয়া ভনে শুনে পুণ্যবান।' ওটা সৈয়দদারই নাম। ক্লাস সেভেনে উঠে সৈয়দদা নিয়েছিলেন আরবি ফারসির বদলে সংস্কৃত। 'পাদটীকা' গল্পের সেই সংস্কৃত পণ্ডিত তো তাঁর নিজেরই মাস্টারমশাই। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে সরস্বতী পুজোর ফুল পাড়তে গিয়ে আরও দু'জন হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে ধরা পড়ে স্কুল থেকে রাসটিকেট হন। অন্য দু'জন ছাত্র ও তাদের অভিভাবক ক্ষমা চাওয়ায় পরিত্রাণ পান, কিন্তু সৈয়দদার বাবা সরকারী অফিসার হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা চাইতে রাজি হননি। ফলে স্কুল থেকে বহিষ্কারাদেশ বলবৎ রইল। পরে সৈয়দদা এক অতি সাধারণ গেঞ্জি কলে অতি সামান্য চাকরি করতে লাগলেন। এমন সময় অর্থাৎ ১৯১৯ সালে সিলেট শহরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় 'আকাঙ্ক্ষা'। সৈয়দদা সেই বক্তৃতা শোনেন এবং তাঁর সমস্ত মন আলোড়িত হতে থাকে সেই বক্তৃতা শুনে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন একটা দীর্ঘ চিঠি, সেই বক্তৃতারই কিছু কিছু

অংশের ব্যাখ্যা চেয়ে। তারপরে অভাবিত ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ আগরতলা থেকে সেই অজ্ঞাত অখ্যাত কিশোরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এক পত্র লেখেন। সেই পত্র পেয়েই ছেলেটিব মনে তীব্র বাসনা হয়, তিনি শান্তিনিকেতনে যাবেন এবং সেখানেই পড়াশোনা কববেন। তাঁর বড়দাদা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর অর্থানুকূল্যে ও পরিবারের সকলের আগ্রহে ১৯২১ সালে সৈযদদা শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলেন বিশ্বভারতী কোর্সে। সেই কোর্সে ভর্তি হতে গেলে তখন ব্রিটিশ ভাবতেব কোন বিদ্যালয়েব পাসের সার্টিফিকেট লাগত না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বভারতীতে তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র। বিধুশেখব শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, সিলভাঁ লেভি, উইলনিৎস লেজান, বগদানভ বেনোয়াঁ এবং সর্বোপরি ববীন্দ্রনাথেব শিক্ষা দানে সমৃদ্ধ হয়ে সৈযদদা পাড়ি দিলেন কাবুল। সেখানকাব বৃত্তান্ত তাঁব প্রথম বই 'দেশে-বিদেশে'তে সবিস্তাবে লেখা আছে। সৈযদদা দেশে ফিবে আলিগড থেকে নেন সবকাবি ডিগ্রি। তাবপব জার্মানিব বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টবেট। মিশরেব আল আজহাব বিশ্ববিদ্যালয়েও করেন পডাশোনা। দেশে ফিবে বেকাব। ঘুবে বেড়ান। স্বাধীনতা লাভেব পব আই সি সি আব-এ কিছুদিন চাকবি, তাবপর আকাশবাণীতে যোগদান। কটক স্টেশনে অধিকর্তাব কাজ কিছুদিন কবাব পর ইস্তফা দিয়ে ফেব স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে।

সৈয়দদাকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫৪ সালেব শান্তিনিকেতনে। ধুতি পাঞ্জাবি পবা সুদর্শন চেহাবা। মাথায বিবাট টাক। সেটাও যেন ওই সৌম্যকান্তি দীর্ঘদেহী মানুষটিব পক্ষে মানানসই। যেন টাকেব মুকুটপবা। শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন, যাকে বলে, লেডি কিলার। থাকতেন প্রাক্ কুটিরে। পরিমল গোস্বামী, অনাদি কুমার দস্তিদার, অনিল কুমাব চন্দ আব হবিপদ বাযেব সঙ্গে একই বাড়িতে। পাঁচটি ঘর, পরবর্তী জীবনে সফল পঞ্চপ্রদীপ। আমি পবিচয দিলাম এবং বললাম, আপনাব লেখা আমাব দারুণ ভাল লাগে। নিজেব লেখা ভাল বললে কে না খুশি হয়। তিনিও খুশি হলেন। সত্যপীব ও টেকচাঁদ ছদ্মনামে তাঁব সে সর্ব লেখা ভাষার গুণে ও বিষয় বৈচিত্র্যে অনবদ্য। জার্মান সঙ্গীতকার 'ভাগনাব' সম্পর্কে তাঁব লেখা বেরিয়েছিল 'শনিবাবেব চিঠি'তে। সৈয়দদা জার্মান

ফরাসি জাতির গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের লোকদের তেমন পছন্দ করতেন না। তাঁর লেখায় সে সাক্ষ্য আছে।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা জমে। নিজে আড্ডাবাজ লোক, সাইকেল চড়ে এঁর ওঁর বাড়িতে এবং কালোর দোকানে আড্ডা মারতে বসে যেতেন। সৈয়দদা তাঁর মাকে ভীষণ ভালবাসতেন। কথায় কথায় মায়ের কথা এবং মায়ের রান্নার কথা, আর আসত পুরনো শান্তিনিকেতন আর রবীন্দ্রনাথের কথা। দেশ স্বাধীন হওযার পর কিছুদিন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেখানে এক সভায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চেয়ে অনেক বড় কবি। আর যায় কোথায়, সে দেশের মৌলবাদী ছাত্ররা তাঁকে মারতে যায় আর কি! তিনি তাঁর মেজদাদা বগুড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বাড়িতে গিয়ে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচান এবং চিরতরে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়েন। তারপর তিনি আমৃত্যু ছিলেন ভারতের নাগরিক। তাঁর স্ত্রী ও পুত্ররা থাকতেন পূর্ব পাকিস্তানে। মাঝে মাঝে তিনি যেতেন দেখা করতে এবং ওঁরাও আসতেন স্বামীর কাছে, বাবার কাছে। ষাটের দশকে একবার শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষের উপাসনায় ছাতিমতলায় তিনি আচার্য হয়েছিলেন। পড়ে এসেছিলেন শেরওয়ানি চোস্ত ও ফেজ টুপি। এই জন্যে শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীল লোকদের কাছে কম কটূক্তি শুনতে হয়নি তাঁকে। আমার খুবই ভাল লেগেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত ছাতিমতলায় পারস্যের সংস্কৃতি ও কাব্যপ্রবাহ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী মহর্ষির অনুষ্ঠানে এ ছিল অত্যন্ত মানানসই। কিন্তু আরও দুঃখের কথা, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় একদল স্বার্থান্বেষী শান্তিনিকেতনবাসী অকারণে তাঁকে 'পাকিস্তানের চর' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সেই দুঃখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি সংলগ্ন বোলপুর শহরে বাড়ি ভাড়া করে চলে যান, আর শান্তিনিকেতনে যান নি। দুর্ভাগ্য শান্তিনিকেতনের।

সৈয়দদাকে শেষ দেখি কলকাতায় তাঁর পার্ল রোডের বাড়িতে। সুশীলা নামে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্রী কিছু গুজরাতি আচার দিয়েছিলেন আমার

সঙ্গে। আমি বম্বে থেকে কলকাতা আসছিলাম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে আচারের শিশি দিতে গিয়ে সৈয়দদার চেহারা আর পোশাক দেখে আমি অবাক। ছেঁড়া গেঞ্জি, নোংরা পাজামা এবং দিন তিনেক অন্তত দাড়ি কামানো হয় নি। অমন সুপুরুষ মানুষের এই অবস্থা! আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে সম্বরণ করে গুজরাতি আচারেব শিশিগুলো তাঁর হাতে দিই। তাবপর অনেক কথা। বেশি কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিজয়তোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে। ওঁবা দুজনে একসঙ্গে কাজ করতেন বরোদায, মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায। সৈয়দদা তখন অসুস্থ। ঘন ঘন কাশছেন, কিন্তু কথাব বিরাম নেই। বললেন, দর্পহারী মধুসূদন একে একে সব কেড়ে নিচ্ছেন আমার। হাতের কলম সবে না, লিখতে কষ্ট হয, আর না লিখতেই যদি পাবি, তবে বেঁচে কী লাভ? না, বেশিদিন তাঁকে বাঁচতে হযনি। অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন পবই তিনি ঢাকা যান, ৭০ বছর বযসে। সেইখানেই দুই প্রিয় দাদা, স্ত্রী ও পুত্রদেব সামনে বিদায নেন এই পৃথিবী থেকে। একটি বৈচিত্রাময রবীন্দ্রস্নিগ্ধ জীবনেব সমাপ্তি ঘটে সেই দিনে।

একজন শ্রেষ্ঠ সৈয়দ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আলীসাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল অল্প। বার দু-তিন মুখোমুখি বসে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, শুধু বড় লেখক তিনি নন, বড় কথকও। যা লিখেছেন, তার চেয়ে যা জানতেন, ভাবতেন এবং বলতেন তা যেন আরও বড়। দুঃখের বিষয়, সব জানা ও ভাবনাকে কাগজের পাতায় হরফে গেঁথে গেলেন না তিনি। তাহলে বোঝা যেত, এমন মানুষ গণ্ডায় গণ্ডায় পৃথিবীতে আসেন না।

বাংলা-সাহিত্যে তিনি স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল শুধু নন, অনন্য, অদ্বিতীয়। পাণ্ডিত্য কিভাবে নির্মল কৌতুকের রসে ভিজিয়ে সর্বসাধারণকে পরিবেশন করা যায়, তিনি জানতেন। তার সঙ্গে আলাপ করার পর মনে হয়েছিল, তিনি একটি অনবদ্য বিশ্বকোষ। এ হেন বিষয় নেই, যা তাঁর অনধিগম্য। এ শুধু নিছক পল্লবগ্রাহিতার পরাকাষ্ঠা নয় সত্যিকার জ্ঞানী ও গুণীর একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত। যদি বলা যেত, সাম্প্রতিক বাসভূমিতেও এমন সর্ববিশারদ আর দ্বিতীয় হয় নি--- একটুও বাড়াবাড়ি হত না।

কৌতুকবোধ স্বভাবত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ বা সুকুমার কলাসম্পর্কিত এসথেটিকাল সেনসকে ব্যাহত করে। কিন্তু আশ্চর্য, আলীসাহেবের মধ্যে দুইয়ের বিচিত্র সহাবস্থান ছিল। নান্দনিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে কৌতুকের লঘুতাকে তিনি অনায়াস সূক্ষ্মতায় জুড়ে দিতে পারতেন। এ এক বিরল ক্ষমতা।

তাঁকে নিছক রম্যরচনার লেখক বলে যদি ভাবা হয়, তার মতো মূঢ়তা আর থাকতে পারে না। সৃজনশীল লেখকসত্তার পরিচয় তিনি কম রাখেন নি। ধ্রুপদী ভাবনার সঙ্গে রোমান্টিকতার চপলতা না মিশলে এমন দেখা যায় না। চিরগুণের সঙ্গে তাৎক্ষণিকতার এমন আশ্চর্য সমাবেশ এমনভাবে আর কোথায় পাই বাংলা সাহিত্যে?

বোঝা যায়, এর পিছনে তাঁর রবীন্দ্রসান্নিধ্য কাজ করছে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ও

জীবনদর্শনেব গভীর তাৎপর্য থেকেই নিজের মানসিকতাকে বর্ণাঢ্য করতে পেরেছিলেন তিনি।

লেখায় যেমন, তেমনি ব্যক্তিজীবনেও অমন বিদগ্ধ সুরসিক মানুষ খুব কম দেখা যায়। লেখক ও ব্যক্তিকে আলাদা করা যেত না—তা যাঁবাই মিশেছেন, তাঁরা জানেন। প্রথম আলাপেই স্নেহ-ভাজনকে তুই বলার ক্ষমতা তাঁব ছিল। আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামেব (বিভ্রান্তিজনিত) মিল লক্ষ্য কবে অনেকে আত্মীযতাব কথা ভাবতেন, এ নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায তিনি সকৌতুকে লিখেছিলেনও। কিন্তু সে আমার গর্ব। বাস্তবজীবনে আমবা আত্মীয ছিলাম না, কিন্তু ভাবজীবনে তিনি তো আমাব আত্মাব আত্মীযই ছিলেন।

সৈযদবা পয়গম্বব হজবত মোহম্মদেব কন্যাব বংশধব। সেই পবিত্র মহিমান্বিত বংশে ঈশ্বরেব অনেক করুণা ও দিবা মাহাত্ম্য থাকা উচিত। সৈযদ মুজতবা আলী যেন তা পেয়েছিলেন। মহান প্রজ্ঞাব স্পর্শ উত্তরাধিকাবসূত্রে তাঁব মধ্যে বর্তায নি, এটা ভাবা যায না। তার কথা বলতে হলে আমি 'বড সৈযদ' বলেই ববাবব উল্লেখ কবছি। তিনি একজন বড সৈযদই ছিলেন। তাই বলে নিজেকে 'ছোট সৈযদ' ভাবা নিশ্চয ধৃষ্টতা। তিনি ছিলেন হিমালয, আমি উইঢিবি। তবে গর্ব, আমিও একজন সৈযদ।

না, এই সুযোগে নিজেব মাহাত্ম্য প্রচাবে আমি ব্রতী নই। কিন্তু যেহেতু এ লেখায তাঁব বচনাব মূল্যাযন কবতে বসিনি, তাঁব কথা বলতে গিযে নিজেব কথা এসে পড়া স্বাভাবিক। বাব দুই তাঁব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। শেষবাব আমাকে লোক পাঠিয়ে পাকড়াও কবে নিয়ে যান। স্বভাবে আড়ষ্টতাব জন্যও বটে, আবাব পণ্ডিতদেব সম্পর্কে ছেলেবেলাব আতঙ্কবশে, বেশি ঘনিষ্ঠতার সাহস করিনি। কিন্তু আতঙ্ক তিনি নিজেই দূর কবেছিলেন।

এখন দুঃখ হয, যা সব জানতেন, তার শতকবা একভাগও যদি লিখে যেতেন! ফেবিওযালার ডাক সম্পর্কে শেষ সাক্ষাতেব সময যা সব বলেছিলেন, তা নিযে বিরাট গবেষণাব বই লেখা যেত। অমন জানার ভাণ্ডার যাঁর, তিনি আদৌ গোমড়ামুখো ছিলেন না এটাই আশ্চর্য। বৃদ্ধ বয়সেও যুবকেব মতো চঞ্চল, আড্ডাবাজ ও মুখব মানুয ছিলেন তিনি। এখন মনে হয়, কেন আড়ষ্টতা ভেঙে বাববার যাই নি তাঁর কাছে।

একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ কবি। সত্যি বলতে কি, তাঁকে প্রথম মুখোমুখি

কিন্তু উনিশ বছর বয়সে দেখেছিলাম। তখন কবিতা লিখি। নাটক করি মফস্বলে। কলকাতা রেডিওর নাটকে হঠাৎ অভিনয়ের খেয়াল চেপে বসল। দরখাস্ত করলাম। অডিশনের ডাক এল। গেলাম। অডিশন হওয়ার পর দেখি (তখন গারসটিন প্লেসে রেডিওব অফিস) একটা ঘরের বাইরে নেমপ্লেট : ডাঃ এস. এম. আলী, স্পেশাল অফিসাব। শুনেছিলাম, আলীসাহেব রেডিওর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাই মুখোমুখি দেখার ইচ্ছা হল। 'দেশে-বিদেশে' পড়ার পর তখন আমি তাঁব ভক্ত পাঠক।

স্লিপ পাঠাতেই ডাক এল। ভিতরে যেতেই চোখ জুলে গেল। এ যে রীতিমতো সায়েব মানুয। ঝক্‌মকে উজ্জ্বল মুখ, মাথায় টাক, সুন্দর একজন মানুষ। মনে পড়ল 'চতুরঙ্গে' ইন্দ্রলুপ্ত নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন টাক সম্পর্কে।

বসতে বললেন। তাবপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি তো নাটকেব ব্যাপারে অডিশন দিচ্ছ।

অবাক হয়ে বললাম—হ্যাঁ। জানেন আপনি?

—আমি হেড একজামিনাব।

বুঝলাম সম্ভবত একটিমাত্র মুসলিম নাম থাকায় তাঁব নজরে পড়েছিল। তাবপব বললেন—অডিশন বাদ দিয়ে অন্য কিছু কথা থাকলে বলতে পারো, শুনবো।

—না, আপনাকে একবাব দেখার ইচ্ছে হল।

মৃদু হাসলেন। —কী করো?

চোখ বুঁজে বললাম—কবিতা লিখি।

তাহলে নাটকে কেন? তুমিও দেখছি আমার মতো হাজাবটা নিয়ে ছোটাছুটি করতে চাও। সাবধান, একটা নিয়ে থাকো।

হাসলেন। হাসিটা অবিকল এখনও দেখতে পাই। একটা কথাও ভুলি নি। 'একটা নিয়েই থাকো' কথাটা যেন আমাব মনে জোর বসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাই সত্য করে তুললাম। নাটক, গান সব ছেড়ে দিলাম। শুধু একটা নিয়েই থাকলাম—এ যেন তাঁরই সেই নির্দেশ।

আজ অন্তত ভাবতে ভাল লাগছে যে, তিনি একটি অপরিচিত অখ্যাত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেকে মনো-চিকিৎসকের মতো সাজেশন দিয়ে শায়েস্তা করেছিলেন। তা না হলে আজও হয়তো নাটক আর গান নিয়েই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

সেই শ্রেষ্ঠ সৈয়দেব উদ্দেশ্যে আমার বারবাব সেলাম.

জার্মানিতে মুজতবা আলীর সান্নিধ্যে

রুহেনা ফয়েজ

[বেগম রুহেনা ফয়েজ ঢাকায় থাকেন। তাঁর পিতা সৈয়দ মুর্তাজা আলী ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর অব্যবহিত অগ্রজ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা আলী। সিলেটের এই বিখ্যাত পরিবারের অনেকেই, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। বেগম ফয়েজ নিয়মিত সাহিত্যচর্চা না করলেও, তাঁর এই অন্তরঙ্গ কথনে মুজতবা চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।]

আমার স্বামী এবং আমি প্রথম যেবার জার্মানি ভ্রমণের জন্য গোছগাছ করছি; সেটা ১৯৬১ সালের মার্চ মাস। ওই সময় আমার ছোট চাচা সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেখানে বসে যখন খবর পেলেন আমরা ছোট শহর কোলোনে বেশ কিছুদিন থাকব, তৎক্ষণাৎ এক দীর্ঘ পত্র লিখে জানালেন তিনিও একই সময়ে বনসুন্দরী বন শহরে অনেকদিনের জন্য ডেরা পাতবেন। তারিখ ও ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে জরুরী তলব পাঠালেন আমরা যেন অতি শীঘ্রই কয়েকদিনের জন্য বন্-এ গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে আসি।

কোলোনে পৌঁছেই আমাদের বন্ধুদম্পতি হের ও ফ্রাউ হেংকোল্‌সকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললাম বন্-এ যাব বলে। বন্ তখনও আমাদের চোখে দেখা শহর না হলেও অতি পরিচিত। কারণ ছোট চাচা ওই শহরে আগে ছিলেন এবং ওখানকার বিশ্ববিদালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই তাই সৈয়দ সাহেবের মুখে সেসব গল্প অনেক শুনেছি। সেই রূপকথার শহরে চাচার সঙ্গে একত্রে থাকব ভাবতেও রোমাঞ্চ জাগছিল। এখানে একটা কথা বলে নিই। সৈয়দ সাহেব যেমন আমার নিজের চাচা, আমার স্বামীর তেমনি তিনি ছিলেন আপন মামা। ফলে বন্ যাবার আগ্রহ ও উত্তেজনা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কারোরই কম

ছিল না। আমার চাচা এই সময়ে হিটলাব সম্বন্ধে একখানা বই লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এবং সেই সুবাদে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই তাঁর আবার বন্-এ গিয়ে কিছুকাল বাস করার প্রয়োজন হয়েছিল। যাইহোক, চাচার বাড়ি নাইওর করতে যাচ্ছি ভেবে খুবই পুলকিত হচ্ছিলাম।

বন্‌ও ছোট শহব, ছিমছাম খুব। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়াটা বিবাট বিবাট গাছের সাবি দিয়ে ঘেবা, অদ্ভুত মায়াময়। অপূর্ব সুন্দর সেই পাড়াব মধ্যেই একটি পাঁসিওঁ-তে (ছোট্ট হোটেলে) উঠেছিলেন তিনি, খুঁজে পেতে মোটেই কষ্ট হয নি আমাদেব। একটু বেশি হাঁটাহাঁটি এই যা। পৌঁছে খবর নিয়ে জানলাম চাচা তখন দিবানিদ্রা ভোগ কবছেন। একটু বেগেই গেলাম আমি। সেই আগেব রাত থেকে কত মজা হবে ভেবে ভেবে আমাব বিশ্রাম নেই, আব তিনি কিনা দিনদুপুরে ঘুমোচ্ছেন' দু-জনেবই মনটা বিগড়ে গেল বলেই হযতো একে অন্যাকে সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টাও কবলাম। বললাম, ভালই তো, ততক্ষণে আমবাও একটু চা টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিই। কিন্তু চা আব কেক খাওযা শেষ হল না, হঠাৎ একটা হুঙ্কাব শুনতে পেলাম। প্রায় গর্জন আব কী। আব তা কানে আসতেই আমবা হুড়মুড়িয়ে ঢুকলাম তাঁব ঘবে।

ঘরে ঢুকে দেখি চাচা উলটো দিকে মুখ ফিবিয়ে বসে আছেন। এখানে বলে বাখি, আমাব ছোটবেলায চাচা সৈযদ মুজতবা আলী সাহেব কিছুকাল বগুড়া শহরে আমাদেব সঙ্গে ছিলেন। তখন আমাব উপরেই ভাব ছিল তাঁকে দেখাশোনা কবাব। তাঁর ছাড়া কাপড় ধোপাকে দেওযা, কাচা কাপড় গুছিয়ে বাখা, খাওযাদাওয়াব তদাবকি করা, ঘর গোছানো, ফুল সাজানো --এইসব কাজ আব কী। মনে পড়ে গেল তখন আমাব কোনও কাজ উলটো-পালটা হলেই চাচা ওবকম মুখ ঘুবিয়ে বসে থাকতেন। আব একটা ঘোঁৎঘোঁৎ আওযাজ কবতেন। ছোটবেলায এই নিয়ে আমবা ভাইবোনেরা আড়ালে খুব হাসাহাসি করতাম এবং তাই দেখে আমাব আব্বাও (সৈযদ মুর্তাজা আলী) খুব মজা পেতেন।

আমি অতি সন্তর্পনে সালাম করে মিহি গলায় যেই বললাম 'কেমন আছ ছোট চাচা?' অমনি ফেটে পড়লেন। 'ও ঘবে এতক্ষণ কী কবা হচ্ছিল?' আমতা আমতা করে ও বলল, 'মনে কবলাম আপনাব ঘুমটা ভাঙুক, তারপব ঘরে ঢুকব, তাই. ।' 'তাই, তাই, কী ছোকবা?' চোখ মুখ লাল করে বললেন, 'আপনার

জন আসবে জেনে কি কেউ ঘুমায়? না ঘুমাতে পারে? বল্‌তো দেখি।' (চাচা এবার আমাকে যেন সাক্ষী করে নিলেন।) একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'তাই তো, আমিও তো তাই ভাবছিলাম দবজাটা খুলেই না হয় দেখি। কিন্তু ওই ব্যাটা হোটেলওয়ালা কড়া গলায় বলল কিনা তোমার ঘুম ভাঙলে ভীষণ কাণ্ড বেধে যাবে।' 'হুঁহ্‌---গাধা'---বলে আবার চুপ হলেন। এবাব আমি চাচার ভাইঝি হিসেব করে উলটে ফোঁস করে উঠলাম, 'আচ্ছা চাচা, তুমিই বল তো, অত করে লিখলে তো এতদূরে ট্রেনে চেপে এলাম তোমাকে দেখতে; আর তুমি কিনা লেপমুড়ি দিয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন। কেন, একটু পাযচাবিও তো করতে পাবতে। একেবাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অপেক্ষা কবছিলে! এটাও কি তোমাব এদেশে পাওয়া শিক্ষা?'

ব্যাস, এরপব চাচাব একদম অন্য মূর্তি। বড বড চোখে এক গাল হেসে বললেন, 'খুব কথা শিখেছিস! সেই ছোটবেলা থেকেই। দে দেখি হাতেব আঙুলগুলো টেনে।' শুরু হয়ে গেল, গল্পের ফুলঝুরি। সে গল্পেব যে কোথা থেকে শুরু আব কোথায শেয বোঝা যায না। বচনপটু সৈয়দ সাহেব যখন কথা বলতে আবম্ভ করতেন তখন শব্দের খৈ ফুটত। তাঁকে যাঁবা চিনতেন তাঁবাই একমাত্র বলতে পাববেন তা কেমন ছিল।

ছোট চাচাব জীবনেব পাঁচটি বছব এই শহবে কেটেছিল। তখন তাঁব বযস কম। কাব কাব সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, কত কী ঘটনা, কত বকমেব খানাপিনা--- এসব কাহিনীর বোমন্থন করে চললেন তিনি। হাত ঘুবিয়ে, চোখ নাচিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁর কথা বলা। এক সময় আমি ঘুমিয়েই পড়েছি দেখে চাচা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ 'এই দেখ, আবে ওঠ ওঠ, এবপব খাবাব জুটবে না আজ। নটা বাজে। আরে একি তোদের ঢাকা শহব যে বাতবেবাতেও রেস্তোরাঁ খোলা থাকবে!' ঘুম চোখে আমি বললাম, 'থাক আব খেয়ে কাজ নেই, বড্ড ঘুম পেয়েছে।' আমার কর্তার বুদ্ধি বেশি, কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'খাবার অজুহাতে উঠতে পারলে তবু ঘুমের সম্ভাবনা থাকবে। তা নাহলে মামার গল্পে বাত কাবার হয়ে যাবে। খেতে বেবোনই ভাল হবে।' তাই হল। খেয়ে ফিবে আসতেই চাচা বললেন, 'তোমবা আজ খুব ক্লান্ত, শুয়ে পড়। কাল সকালেই আমাব বান্ধবী তোমাদেব সঙ্গে দেখা কবতে আসবেন, সেই ১৮০

কিলোমিটার দূর থেকে।' মহিলা নাকি আমরা আসব জেনে খুব খুশি হয়ে বলে গেছেন আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে তিনি ভীষণ আগ্রহী। একথা শুনে আমি সত্যিই খুব অভিভূত। আমার চোখের চাউনি দেখে চাচা খুব গর্বিতভাবে বললেন ঃ হুঁ, কার বান্ধবী সেটা দেখতে হবে তো! দেখবি যে কী সুন্দরী, চোখ ফেরাতে পারবি না। এদিকে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার কর্তাটি ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়ে, একেবার কায়দাদুবস্ত জামাকাপড় পরে ফিটফাট তৈরী। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈবী হয়ে নাও। আব দেখ তো, এ নতুন টাইটার নট্‌টা একটু বেঁধে দাও না।' আমি বেশ কৌতুক বোধ করলাম, বললাম 'ওটা রেখে অন্য যেটায নট্ বাঁধাই আছে, সেটাই পব না কেন।' লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আহা, মামার সুন্দরী বান্ধবী আসছেন, নতুন টাইটা তাই পরা যাক ভাবলাম। তা বেশি সাজগোজ হয়ে গেল নাকি? তুমি হাসছ যে?'

এরমধ্যে চাচা তাঁব রুম থেকে ফোনে আমাদের রুমে জানালেন, 'তোমাদের জন্যে আমবা অপেক্ষা কবছি, চলে এসো।' ঘরে ঢুকতেই যথাবীতি প্রভাতী সম্ভাষণে আমাদের কাছে ডেকে বসালেন। তাবপব চাচার সুন্দরী বান্ধবী জার্মান ভাষায় আমাকে অনেকসব কথা জিজ্ঞেস করে চললেন, আর চাচা তার সাবমর্ম বুঝিয়ে দিতে আমি একটা একটা করে উত্তব দিতে লাগলাম। জার্মান মহিলা আমাব শাড়ি পবাব প্রশংসা কবলেন, আমিও তাঁব সৌন্দর্যেব সুখ্যাতি জানালাম। চাচা খুব খুশি হয়ে বান্ধবীকে জার্মান ভাষায অনেক কিছু বলে চললেন। আমাব কর্তা কৌতূহলী হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচা বললেন, 'শোন, আমবা যখন সেই অনেক বছর আগে দু'জনে মিলে ভার্সিটিব লনে পাযচাবি করতাম, তখন অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেব মধ্যে বলাবলি কবত ঃ মেয়েটা বেশ সুন্দবী। আবার কেউ কেউ বলত ঃ নাবে, ছেলেটাই বেশি ভাল দেখতে।' সেইসব সুখস্মৃতিতে ফিরে গিয়েছিলেন আজকেব দুই প্রৌঢ় নরনাবী। চাচা তাঁব ফেলে আসা দিনগুলির সুন্দব সুন্দর ব্যক্তিগত ঘটনা আমাদের সামনে সেদিন কি সরলভাবেই না বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন, ভাবতে এখনও অবাক লাগে। সৈযদ সাহেবেব চোখেমুখে এত কৌতুক, যৌবনের দিনগুলিতে ফিবে যাবাব এত আকুতি আগে কখনও দেখিনি। পরে আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি যখন পুরো ব্যাপাবটা ঘুবে ঘুবে দেখাচ্ছিলেন, তাঁর খুশি দেখে বান্ধবী ভদ্রমহিলা বলছিলেন,

'সৈয়দ, তোমাকে ঠিক সেই আগের মতোই দেখাচ্ছে। সেদিনের উচ্ছ্বাস আজও ধরে রেখেছ।' রাইন নদীর তীরে বসে গল্প করতে করতে সন্ধ্যে নেমে এল। শুনছিলাম, যুদ্ধের সময় চাচার কোনও খবর না পেয়ে তাঁব বান্ধবীটি কত টেলিগ্রাম করেছিলেন আমার বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে। কোনও খবর না পেয়ে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন সৈয়দ পরিবাব বোমার আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনেককাল পরে চাচা যখন আবার জার্মানিতে গেলেন এবং যোগাযোগ করলেন, সেদিনের সেই কাহিনী বলতে বলতে আবেগে ভদ্রমহিলার গলা ধরে আসছিল। একদিন একটা কফি হাউসে গেলাম চাচাব সঙ্গে। আমার কর্তা খুব গরম চা-পানে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁকে কফি ঢেলে দেবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাপ খালি করে ফেলেছিলেন। এদিকে কাকাব প্রথম কাপে তখনও অনেকটা কফি। সেদিকে লক্ষ্য কবেই মৃদুস্ববে আমার স্বামীকে বললেন, 'ওহে ছোকবা, কফিটা পেযালাতেই থাকুক।' খুব হেসেছিলাম আমবা।

চলে আসাব সময কোলোনে আমাদেব জার্মান বন্ধুদম্পতিব কাছে চাচা একটা চিঠি লিখে আমাব হাতে দিলেন। তাব ক'টি লাইন এখনও মনে আছে। 'এই জুটিটি আমাব খুবই প্রিযজন। তোমাদেবও এত প্রিয় হযে গেছে জেনে ভাবি খুশি লাগছে। আমি জানি জার্মানবা যাদেব ভালবেসে ঘবে তুলেছে তাবা যথার্থই আদবেব পাত্র।' আরও লিখেছেন, 'আমি নিজে সুদীর্ঘ পাঁচ বছব জার্মানিতে অধ্যযন কবেছিলাম। অনেক বন্ধুবান্ধবও আমাব ছিল। কিন্তু কোন জার্মান আমাকে তাব বাড়িতে থাকতে বলেনি। তোমাদের বন্ধুত্ব অমব হোক। আমাদেব এই জার্মান বন্ধু ভদ্রলোক সাবমেবিন ক্যাপ্টেন ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ডরোথি আমাব অতি প্রিয়জন। আমরা যতবাব জার্মানি গিযেছি, প্রত্যেকবাবই অন্তত ১০/১২ দিন তাঁদের কাছে আমাদেব থাকতেই হত। একষট্টি সালের সেই সফবে তাঁদেব গৃহে আমি তিনমাস ছিলাম। চাচার চিঠি পড়ে ডরোথি আমাকে জড়িয়ে ধবে বলেছিল, 'আমরা জার্মান!' সেই চিঠিটি আমাদের দুই দম্পতিব ঘনিষ্ঠতা যেন আবও গাঢ় হতে সাহায্য করেছিল।

অনুলিখন ।। সমীর দাশগুপ্ত

আড্ডাপ্রিয় সৈয়দ মুজতবা আলী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সৈয়দ মুজতবা আলীকে প্রথম চাক্ষুস করি ১৯৬২ সালের পৌষমেলায়। মাত্র মাস দুয়েক আগে বিশ্বভারতীর Islamic History বিভাগে Reader হয়ে যোগদান করেছেন। কালোর দোকান 'আলো করে রাজাধিরাজের মতো বসে আছেন সৈয়দদা। চারপাশে পাঁচ ছটা টেবিলের লোকজন মুগ্ধ হয়ে শুনছে তাঁর কথা। Islamic History-তে একটিও ছাত্রছাত্রী নেই, তাই অগত্যা জার্মান ভাষা পড়াচ্ছেন। একটি মেয়ে জার্মান ভাষায় সদ্য অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছে। এসে কালোর দোকানে ঢুকল। সম্ভবত বিশ্বভারতীরই কোনো অধ্যাপক আলাপ করিয়ে দিতেই মুজতবা আলী কপালে করাঘাত করে বললেন, 'ইস আমি জার্মান পড়াতে এলুম আর সুন্দরী তুমি বেরিয়ে গেলে। আচ্ছা দেখি কী রকম জার্মান শিখেছ। একটা খিস্তি করতো জার্মান ভাষায়, ভয় নেই কেউ এখানে বুঝবে না'। পরে শুনেছিলাম নিজে যখন মৌখিক পরীক্ষা নিতেন জার্মান ভাষায়, ভয় নেই কেউ এখানে বুঝবে না'। পরে শুনেছিলাম নিজে যখন মৌখিক পরীক্ষা নিতেন জার্মান ভাষায়, সেখানেও নাকি ছাত্রীদের এ রকমই কান লাল করা প্রশ্ন করতেন।

সেবার আমার সঙ্গে তৎকালীন বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সুশীল রায় ছিলেন। তখন ওখানকার নতুন Administrative Building টা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। সুশীলদা প্রশ্ন করলেন সৈয়দদা Administrative Building টা দেখেছেন? সঙ্গে সঙ্গে মুজতবা আলী বললেন, 'হ্যাঁ দর্শন করেছি। শান্তিনিকেতনে যে হারে নতুন নতুন নিকেতন বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে শান্তি কতটা বজায় থাকবে সেটাই প্রশ্ন'।

প্রথম দর্শনে যাকে বলে আলাপ, তা হয়নি। উলটো দিকের একটা বেঞ্চে বসে আমি অপরূপ রূপবান আমার অতিপ্রিয় লেখকটিকে দু চোখ ভরে দেখছিলাম।

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে সৈয়দ মুজতবা আলী পার্ক সার্কাসে আমার বাড়ির পাশে ৫নং পার্লরোডে উঠে আসেন। রাস্তার নাম অন্য হলেও আমি ঠিক তার দুটো বাড়ি পরে সার্কাস মার্কেট প্লেসে থাকতাম। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে শেষবারের মতো তিনি তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ফিরে যান। ১৯৬৯-তেই সৈয়দদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু, যা কলকাতা থাকার শেষ দিন অবধি বজায় ছিল। শেষ দিকে, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে। তিনি প্রায় আমার বাড়িতেই কাটাতেন। বিশেষ করে সন্ধ্যাগুলি, আমার বসার ঘরে। আমার বড়ো পুত্রের তখন বয়স বছর দেড়েক। তাকে বুকে নিয়ে শুয়ে শুয়ে নানা স্মৃতিচারণ করতেন। তার মধ্যে তার নিজের দুই পুত্র ও স্ত্রীর কথা ঘুরে ফিরে আসত। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কবি সাংবাদিক প্রীতীশ নন্দী বাবা মা সহ আমাদের বাড়িতে নীচতলায় ভাড়াটে ছিলেন। প্রীতীশই একদিন সন্ধ্যার পরে আমাকে সৈয়দদার কাছে নিয়ে যায়।

'সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত'—নামটা শুনেই 'বাঁচাও বাঁচাও খেয়ে ফেলল' আমি হতবাক, প্রীতীশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আলী সাহেব ছুটে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আমি ও প্রীতীশ নন্দী মুখ চাওয়াচায়ি করছি। সৈয়দদা কি পাগল হয়ে গেলেন? লক্ষ করে দেখলাম শরীর অনেকটাই ভেঙ্গে গেছে। সেই কাঞ্চনদীপ্ত গৌরবর্ণ অনেকটাই ম্লান। ঘরদোর এলোমেলো, বিছানায় ছড়ানোছিটানো একাধিক বই। একটি বড়ো বোতল শূন্য, আর একটিও অর্ধেক খালি। বুঝলাম খুবই বসে আছেন।

এইসব ভাবনার মধ্যেই সৈয়দদা বাথরুম থেকে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'কী ব্যাপার এখনও তোমরা বসোনি'। মাত্র একটা চেয়ার ছিল ঘরে। প্রীতীশ চেয়ারে আর আমি সসংকোচে বসলাম বিছানার এককোণে। বললেন, 'আমার চিৎকার আর দৌড়ে যাওয়া দেখে ভাবছ আমি পাগল? কিংবা ওই বোতল দুটিতে চোখ বুলিয়ে ধারণা করেছ আমি মাতাল হয়ে গেছি। আরে না না, মোটেও না। আমি সৈয়দের ব্যাটা, যতই খাই না কেন মদ আমার গলা অবধি উঠলেও কখনওই মাথা অবধি পৌঁছোয় না। প্রমাণ চাও?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথের একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা সঠিক যতিচিহ্ন সহ গড়গড় করে বলে থামলেন। বললেন, 'বদ্যিদের আমি বিভীষণ ভয়

পাই (বিভীষণ—আলী সাহেবের ব্যবহার)। কেন, শোনো বলছি। পাঁচটা সাপের বিয়ে একটা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়। দশটা বারেন্দ্র মরলে একটা বদ্যি হয়—তাই অমন ভয়! পরে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিতে দিতে মনে হল আমিও সৈয়দের ব্যাটা। এতদিন তবলগরল নিয়মিত সেবনেও বিষ যখন গলা পর্যন্ত উঠেও বিসমিল্লার দোয়ায় একবারও মাথায় ওঠেনি, তখন একা এই বদ্যি ব্যাটার বিয়ে আমার কী হবে'। বলেই অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'কী ব্রাদার কী রকম চম্পু দিলুম'। এরপর যেন বহুদিনের চেনাজানা এভাবে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ ভাই ওই বোতলগুলির দিকে তাকিও না। ভাগ কিন্তু দিতে পারব না'। আমি তাকাচ্ছিলাম অন্য কারণে। যে নিকৃষ্টতম ব্রান্ডের হুইস্কি তিনি পান করছিলেন, তা খেলে শুধু লিভারই বিনষ্ট হয় না, অন্ধত্বও অনিবার্য।

তারপরই কী একটা প্রসঙ্গে আমি যেই বলেছি, আপনি তো অনেকগুলি ভাষা জানেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, হ্যাঁ ব্রাদার আমি আট দশটা ভাষা misunderstand করতে পারি। কথা বলতে বলতে তিনি মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন ও পান চিবোচ্ছিলেন। পান খাওয়ার ধরনটাও অভিনব। পান একসাথে সেজে খাচ্ছিলেন না। পানের বাটা থেকে পানের পাশের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে মুখে পুরছেন, তারপর বাটায় আলাদাভাবে রাখা চুন একটু আলাদা করে আঙুলে তুলে জিবের শেষ দিকে রাখছেন। একইভাবে সুপুরি, জরদা মৌরি, আলাদা আলাদা তুলে মুখে দিতে লাগলেন। বললাম, 'কাউকে বললেইতো পারেন, পান সেজে রাখতে'। বললেন, 'কী লাভ বলো, সবই তো পেটে গিয়ে এক জায়গায় meet করবে'। পরে জেনেছিলাম একমাত্র কাটু নামক ভৃত্য পরিচারকটি ছাড়া আলী সাহেবকে দেখার কেউ নেই। উপরের তলায় অবশ্য থাকতেন শ্রদ্ধেয়া গৌরী আয়ুব ও আবু সৈয়দ আয়ুব। তাঁরা মুজতবা আলীকে শ্রদ্ধা সহ ভালোবাসলেও তাঁর ছন্নছাড়া এলোমেলো জীবনযাপন প্রণালীকে বহু চেষ্টায় এক তিলও বদলাতে পারেননি বলে হাল ছেড়ে, একসময় থেমে গেছেন।

আলী সাহেব আড্ডার বাদশা ছিলেন। জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলতে না পারতেন। রমণী, রন্ধনকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান আর সাহিত্য তো বটেই। উনিই বক্তা অন্য সকলে শ্রোতা। আর মনের মতো বিষয় পেলে তো কথাই নেই। একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, উনি পৃথিবীর বড়ো বড়ো কবিদের

বৃষ্টির উপর লেখার আলোচনা করে মেঘদূত হয়ে প্রত্যাশিতভাবেই রবীন্দ্রনাথে এসে থামলেন। বর্ষা যখন, তখন ইলিশ প্রসঙ্গ আসাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রে ইলিশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইলিশ যে একমাত্র বাঙালিরই নয় সেটা প্রমাণ করতে বিভিন্ন দেশে ইলিশের নামগুলি বলে গেলেন। জলভেদে, স্রোতভেদে, স্বাদও যে কতটা বদলায় তাও সবিস্তারে বললেন।

তাঁর সদা সহচর কাটুর আসল নাম ছিল শেখ দিলজান। আলী সাহেবই ওর কাটু নামকরণ করেছিলেন। নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করতে তিনি বললেন, 'প্রথমত সে আমার মুরগি কাটে, দ্বিতীয়ত সে আমার মাছ কাটে, তৃতীয়ত শেষ অবধি ও আমার পকেট কাটে'। এক মুহূর্ত থেমেই আবার যোগ করলেন, 'এরকম সহচর কোটিতে গোটিক। আমি আদেশ করলে সে লোকের মাথাও কাটতে পারে। তাই কাটুই ওর যোগ্য নাম'। এক সময় সৈয়দদার একটা অ্যালসেশিয়ান ছিল, তিনি আদর করে তাকে 'মাস্টার' বলে ডাকতেন, প্রচণ্ড আদর করতেন। কুকুরটাও মজার। আলী সাহেব তিন গেলাসের বেশি খেতে আরম্ভ করলেই প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করে শাসন করত। অর্থাৎ আলী সাহেবের উপর মাস্টারি করত। সৈয়দদা বলতেন, 'গত জন্মে এ ব্যাটা নিশ্চয় আমার চাচা ছিল'।

সৈয়দ মুজতবা আলী যখন তাঁর খ্যাতির উচ্চশিখরে, তখন রোজ তাঁর কাছে অসংখ্য চিঠি আসত। তাতে নানান প্রশ্ন থাকত, সঙ্গে থাকত উত্তর প্রার্থনা। সৈয়দদা সমস্ত প্রশ্নগুলির জন্য মোট বারোটি উত্তর ঠিক করে নিয়ে post card-এ তা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন। পঠনপাঠনে অনলস অথচ প্রয়োজনহীন লিখনে স্বভাব অলস আলী সাহেব পোস্ট কার্ডে যে বারোটি উত্তর ছাপিয়ে ছিলেন তা ছিল এই রকম—১ নম্বরে ছিল, প্রশ্নের জবাবদানে তাঁর অনাগ্রহ। এরকম হলে পোস্টকার্ডে ছাপানো উত্তর হত এরকম

'সবিনয় নিবেদন,

আপনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সেইগুলির উত্তর দিবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। অতএব আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অধমের অক্ষমতা মার্জনা করিয়া দিবেন। একাধিক উত্তম গ্রন্থে এই সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাবেন। নমস্কারান্তে সৈ.মু.আ.'

আরও যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর ছাপিয়ে রেখেছিলেন—সেগুলো হল রাজনীতি,

সভাসমিতিতে যোগদানে অনীহা কিংবা অনুরোধ উপরোধে লেখা।

আব একটি মাত্র উত্তর (রাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন) তুলে দিচ্ছি—

'সবিনয় নিবেদন,

দৈনন্দিন রাজনীতি সম্বন্ধে এ অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব আপনি যে সব প্রশ্ন তুলিযাছেন সে সম্বন্ধে অধমেব বলিবাব বা কবিবাব কোনা অধিকারবিধি আমাকে দেন নাই। অতএব সবিনয় অনুবোধ, অধমকে নিজগুণে ক্ষমা কবিবেন।

নমস্কারান্তে সৈ মু আলী'

(কখনও কখনও পুবো নাম সইও করতেন)

মুজতবা আলীব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে কলকাতা বাসেব শেষ পাঁচ বছব। অফিসের কাজে বাইরে না গেলে এমন কোনো সন্ধ্যা ছিল না যে আমবা একসঙ্গে বসিনি। আড্ডা মেরেছি ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে শিখেছিও অনেককিছু। আমাব অনেক সাহিত্যধাবণা তিনি পালটে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সাহিত্য ভাণ্ডাবেব অনেক অজানা খনিব, মণিব সন্ধানও একইসঙ্গে দিয়েছেন। পরনিন্দা পবচর্চা কখনও কবতে দেখিনি। শুধু নিছক বক্তব্যকে বমণীয় কবে তোলাব প্রযাসে যাকে বলে বিশুদ্ধ Humour-এ তা জাবিত কবতেন। আমাব কাছে সে সময দেখতে ছোটো অথচ গুণে বড়ো এবং অনাযাসে বা প্যান্ট বা কোটেব পকেটে লুকোনো যায়, এবকম একটি বিদেশি tape recorder ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, অনেক সময তাঁকে না জানিয়ে লুকিয়ে তা চালিয়ে দিতাম। একদিন তিনি দেখে ফেলেছিলেন এবং খেসারত হিসাবে দু বোতল বড়োমাপেব পানীয় দাবি কবেছিলেন। তাবপর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ওগুলো আমাকে লিখে দিও তো'। শেষ জীবনে যখন তাঁব হাতেব আঙুলগুলি কাঁপত, যখন অ্যালকোহলিক সলিনিউবাইটিস তাঁকে অনেকটাই গ্রাস কবেছে তখন 'দেশ' পত্রিকাব জন্য ধারাবাহিক পঞ্চতন্ত্রের অনেকগুলিই আমাকে লিখতে হয়েছে। সৈয়দদা বলে যেতেন মুখে মুখে, আর আমি লং হ্যান্ডে তা টুকে নিতাম। পঞ্চতন্ত্রর শেষ আটটি কিস্তি আমারই হস্তাক্ষবে অনুলিখিত এবং সৈযদ মুজতবা আলী কথিত ও 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত। এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখজনক স্মৃতিও মনে আসছে। আমি অনুলিখন কবতে কবতে লক্ষ কবে দেখছিলাম ওই লেখাগুলিতে আলী

সাহেবের মেধা, মনন, প্রজ্ঞা, প্রচ্ছন্ন কৌতুকস্ফুরণ কিছুই তেমন কাজ করছে না। ফলে তার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা ক্রমশই তাঁর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠছেন। শেষে একদিন বলেই ফেললুম, 'সৈয়দদা দেশে পঞ্চতন্ত্র লেখা বন্ধ করুন। সাপ্তাহিক যে একশো টাকা করে সম্মান মূল্য পান তা আমিই দেব। আপনি যেমন বলছিলেন, তেমনি বলবেন, এবং আমি যেমন টুকে নিচ্ছিলাম তেমনই নেব, তবে ছাপতে না দিয়ে আমার কাছে রেখে দেব। পরে আপনি যখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন ভালো করে আদ্যোপ্রান্ত সংশোধন করে দেবেন এবং তা ছাপা হবে'। ম্লান হাসলেন। শুনে বললেন, 'সান্ত্বনা দিচ্ছ। আমি কি আবার কখনও কলম হাতে নিয়ে লিখতে পারব?'

প্রথম দিকে যখন ততটা অসুস্থ হননি, তখন শুধু গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে সন্ধ্যায় আমার বাসায় চলে আসতেন। তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে, অনবরত নানান জায়গায় ফোন করছেন। অনেকে বলেন, পিতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেননি। এটা ঠিকই যে তাঁর অনবরত চাকরি ধরা আর চাকরি ছাড়ার কারণে, এবং নিজের নানাধরন বিলাস অমিতব্যয় জীবনযাপনে, প্রায়ই তিনি ডেফিসিট বাজেট মেটাতে ধার কর্জ করে চালাতেন। সেটা উপর উপর দেখে বোঝা যেত না। অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন বলে অতি ঘনিষ্ঠ দু একজন ছাড়া তিনি কারও কাছেই এ বিষয়ে মুখ খুলতেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর দুই পুত্র ও স্ত্রী সম্পর্কে যে কাতর অভিব্যক্তি দেখেছি আজও তা মনে পড়লে চোখ সজল হয়ে আসে।

আমার স্ত্রীকে কন্যাসম ভালোবাসতেন এবং আদর করে সমরেন্দ্রাণী বলে ডাকতেন। রান্নাঘরে মোড়ায় বসে আমার স্ত্রীকে নানান ধরনের রান্না শেখানোই শুধু নয়, নিজেও বহুবার আমাদের রান্না করে নানান পদ খাইয়েছেন। তার মধ্যে মাংসের রোস্টের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। একটা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সকলেই জানেন, পার্ক সার্কাস অঞ্চলেই বিখ্যাত মাংসের নাম তো সকলেই জানেন। আলী সাহেব আমাকে মাংস কিনতে নিয়ে গেলেন সার্কুলার রোড থেকে ট্রাম যেখানে ইলিয়ট রোডে ঢোকে সেই মোড়ের একটি দোকানে। সৈয়দদাকে দেখে দোকানের মালিক লাফ দিয়ে নেমে মুহুর্মুহু কুর্নিশ করে টুল পেতে দিল। প্রায় ৬/৭টা গতরভারী খাসির শব দোকানে ঝোলানো ছিল।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে খুব কাছ থেকে সবগুলি প্রায় বিয়ের কনে পাকা দেখার মতো মনোসংযোগে পরিদর্শন করে একটি থেকে মাংস কেটে দিতে বললেন। ফেরার পথে বললেন, 'মাংস ঠিকমতো কাটতে না পারলে বেশি রক্ত বেরিয়ে যায়, তাতে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। কলকাতার বেশিরভাগ মাংস বিক্রেতা জবাই করতেই শুধু জানে কিন্তু মাংস কাটতে জানে না। এই মাংসওয়ালটা খুব ভালো মাংস কাটে। তাই আমি এ দোকান ছাড়া অন্য কোথাও মাংস কিনতে যাই না। মেডিক্যাল কলেজ-এ ভর্তি করে দিলে এ ব্যাটা anatomy-তে নির্ঘাৎ ফার্স্ট হত। শোনো প্রত্যেক জিনিসেরই নিজস্ব একটা স্বাদ আছে, তাকে যতটা সম্ভব বজায় রেখেই রান্না করা উচিত'। আমার স্ত্রীকে বলতেন, 'তোমরা যেভাবে রাঁধো তাতে মশলার স্বাদই পাওয়া যায়, মূল জিনিসটির নয়। অত তেল ঘি নুন মশলা দিয়ে রাঁধলে ঘাসও খেতে ভালো লাগবে'।

মুজতবার যে অপ্রকাশিত ডায়ারি আমি 'বিভাব' কাগজে ধারাবাহিকভাবে ছেপেছিলাম তাতে আলী সাহেবের রান্নার অনেক রেসিপিও ছিল। একই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব ছিল তাতে। একটি অপ্রকাশিত ইংরেজি ডায়ারি আজও আমার কাছে আছে। বাংলা ডায়ারিটি ছাপলেও ইংরেজিটি ছাপিনি। কেননা মুজতবা আলী তাঁর বাংলা লিখনশৈলীর জন্যই মুজতবা আলী—ইংরেজির জন্য নয়। তাছাড়া ইংরেজি ডায়ারিতে কিছু এখনও জীবিত লেখক সম্পর্কে অসহিষ্ণু মন্তব্য আছে, তাই এখন তা না ছাপাটাই শ্রেয়। পরে না হয় এ সম্পর্কে ভাবা যাবে। আমাকে লেখা বহু চিঠি ইতিপূর্বে মৎ সম্পাদিত প্রথমে কৃত্তিবাস, বিভাব দেশ এবং শেষে পাক্ষিক বসুমতীতেও প্রকাশিত হয়েছে। তাই এ লেখা শেষ করার আগে মুজতবার ডায়ারি থেকেই কিছুটা নতুন অংশ তুলে দিচ্ছি। এখনও অনেকের কাছে এই অংশ অজানা—

"*এদেশে কেউ কখনও ডাইরি রেখেছেন বলে শুনিনি।* কড়চা শব্দটি রোজনামচা অর্থে ব্যবহার ঠিক নয়। কড়চা বরঞ্চ নিঘন্ট বা নির্ঘন্ট অর্থে কড়চা

কেন?

প্রাচীনকালে এ দেশে কী চিত্রকর, কী লেখক, কী ভাস্কর, কী নৃপতি, নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ করে দিতে চাইতেন। এ বাবদে ইউরোপীয় লেখকরা একটা contradiction-এর মাঝখানে বাস করেন। একদিক দিয়ে তাঁর

বলেন, আমার personal life আমার, সেখানে নাক গলাতে এসো না। আবার অন্যদিক দিয়ে কেউ যদি কোনো লেখকের দুটি লাইন চুরি করেন তবে তেড়ে হাঁকেন, আমার লেখা থেকে করেছে ওই লোকটা। তা হলে সোজাসুজি বলো, তোমার লেখাও তোমার private life এর মতো private property। না হলে স্বীকার করো, লেখক হিসাবেও তোমার কোনো public property নেই। তুমি সর্বত্রই private।

আর একটা কথা, তুমি যখন সাড়ম্বরে তোমার বইয়ের মলাটে তোমার নাম প্রকাশ করেছ, তোমার জীবন সম্বন্ধে ইচ্ছা অনিচ্ছার উপক্রমনিকায় কিছুটা প্রকাশ করে ফেলেছ, প্রকাশককে তোমার ফটো ছাপতে দিয়েছ, ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছুটা blurb লেখার অনুমতি দিয়েছ তখন পাঠকেরও হক আছে, বাকিটা জানবার। এটা তো আর একতরফা মোকদ্দমা নয়।

ছদ্মনামে বা বেনামিতে যে বই লেখেন---ধরেঁ নিচ্ছি কাপুরুষের মতো অন্যকে আক্রমণ করার জন্য সে বেনামিতে গা ঢাকা দেয়নি---তার সম্বন্ধে, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণের কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কারণ সে খ্যাতি চায় না, তার পদমর্যাদা বা অন্য কোনো ভারের জোরে সে তাঁর বক্তব্য পাঠকের উপর চাপাতে চায় না।

জিদ্ (আন্দ্রে জিদ্) সব সময় ভয়ে মরতেন পাছে লোকে ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শেষ পর্যন্ত না শোনে।

আমার সব সময়—নিজের লেখার কথা বলছি—ভয়, যথেষ্ট সরল করে বলতে পেরেছি কি?

আমার লেখার সবচেয়ে বড়ো দোষ—বিস্তর parentheses. ব্রাকেট দিয়ে সংশ্লিষ্ট কথা বলা, ফুট নোট, লম্বা dash ইত্যাদি। সোজসুজি হ্রস্ব হোক, দীর্ঘ হোক, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা reference মনে পড়ছে সেগুলো অকাতরে বিসর্জন দিয়ে, মোদ্দা কথাটা বলে যাওয়া। Perfect logical thinking power না থাকলে এসব 'বাস্তর' 'অবান্তর' সবকিছুই মূল বক্তব্যের সঙ্গে weave in করা যায়। লম্বা ড্যাশ, ব্র্যাকেট, গৎ দ্বারা রচনা কণ্টকিত করে।"

(১৯৬৭—তারিখ অস্পষ্ট)।

আনা মারীকে লেখা একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করছি। চিঠিটি আনা মারীকে লেখা সৈয়দদার শেষ চিঠি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা। তাতে অনুমিত হয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগেও আলী সাহেব জার্মানিতে ছিলেন। এবং সেটাই তার শেষ জার্মান যাত্রা।

আনা মারীকে লেখা চিঠি---

5 Pearl Road, Calcutta-17
P.O. Circus Aveune 6.6.71

My dearest anne marie,

I have nothing better than this post card, which please forgive. At long last I got news from a professor who walked all the way from Dacca. But this is 3 weeks old. Meanwhile the military regime is doing everything in its power to crush the freedom movement in East Bengal. The mother (সৈয়দদার স্ত্রী), Inspectress of schools at Dacca is being pestated to open all schools she has. But if girls refuse to attend what can she do? And the boys ([illegible] কথা). If they want to go out and join the freedom-fighter how can she stop them? Do please write to me as often as you can, al though I may not be able to reply. With the very best wishes

Yours Syed

P.S. Your Govt. has given us (for freedom fighter) some money for which our heart has no words.

এদিকে পানীয় এসেছে। মানুষটার মুখে তখন গল্পের খই ফুটছে। শুনতে শুনতে মুগ্ধ আমি একবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনি উঠেছেন কোথায়?'

'কেন হে? সে শুনে কি তোমার ন্যাজ গজাবে? উঠেছি কনস্টিপেশন হাউসে।'

সে আবার কি? আমি তো থ। উপস্থিত সবাই কিন্তু হাসছে। আমার মুখ দেখে বোধহয় মায়া হল, হাসি সামলে বললেন, 'বুঝলে না? কনস্টিটিউশন হাউস। ওকেই আমি বলি কোষ্ঠকাঠিন্য ধাম।'

এই হলেন মুজতবা। সেদিন আমাদের প্রথম মোলাকাত।

এরপরে 'দেশে-বিদেশে' পড়ে একটা চিঠি দিলাম। তুরন্ত জবাব এল। পত্রালাপ চলল কিছুদিন। তখনো আমি নানা জনের ফরমাশ খেটে বেড়াই। সেরকম অকাজেই একবার পাটনায় গেছি। উনি তখন আকাশবাণীর পাটনা কেন্দ্রের অধিকর্তা। গেলাম তাঁর বাড়ি।

দেখেই চিনলেন, 'তুমি সে চাটুজ্জে না?'

গালগল্পের ঘোরে দুপুর হল। শুধোলেন, 'আহারাদি কোথায় হবে।'

'আজ্ঞে, যেখানে উঠেছি, সেখানেই '

'কেন সেখানে কেন? এখানে হতে দোষ কী? আমি মোছলমান—তুমি নৈকষ্যি কুলীন, তাই কি?'

'ওসব মানি না।'

'বেশ মান না যে আজ তার প্রমাণ দাও। ভয় পেয়ো না—গরু দেব না পাতে।'

এরও দু-এক বছর বাদে উনি কলকাতায় এসে হাজরা রোডে এক বন্ধুর বাড়ি উঠেছেন শুনে গেছি। কলকাতায় পা দিয়ে তিনি যে শুধু স্থানের নয়, প্রাণের দিক দিয়েও কাছে এলেন—সে কথা প্রথম ডাকেই বুঝলাম। সস্নেহে প্রথম 'তুই' বলে ডাকলেন। 'চাটুজ্জে আয়—বোস।'

সেই শুরু। তারপর থেকে সন্ধে হতে না হতেই রোজ আমি তাঁর পার্ল রোডের বাসায় গিয়ে হাজির। জমাটি আসরের তিনিই মধ্যমণি। আমরা অর্থাৎ নেহাৎ প্রাকৃতজনেরা তাঁর বাণীসুধা পান করেই ধন্য। সে আসরে কেউ বয়সে বা মর্যাদায় ছোট বড় ছিল না। ধোঁয়া আর তরল—দুই-ই চলত অফুরান। গল্পের

আঙিনায় কোন নিষেধের চৌকাঠ ছিল না। বরং আদি বসেরই প্রাবল্য থাকত। আমি রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। প্রথম প্রথম লজ্জা পেতাম—পরে সে সব কেটে গেল।

আজ ভাবি, কোন্ অধিকারে সে আড্ডায় যেতাম! তাঁর মতো পণ্ডিত মানুষ কী করে মেনে নিতেন এক আনপড় যুবকেব উপস্থিতি! অকুণ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তাঁর কাছে আগত গুণীজনেদেব সঙ্গে তার আলাপ কবিয়ে দিতেন কেন? কেন না আসত সে আড্ডায়। সমকালীন সাহিত্য জগতেব তাবৎ ব্যক্তিত্বের আনাগোনা ছিল তাঁব ঘরে। অবধূত, আইয়ুব দম্পতি, নিবঞ্জন মজুমদার (বঞ্জন), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাগবময় ঘোষ—কে নয়? আবাব তাঁব সঙ্গে বিশ্বভাবতীব সমাবর্তন উৎসবে গেছি। পণ্ডিত নেহরুব গাড়ি আসছে। পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে সৈযদদা আদাব জানালেন—গাড়িব গতি কমল, পণ্ডিতজী মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'শামকো মিলেঙ্গে আপকে সাথ্।' তখনো এই অভাজন পার্শে হাজিব।

কী জানি, কী পেতেন আমাব মধ্যে। সন্তানেব মতো ভালবাসতেন। একবাব যেতে একটু দেবী হয়েছে, শুধোলেন, 'কী হল? দেবি যে?'

বললাম, 'ঘড়ি নেই'। শুনে তখন কিছু বললেন না। পবেব বাব বিদেশ থেকে ফিবে একটা দামী ঘড়ি উপহাব দিলেন। আরেক বাব বললেন, 'তোব মাযেব সময কাটে কী করে? একদিন যাব তোদেব বাড়ি'।

আমবা থাকতাম মসজিতবাড়ি স্ট্রিট-এ। নামেই স্ট্রিট, আসলে ছোট গলি। উত্তব কলকাতায এমন গলিঘুঁজি বিস্তব। এখানে জীর্ণ বনেদী বাড়ি আর বস্তিব ঠাসাঠাসি অবস্থান। ছোট গলিতে থাকতে থাকতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদেব মনও কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে। একদিন গেরুযা ধুতি-পাঞ্জাব-শাল পবিহিত এক রূপবান মানুষ সেই গলিতে এলেন।

মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। পবে আমাকে দিয়ে তাঁর জন্যে একটা বিদেশী ট্র্যানজিস্টার পাঠিয়েছিলেন। এদিকে তাঁব অভিজাত রূপ দেশে পড়শিরা কৌতূহলে ফেটে পড়েছেন। কে ইনি? ইনি মুজতবা আলী। শুনে মধ্যবিত্ত ভুরু কুঁচকে উঠল। 'মুসলমান!'

এমনই দরিদ্র, বদ্ধ আর হীন ছিল আমার পরিবেশ। তাঁর হাত ধরে রোজ সন্ধ্যায় আমি এই ক্ষুদ্রতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম। কোনদিন যেতাম বার্লিন।

প্রশস্ত রাজপথ কুরফুর্স্টেন-ডামে হাঁটতে হাঁটতে উলাণ্ড স্ট্রাসের মোড়। দু-তিনটে বাড়ি ছেড়ে 'হিন্দুস্তান হৌস্'। তাঁর সঙ্গী হয়ে প্রবাসী ভারতীযদের আড্ডায় ভিড়ে যেতাম। কোনদিন আবার নিয়ে যেতেন পেশোয়ার। সেখানে বাজারে বসে আহমদ আলী ও তার ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে ননস্টপ গুলতানি। চোখ তুললে দেখতে পেতাম তুষারশীর্ষ পাগমান পাহাড়। মাঝে মাঝে কায়রোর 'কাফে দা-নীলে'তে ঢুঁ মারতাম। ভাষা কখনোই সমস্যা হত না। যাঁর সঙ্গে আমার এই মানসভ্রমণ, তিনিই শিখিয়ে নিতেন নানান ভাষা। আড্ডা দিতে দিতে আমি জেনে যেতাম ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব, মদ্যবিজ্ঞান (enology) খৈয়ামের রুবাইয়াৎ, মায় প্যারি[illegible] নটীবৃন্দমহলে প্রচলিত সাম্প্রতিকতম চুটকি.।

[illegible] শখ মেলে না। প্রহর ফুরিয়ে আসে। আমার [illegible] দিনযাপনে হঠাৎ ছেদ পড়ল। উপায়ী দুই দাদার একজন আচম্বিতে মারা গেলেন। অভাব চিরকালই আমাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকত। এবার সে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল। [illegible] উচিত, কিন্তু কী করব? লেখাপড়া তো শিখিনি। [illegible] পূর্বসভায় একটা চাকরি খালি আছে, কিন্তু মুরব্বি [illegible]

[illegible] না। বেশ কিছুদিন অদর্শনের পর তিন [illegible] চারদিন বাদে। দেখেই শুধাল, 'ন্যাড়া! বেশ মোটা হয়েছে দেখছি। [illegible] আসিস না।'

সমস্ত খুলে বললাম। পূর্বসভার চাকরিটার কথাও। শুনে বললেন, 'একটা কেষ্ট-বিষ্টু গোছ্ লোকের নাম বল দিকি, যাকে ধরলে তোর চাকরিটা হবে।'

জনৈক মণ্ডলের নাম বললাম। সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন। 'ওসব চাঁড়াল-টাঁড়াল বাদ দে। চিনি না আমি।' আবার বললাম এক নস্করের নাম। 'সিডিউলড কাস্ট। একেও চিনি না। আচ্ছা, দু-চাড্ডি ভাল লোকের সন্ধান রাখতে পারিস নে? বল্ দিখি, অতুল্যকে বললে হবে কি না?'

অতুল্য ঘোষ তখন ভারতীয় রাজনীতির কিংমেকার। কপাল ঠুকে বললাম, 'হবে'।

'তবে চল আমার সঙ্গে বোলপুর। একটা চিঠি লিখে দেব।'

দুপুরে বোলপুর পৌঁছলাম। দিবানিদ্রা সেরে উঠে সন্ধে থেকে পানে

বসলেন। কিছুটা পরে দেখি নেশার ঝোঁকে কাঁদছেন। কী হল? বললেন, 'শোন চাটুজ্জে, আর যাই করিস, মাকে কখনো দুঃখ দিস না। আমাকে দেখ—সেই চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের অমতে শান্তিনিকেতন চলে গেলাম। বয়স তখন কম মনে লেগেছে বাইরের নেশা—মায়ের দুঃখ বুঝিনি। এখন ভাবি, মা আমার কত না জানি কেঁদেছেন। ভাবি, আর আমিও কাঁদি।'

কথায় কথায় রাত বাড়ে। হঠাৎ খেয়াল হল, 'ওরে, তোর তো রাতে খাওয়া হল না।'

'তা হোক।'

'না না—দেখ্‌তো ঝুড়িতে কী আছে?'

দেখি অনেকগুলো আপেল। কোনটা আধখাওয়া, কোনটা বা খেয়ালমত এক কামড় মেরেছেন। দু-একটা ভাল বেছে খেলাম। 'আপনি খাবেন না?'

'আমার কথা ভাবতে হবে না। তুই শুগে যা। মাস্টারকে বলে দিচ্ছি, কোন ভয় নেই।'

মাস্টার তাঁর পোষা অ্যালসেশিয়ান। কী তাকে বললেন খোদায় মালুম, সারারাত সে আমার ক্যাম্পখাটের নিচে ঘুমোল। সকালে উঠে এদিক দেখে মনে হল ভোররাত অবধি পান চলেছে। কাগজে কলম ঠেকাচ্ছেন— হাত এত কাঁপছে যে লেখা পড়ছে না। বললেন, সর্বনাশ! এখন দেখছি খোয়ারি ভাঙতে দু-পাত্র খেতে হবে। যা দেখি সাইকেল নিয়ে। স্টেশনের কাছে ভগৎ ভাইয়ের দোকান থেকে আমার নামে একটা পাঁইট নিয়ে আয়।'

অগত্যা যেতে হল। দু-পাত্র নির্জলা সেবনের পর দেখি হাত পুরো স্টেডি। ছোট্ট চিঠি লিখলেন অতুল্যবাবুকে।

তাই নিয়ে গেলাম তাঁর চৌরঙ্গি রোডের আপিসে। স্লিপ পেয়ে ডেকে পাঠালেন। কী ব্যাপার জানতে চাইলেন। সব বললাম। প্রথমে না না করেও শেষে গোবিন্দ দে-কে একটা চিঠি লিখলেন। উঠে আসছি, অতুল্যবাবু শুধোলেন, 'সৈয়দদা কি এখনো যথেচ্ছ ড্রিঙ্ক করেন?'

বললাম, 'সব সময়'।

'ঠেকাতে পার না? অত পণ্ডিত মানুষ—এভাবে নিজেকে শেষ করছেন।'

মাথা নিচু করে চলে এলাম।

গোবিন্দ দে পরে পুরসভার মেয়র হন। তখন তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান (ফিন্যান্স)। তাঁর কাছে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর চাকরি হল। কিন্তু, এক হাজার টাকা 'কশান ডিপোজিট' লাগবে। এত টাকা কোথায় পাব?

শেষপর্যন্ত অবশ্য সৈয়দদাই হলেন মুশকিল আসান।

চাকবি হয়েছে শুনে খুব খুশি। বললেন, 'এতদিন আমাব চেলাগিরি করলি—কিন্তু, সে গুরুমাবা বিদ্যে তো কর্পোবেশনে কোন কাজে লাগবে না। ওখানে তোকে মাবতে হবে মাছি।'

সবিনয়ে বললাম, 'ভুল কবছেন, কেরানি হইনি আমি। হয়েছি বেলিফ। ট্যাক্স আদায় কবা আমাব কাজ। জানেন তো, মদ খেলে ট্যাক্স দিতে হয়। ভাবছি, এবার থেকে সেই ট্যাক্স নেব, তাতে যদি মদ্যপান কমান..'

শুনে হা হা কবে খুব হাসলেন কিন্তু কেমন যেন করুণ শোনাল সেই হাসি। একসময হাসি থামিযে বললেন, 'লীবার ইডিয়ট (প্রিয় মুর্খ), মাই কাপ ইজ স্মল টু, বাট আই ড্রিঙ্ক অফ্‌নাব। তোবা ডবপোক্, জীবনপাত্র থেকে পান কবিস ঢুকু ঢুকু—মনে ভয, এই বুঝি ফুরোল। আমাব ধক্ বেশি, ঢক্‌ঢক্ কবে খাই, বাববাব শূন্য পেযালা পূর্ণ কবে নিই।'

সে কথা ঠিক। ছোট আমাদেব গণ্ডুষ। কতটুকুই বা নিতে পেবেছি তাঁব আনন্দধাবাব অকুণ্ঠ দান?

আলীসাহেব বাড়ী নেই

মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়

'কাকে চাই?'

'সৈয়দ মুজতবা আলীকে।'

'আলীসাহেব বাড়ি নেই।'

তিনি তো আছেন আমার মননে। আমার সাহিত্যচেতনায়। রসানুভূতির আনন্দ জুড়ে তাঁর চিরকালীন বাস। তবে রক্তমাংসের নৈকট্যে তাঁকে পেয়েছিলাম মাত্র একদিন। শান্তিনিকেতনে।

এই সেই আশ্চর্য দিনের কাহিনী।

তখন আমি একটি স্কুলে পড়াই। কয়েকজন সহকর্মী দলবেঁধে একবার, বেড়াতে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন। তবে পৌষমেলা উপলক্ষ্য করে নয়। তাতে আমার বিশেষ অনীহা। কোন জায়গার স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে উৎসবের মরশুম এড়িয়ে চলাই ভালো।

এক সহকর্মীর আত্মীয়ের বাড়িতে আস্তানা হল। ঢোকার দরজার বাঁদিকে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তার বাইরেটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। আর অবাক কাণ্ড। আমাদের বাড়িটার আঙিনাও পুষ্পাকীর্ণ। জানলাম, এ হল 'কবি'র নির্দেশ। ফুল তোলা যাবে না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দু-একটি গাছ অবশ্য লাগানো যেতে পারে। কিন্তু, বাদবাকি গাছের নীচেই বিছানো থাকবে তার ঝরে পড়া ফুল। মন ভরে উঠলো এক সুন্দর সুগন্ধে।

তখন কি জানি আরো এক অপূর্ব বিস্ময়ের ডালি আমার জন্য সাজানো হচ্ছে। যে বাড়িটায় উঠেছিলাম, তার একটি ঘর ছিল নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অনায়াসে চোখ চলে যেত প্রতিবেশীর অন্দরে। পৌঁছুবার পরদিন দেখি এক বয়স্ক ভদ্রলোক সেই কোমর-উঁচু পাঁচিলের উপর বসে চাকরকে রান্না শেখাচ্ছেন, পরণে সবুজ লুঙ্গি। বারবার কষিটা খুলে যাচ্ছে, কিন্তু, ধৈর্য ধরে বাঁধবারও সময় হচ্ছে না।

'কে উনি?'

যাঁব বাড়িতে উঠেছি, তিনি জানালেন, 'উনি মুজতবা আলী।'

সেই মুহূর্তে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। মনে হল জগতে আব কেউ নেই, শুধু আমি আব ধবাছোঁয়াব দূবত্বে নেমে আসা আমাব সেই কল্পলোকেব সাহিত্যিক। কেমন বেপবোয়া হয়ে উঠলাম, 'আমি যাচ্ছি ওঁব সঙ্গে আলাপ কবতে।'

'উনি কাবও সঙ্গে দেখা কবেন না। সন্ধেব পবে তো কথাই নেই।'

বললেই হল! আমাব তৎক্ষণে জেদ চেপে গেছে। বললাম, 'আমি যাবই। যতক্ষণ না মেবে তাড়াচ্ছেন, আমি চেষ্টা কবব।'

চললাম। দেখি, অন্য সহকর্মীবাও সঙ্গ নিয়েছে। পাশেব বাড়ি। দবজায় খড়ি দিয়ে বড় বড় কবে লেখা, 'দেখাশোনা বাত্রি ৯টা থেকে ১০টা'। বাকিবা বললো, 'দেখছো, কি লেখা?'

আমি বললাম, 'তোমাদেব তো আসতে বলিনি। তোমবা ফিবে যেতে পাবো।'

কেউ অবশ্য ফিবলো না। কড়া বা কলিংবেল কিছু নেই। অগত্যা দবজায় ধাক্কা দিতে তিনি স্বয়ং লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে এসে দবজা খুলে দিলেন। দুচোখ ভবে তাঁকে দেখলাম। ফবসা বং। ঠিক মোটা নন, তবে ভুঁড়িটা ভালোই। চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তাঁব যুবাবয়সেব একটি ছবি দেখেছিলাম---তাতে তিনি যথেষ্ট রূপবান। অথচ, এখন আমার সামনেব মানুষটি আদৌ সুদর্শন নন। তবু, কি যেন আছে তাঁব মধ্যে— চেয়ে থাকতে হয়। সে বোধহয় তাঁব প্রতিভাব দীপ্তি।

'কাকে চাই?'

'সৈয়দ মুজতবা আলীকে।'

'তিনি তো এখন বাড়িতে নেই। আমি তাঁব চাকব। কি দবকাব বলে যান, এলে জানিয়ে দেবো।'

এবাব আমি বললাম, 'তিনি তো স্বয়ং আমাব সামনে দাঁড়িয়ে। আপনাকে আমি চিনি।'

আমাব আপাদমস্তক দেখলেন। লুঙ্গি বাঁধা কিন্তু চলছেই ঘনঘন। ভুঁড়িব জন্য বাববাব খুলে যাচ্ছিল ওটা। বললেন, 'লেখাপড়া জানো? দবজায় কি লেখা আছে?

আমি নাছোড়বান্দা। 'কাল তো এসেছিলাম।'

এবার লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে একগাল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, সন্ধের পর আমি অসুস্থ হয়ে যাই। কিন্তু, কেউ যেন চেয়ার চেয়ে বসো না। আমার চেয়ার নেই।'

বললাম, 'চেয়ারে বসতে আসিনি। এসেছি 'চাচা'কে দেখতে। তিনি ঠিক বইয়ের বর্ণনার মত ঠক ঠক করে কথা বলেন কি না।'

'কি দেখলে?'

'মিলে গেছে। লুঙ্গিটা বাঁধেন না কেন? খুলে যাচ্ছে বারবার।'

আবার একগাল হাসি। সঙ্গে সস্নেহ বিশেষণ, 'ওরে ন্যাজকাটা, তোমার তো খুব সাহস। আসলে আমার লুঙ্গি বাঁধবার ধৈর্য নেই। দেখছো না ভুঁড়িটা। ওটার জন্য লুঙ্গি খুলে যাবেই। তা এত কথা কেন? তুমি দেখছি আমাকে দিয়ে চেয়ার বওয়াবেই।

'মোটেই না। মাটিতেই বসব।'

ও, মাটিতে বসবে আর লোকের কাছে গিয়ে বলবে, কি লোকরে বাবা! ঘরে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই।' এই বলে ঘর থেকে একটা চেয়ার [illegible] আনলেন। চাকরকে ডাকলেন না।

আমরা নিয়ে আসি না-

খবরদার! ঘরে ঢুকলে তোমার চরিত্রের দোষ দিয়ে তোমার বাবাকে চিঠি লিখবো।'

'লিখুন। সেটা আমার অমূল্য পাওনা হবে।'

'ও ও-ও। ন্যাজকাটার মাথায় ফন্দি আছে তো! যাক খালাস পেলে। চা খেতে চেও না যেন।'

'বসতে পেরেছি এই ঢের।'

'ন্যাজকাটার ঠোঁটটাও দেখছি কাটা।' বলেই অনাবিল হাসি। একবার ভিতরে গেলেন 'আসছি' বলে। দেখলাম, চা এল।

'চা চেও না।'

'কিছু চেয়েছি? বলেছি তো, শুধু আপনাকে দেখব। ব্যাস।'

'হুঁঃ! ফিরে গিয়ে গল্প কর আর কি! এক কাপ চাও জুটল না।'

আড্ডা আড্ডা-আড্ডা। কয়েকটি সাধারণ মেয়ের সঙ্গে এক অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ

ব্যক্তিত্বের এত অনায়াস অনাড়ম্বর কথোপকথন—একি আজকের পেশাদারিত্বের যুগে আর সম্ভব? আমরা স্কুলে চাকরি করি শুনে নিজের শিক্ষকতার গল্প শোনালেন। তারপর চলে গেলেন দিল্লিতে কর্মজীবনের গল্পে। নানা স্বাদের গল্প না তো, যেন রসালো ফলের বিচিত্র সম্ভার। মাঝে মাঝে আপাত অশ্লীলতার ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে কাহিনীতে। এক একবার থেমে বলছেন, 'লজ্জা পেয়ো না। এ গল্পটা অশ্লীল মনে হতে পারে।' বলেই আমাকে সরাসরি আক্রমণ, 'তুমি লুঙ্গির কথা কি বলছিলে না? তবে তো তুমি ন্যাজকাটা। ওদের কথা ভাবছি।'

এর মধ্যে চাকর এসে কতবার যে তাগাদা দিয়ে গেল। লোকে নিজের স্বার্থের কথাতেও সময়ের ঠিক রাখে। আর উনি? আমরা ওঁর 'রসিকতা'র রস যথার্থ গ্রহণ করতে পারছি কিনা, সে খেয়াল পর্যন্ত নেই। আসলে 'নিজের মন যেমন, জগৎ দেখি তেমন' প্রবাদটা তো একদিনে তৈরী হয় নি।

আমার সহকর্মীরা বেশ উসখুস করছিল। ওদের আবার সবকিছুই 'চলো নিয়মমতে'। যেন ইচ্ছে করলেই মুজতবা আলীর দেখা মিলবে। আর ওই দুর্লভ মেজাজটাও (আজকের বাংলায় মুড) যেন সহজলভ্য। আমি তো নিষ্পলক শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছি। হঠাৎ বললেন, 'মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো? এই দাগগুলো?'

আমি তো থ। 'কোন দাগ?'

'এই যে ব্রণের মত দাগ হয়েছে। কেন জানো? ওই যে সন্ধের পর অসুস্থ হয়ে পড়ি---তারই চিহ্ন এগুলো।'

কি অকপট স্বীকারোক্তি। কিন্তু, বলার সময় রসময় মানুষটির সদা উচ্ছল কণ্ঠে যেন কান্নার চকিত মীড় লাগলো।

আমি ঘরের ভিতরটা দেখছিলাম। অজস্র লেখা কাগজ ছড়িয়ে আছে। সাহসভরে বললাম, 'কাগজগুলোয় তো সব আপনার লেখা---কুড়িয়ে রাখবো?'

'রাখবে? ওতে অনেক লেখা। একটু গুছিয়ে নিয়ে ছাপতে দিলেই হয়। তুমি আমার সেক্রেটারি হবে? মাইনে দিতে পারবো না।'

'মাইনে চাই না। খাওয়া-পরা কিচ্ছু নয়। শুধু চাই আপনার অনুমতিটুকু।'

হঠাৎ কেমন বদলে গেলেন তিনি। এত কাছে বসে থাকা মানুষটির স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল, 'নাঃ থাক। কি হবে?'

'কি হবে মানে? আপনি জানেন, ওগুলো আমাদের কাছে কি অমূল্য সম্পদ?'

'জানি। তোমার মত আরো কয়েকজন বলেছে আমাব এই লেখাগুলো গুছিয়ে বাখাব কথা-—'

'আমাকে অনুমতি দিন না—'

'না। তুমি ভাল কবে সংসাব কবগে যাও।'

এবপর আনন্দবাগিণীর সুব কেটে গেল। চাকব এসে আব একবাব তাড়া দিয়ে গেল। ততক্ষণে তিনটে বেজে গেছে। সহকর্মীবাও উৎসুক বাড়ি যেবাব জন্য। উঠলাম।

উঠোনে একটা জোড়া-টগব গাছ। ফুলে ফুলে ভবে গেছে। উনি বললেন, 'এখানে ফুল তোলা নিষেধ। গুরুদেব পছন্দ কবেন না। আমিও না। ফুল গাছেই সুন্দব। ঝবে গেলে গাছতলাটিও সুন্দব হয়ে ওঠে। তবু তুমি তো নাছোড়বান্দা। তোমাব জন্য একটু অবাধ্য হই।'

সেই শুকনো ফুলটা আজও আমাব কাছে বয়েছে। আব এক আশ্চর্য দিনেব স্মৃতি, যেদিন সেই অসাধাবণ মানুষটিব দুর্লভ সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণেব জন্য মিলে গিয়েছিল তাঁব প্রাণেব বসোচ্ছল বাবাব অকুণ্ঠ দান। কিন্তু, ছুঁতে পাবিনি একাকী অভিমানের নেপথ্যে বসে থাকা বিষণ্ণ তাঁব হৃদয়। জানা হয়নি, কেন তিনি সঙ্গে হতেই বিস্মৃতিব সাধনায় বসতেন? পৃথিবীব দেশে দেশে ঘুবে বেড়ানো হুল্লোড়ে আড্ডাবাজ মানুষটি কেন ওভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন চাবপাশেব জগৎ থেকে?

আজও সেই দিনটাব কথা মনে পড়লে কানে বাজে, 'আলীসাহেব বাড়ি নেই।'

সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনী

আমিনুল হক

"এমন কোনো বাণী নেই, এমন কোনো Message নেই যা না বললে এই সোনার বঙ্গভূমি কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সর্বোপরি আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সর্বসমক্ষে কোনো কিছু বলতে বড়ই লজ্জা বোধ করি। হয় সত্য গোপন করতে হয়, নয় তাহা মিথ্যে কথা কইতে হয়।" নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রচারবিমুখ সৈয়দ মুজতবা আলীর অকৃত্রিম, অকপট স্বীকারোক্তি। সেই অর্থে যাকে আত্মজীবনী বলা হয়, লেখেননি তিনি। তবে ছিল একটি 'ডাইরি বুক'। সেখানও আর পাঁচজনের মত 'রোজনামচা' লিখে পাতা পূরণ করেননি। 'ডাইরি বুক'-এ ছিল মূলত নানা ভাষার বচনামৃত, বিবিধ উদ্ধৃতি, টুকরো টুকরো খবরের মালা আর আশ্চর্য কিছু স্বীকারোক্তি। যাকে এক অর্থে স্বগতোক্তি বলাই সঙ্গত। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ডাইরি বুক' ছিল অন্তহীন জিজ্ঞাসারই প্রতিফলন। তিনি মনে করতেন "My life is an open book."

জন্মেছিলেন আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে, ১৯০৪-এ। বিভাগোত্তরকালে করিমগঞ্জ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। এত বড় একটি মানুষের জন্ম সাল এবং তারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলেই দ্বিধা এবং সংশয়। এ সবের মূলে রয়েছে বিভিন্ন চিঠিপত্রে আলী সাহেবের নিজস্ব কিছু মন্তব্য। তখনও এই পরিবারে নবজাত শিশুর জন্মতারিখ লিখে রাখার সুরীতির প্রচলন ঘটেনি। উত্তমপুরুষে লেখা 'শবনম'-এ পাওয়া যায়—"কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মার মুখে শোনা।" মায়ের মুখের কথাকেই তিনি নিজে জন্মতারিখের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী খানবাহাদুর ছিলেন রেজিস্ট্রেশন-বিভাগের চাকুরিয়া। মাতা আয়তুল মান্নান খাতুন ছিলেন বাহাদুর পরগনার রাগপ্রচণ্ডখাঁ গ্রামের বিখ্যাততম জমিদার মোহসেন চৌধুরীর কন্যা। খানবাহাদুর সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"১৯০৫ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে আমি হাইলাকান্দিতে সাব-রেজিস্ট্রার রূপে যোগদান করি। এর অল্পদিন আগে আমার তৃতীয় পুত্র সিতুর (মুজতবা আলী) জন্ম হয়েছে।" ম্যাট্রিক পরীক্ষার সনদেও সেই সময়ের প্রথামাফিক লেখা হয়েছে শুধু—২১ বৎসর ৬ মাস। তাঁব মধ্যমভ্রাতা লিখেছেন---"সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর।" অমলেন্দু সেনেব কাছে লেখা একটি চিঠিতে সৈয়দ মুজতবা আলী স্বয়ং জানাচ্ছেন---"আমি জন্মেছি, ১৯০৪—জন্মাষ্টমীব দিনে।" একই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্যিক জবাসন্ধেব কাছেও। ১৯৭২ সালের ১৮/১৯ সেপ্টেম্বর তাবিখে লিখিত একটি পত্র। লিখছেন তাঁরই সম্পর্কিত এক পৌত্রকে—"I am in fact actually 68 years and 14 days 'young' today I should have celebrated my birth day on the 31st August last which happens to be the Janmastami day of the Hindus" পঞ্জিকা অনুসবণ কবে দেখা যাচ্ছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মাষ্টমী ব্রত ছিল ২রা সেপ্টেম্বব। পশ্চিম জার্মানিব বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁব বিখ্যাত গবেষণাপত্র "The origin of the Khojahs and their religious life to day"-তে আলী সাহেবেব জীবনীতে উল্লেখিত বাক্যও এ প্রসঙ্গে স্মবণ কবা যেতে পাবে---"I was born on the 13th September in 1904 at Karimganj, Sylhet in India

সবকাবি নথিপত্র, সংসদ বাঙালি চবিতাভিধানেব সাক্ষ্যতে ১৯০৪-এব ১৩ সেপ্টেম্ববকেই সৈয়দ মুজতবা আলীব জন্মতাবিখ বলে ঘোষণা কবা হয়েছে।

ডাক নাম সিতা। সৌম্যদর্শন, গৌববর্ণ, শাণিত মুখাবয়ব। চেহাবাব সঙ্গে মিলিয়ে 'সিতাবা' নামকবণ, যাব শব্দগত অর্থ হল 'নক্ষত্র'। 'সিতাবা' শব্দটিই সংক্ষেপকবণে হয়েছে 'সিতু'। মুজতবা তাঁব মার্জাবনিধন কাব্যেব ভনিতায় একদা লিখেছিলেন—

"বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্ধিলো বয়ান।
দীন সিতু মিঞা ভনে শুনে পুণ্যবান।।"

অতি শৈশবে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা একটি কবিতাংশে পাওয়া যায়, যার প্রকাশ সম্পর্কে কোনও সঠিক তথ্য মেলে না।

"ই কুল খাইলাম হি কুল খাইলাম
খাইলাম দশর গাইল
হাওয়ার গুড়িৎ বস্যি বান্ধিয়া
সিতু মিঞা ডাইল।"

সৈয়দ মুজতবা আলী শৈশবেই ছিলেন জেদি, সাহসী এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। পাঁচ বছর বয়সের একটি ঘটনা। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন মিঃ হেজলেট, আই. সি. এস. চাড়াভাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছেন পরিদর্শনের কাজে। অজ পাড়াগ্রামে রীতিমতন আলোড়ন। সাহেব নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখছিলেন। সবার মধ্যে সকলের চোখ এড়িয়ে পাঁচ বছরের বালক মুজতবা এগিয়ে গেলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সাহেবের হাতের ঘড়িতে হাত রাখলেন। সকলেই হতবাক।

সাহেব কিন্তু উল্লসিত। সকৌতুকে জানতে চাইলেন বালকটির পরিচয়। পুত্রের এই আকস্মিক আচরণে পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলীও রীতিমতন বিব্রত। সেদিনের বিব্রত পিতাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—
"Never mind. He will be a genius."

মুজতবা আলীর আদিপুরুষেরা ছিলেন ওরেফেন সৈয়দ। বংশধরের আদি ইতিবৃত্ত খুঁজলে 'মতওয়াককালী' শব্দটির সন্ধান মেলে। 'মতওয়াককালী' শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি আল্লার ওপর নিজের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন। সেই দিক দেখলে বলা যায় এই পরিবারটি ধর্মপ্রাণতার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মুজতবা আলীর বংশলতিকাটি সাজানো হলে তা হবে ঠিক এই রকম :

সৈয়দ মুজতবা আলীর ছাত্রজীবনের প্রথম পর্ব শুরু হয় সুনামগঞ্জ শহরের পাঠশালায়। প্রথম বছরে বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁকে একটি কঠিন শব্দের বানান জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, আমি বানান করতে পারব না কিন্তু শব্দটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতে পারব। তাঁর চটপটে জবাবে পরীক্ষক রীতিমতন চমকে উঠেছিলেন সেদিন। পিতার কর্মস্থলের বদলির সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের ছাত্রজীবনেরও বারবার বদল ঘটে। মৌলবিবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলেও কিছুকাল পড়াশুনো করতে হয়। সুদর্শন, বাকপটু, এমনকি দুষ্টুমির সর্দার বলে চিহ্নিত হলেও মেধাবী বলে সকলের নজরে পড়েন তিনি।

১৯১৯ সালের মার্চ মাস। গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ এলেন সিলেটে। মুরারিচাঁদ কলেজে ছাত্রদের সামনে বক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিষয় ছিল 'আকাঙ্ক্ষা'। ঠিক আগের দিন বক্তৃতা দিয়েছেন 'বাঙালীর সাধনা' বিষয়ে। সিলেটে দুদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন ত্রিপুরার মহারাজার বিশেষ আমন্ত্রণে আগরতলায়। মুজতবা গোপনে একটি চিঠি লিখে ফেললেন আগরতলার ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথকে। তাতে একটিমাত্র জিজ্ঞাসা :—আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করতে হবে? প্রায় সপ্তাহখানেক অতিবাহিত। আকাশ রঙের খামের মধ্যে আকাশ রঙের কাগজে উত্তর লিখলেন স্বয়ং রবি। "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হতে হবে এই কথার মোটামুটি অর্থ, স্বার্থ যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গল ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার কি করা উচিত, তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া যায় না। তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।" রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি দীর্ঘদিন কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে-ই যোগাযোগের প্রাথমিক সূচনা।

শান্তিনিকেতনে পড়তে এলেন মুজতবা। সেটা ১৯২১ সাল। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তিপত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনাদশেক ছাত্রছাত্রী। তাঁরা সকলেই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন। শ্রীহট্টবাসী হিসেবে মুজতবার গর্ব ছিল তিনিই প্রথম বাইরের ছাত্র। আনুমানিক হিসেবে, ১৯২১ সালের ২৫ জুলাই মুজতবা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলমান ছাত্র হিসেবেও মুজতবা আলীর নাম চিহ্নিত।

রবীন্দ্রনাসভবনের খুব কাছেই—'নূতন বাড়ি'তে কয়েকমাসের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম স্নাতক হিসেবেও মুজতবার নাম ধরা হয়। সে বছর বাচ্চুভাই শুক্ল নামের আর একজন ছাত্রও স্নাতক উপাধি লাভ করেন।

মুজতবা যখন শান্তিনিকেতনে, তখন রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থেই মধ্যমণি। একে একে বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেন সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস্, লেজ্নি, অ্যান্ড্রু পিয়ার্সন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ। শান্তিনিকেতনে তখন রীতিমতন চাঁদের হাট। একই সময়ে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশ্বের তাবড়তাবড় নক্ষত্রের সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম নজির। গ্রামীণ মুজতবার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে এই সকল উজ্জ্বল নাক্ষত্রিক সমাবেশে। মুজতবার মধ্যে ক্রমশ দেখা দেয় এক বিস্ময়কর আন্তর্জাতিক মন। বিশ্বভারতী তাঁকে নানাভাবে সমৃদ্ধি এনে দিল। বিশেষত, ভাষা অনুশীলনের ক্ষেত্রে। তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ফরমিকির কাছে সংস্কৃত ভাষা, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। ডঃ মার্ক কলিন্সের কাছে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মানি শেখেন। বেনোয়ার কাছেও ফরাসি ও জার্মানের পাঠ নেন। তুচ্চির কাছে ইতালি ভাষা। হিন্দি ও গুজরাটি ভাষাও শিখতে শুরু করেন। বিশ্বভারতীর প্রথম স্নাতক হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাচ্চুভাই শুক্ল এবং মুজতবার হাতে সনদপত্র তুলে দেন প্রথম সমাবর্তনে। সেটা ১৯২৭ সাল। বিশ্বভারতীর ডিগ্রি তখন জার্মানি ছাড়া অন্য কোথায় স্বীকৃতি লাভ করেনি। পরাধীন ভারতবর্ষে বিশ্বভারতীর ডিগ্রিকে তখন কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না। শিক্ষার্থীদের আগামী ভবিষ্যৎ ভেবে শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মুজতবা ম্যাট্রিকে বসলেন ১৯২৬-এ। বাংলায় 'লেটার' সমেত প্রথম বিভাগে পাস করেন। আলিগড়ে আই এ ভর্তি হলেন। আলিগড়ের পরিবেশ তাঁর কাছে খুব একটা সুখের হয়নি। সেই সময়ের একটি ঘটনা। আমির আমানুল্লাহ তখন আফগানিস্থানের শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিপুল উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তাঁর অনুরোধে শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যাপক বেনোয়া এবং বগদানফ কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যুক্ত হলেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় তাঁদেরই প্রিয়তম ছাত্র মুজতবা সেখানে যোগ দেন।

১৯২৯-এ 'হুম্‌বল্‌ট্' বৃত্তি পেয়ে মুজতবা চলে গেলেন জার্মানিতে। ১৯৩২-এ বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল লাভ করেন। মুজতবা রসিকতা করে

লিখেছেন---"এ-গর্দভও দর্শন বিভাগ থেকে ডক্টরেট পায় জর্মনির অন্যতম বিখ্যাত বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং বললে পেত্যয় যাবেন নিশ্চিত মত্তুল্য এবং 'মদাপেক্ষা' সহস্রগুণে খঞ্জতর ভুরি ভুরি গর্দভ গর্দভী জর্মনি থেকে— জর্মন কেন, সর্বদেশেই---নিত্যি নিত্যি ডক্টরেট পেয়েছে ও পাবে।"

১৯৩৪-৩৫-এ তিনি মিশরের আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনো করেন। পড়াশুনো করেই তিনি সারাজীবন কাটাতে চাইতেন। পড়া ছিল যেন তাঁর অন্যতম নেশা। "আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু একটা না পড়ে থাকতে পারিনে। জানেন মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য একটু আধটু হয়তো মাঝে-মাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি ওটা আমার নেশা, নেশা, নেশা।"

১৯২৭ এ আফগানিস্তানের শিক্ষাবিভাগে চাকরি নিয়ে কাবুলের কৃষি বিজ্ঞান কলেজে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক হন তিনি। মাসিক বেতন দুশো টাকা। মাসখানেকের মধ্যেই কাবুল সরকার তাঁর জার্মান ভাষায় গভীরতর পরিচয় পেয়ে যান। বেতন বাড়ানো হয় আরও একশো টাকা। একটা শ্রেণী তখন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের ষড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত। বিশেষত পাঞ্জাবি শিক্ষকগোষ্ঠী। তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিলেন -সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রি বিশ্বভারতীর এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনিভার্সিটি নয়। কাবুলে তাঁর চাকরির মেয়াদ মাত্র দু বছর। ১৯৩২-এ দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৩-এ ঢাকা গেলেন চাকরির সন্ধানে। কিন্তু সেখানে তাঁর চাকরি হয়নি। কাবুলের বিতর্ক-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য, সেই সময় ডেপুটেশনের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী পাঞ্জাবি শিক্ষকগোষ্ঠীকে বলেছিলেন—"আপনাদের সনদ সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গবর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্য দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।" বিষয়টিতে মুজতবারই জয় হয়েছিল নৈতিকভাবে।

বরোদার প্রগতিশীল ও গুণী মহারাজা তৃতীয় সয়াজীরাও ভারতের কিছু শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বরোদার রাজকার্যে নিযোগ করেছিলেন একটা সময়ে। মহারাজের

উদার আমন্ত্রণে মুজতবা বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বরোদায় ছিলেন অধ্যাপক হিসেবে। টানা এত দীর্ঘ সময়—তিনি কোথাও কর্মে যুক্ত থাকেননি। বরোদাব সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর সম্পর্ক ছিল প্রায় নয় বছর। এরপব কিছুদিন কাটে মুম্বাই শহরে। ১৯৪৪/৪৫ নাগাদ শূন্য বিক্ত হাতে ফিরে এলেন কলকাতায। সুরেশচন্দ্র মজুমদাবের বিশেষ আন্তরিক সহযোগিতায 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'সত্যপীব' ছদ্মনামে সপ্তাহে দুটো 'আফটাব এডিট' লেখাব দাযিত্ব পান। সুবেশচন্দ্রেব অনুরোধেই 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ 'বাযপিথোবা' ছদ্মনামে সম্পাদকীয় পববর্তী স্তম্ভ লেখাব কাজ শুরু করেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ জুলাই আনন্দবাজারে শুরু হয় সত্যপীরেব নির্দিষ্ট কলাম। এই সময 'দেশ'-এ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয। লেখালেখিই তাঁব একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বসুমতী, সত্যযুগ, কালান্তব, মাতৃভূমি প্রভৃতি নানা পত্রপত্রিকায লিখতে শুরু করেন। চাকরিতে মুজতবা কখনোই স্থায়ী হতে পারেননি। একবার একটি ফর্মের শূন্যস্থানে প্রশ্ন ছিল- 'তোমাব জীবিকা নির্বাহেব উপায কি?' উত্তরে মুজতবা জানিয়েছিলেন —'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি বিজ্ঞাইন দেওযা।'

১৯৪৯ এ মুজতবা বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন যার স্থাযিত্ব মাত্র সাত মাস। একটা শত্রুভাব পরিবেশে তাঁকে এখানে কাজ করতে হয। ছাত্রদেব জোবালো দাবি ছিল মুজতবার পক্ষে। কিন্তু মুসলিম লিগ সমর্থকেরা মুজতবাব নিয়োগকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পাবেনি। মুজতবাব বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়—তিনি কমিউনিস্ট, পাকিস্তান-বিরোধী, কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং অনিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি। বগুড়া কলেজে তিনি ইংরেজি, বাংলা এবং ইতিহাস পড়াতেন। বিশেষত অনার্সেব ক্লাসে তিনি ছিলেন বিশেষ ছাত্র-প্রিয় শিক্ষক। নানান অপ্রিয় চক্রান্তে বগুড়া কলেজ ছেড়ে দিতে হয তাঁকে। আবার কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযে খণ্ডকালীন প্রভাষক নিযুক্ত হলেন মুজতবা ইসলামেব ইতিহাস পডানোব জন্য। মাসিক দুশো টাকা বেতন নির্ধাবিত। কার্যকাল—মাত্র চারটি মাস। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ থেকে ৩১ মে ১৯৫০।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (I.C.C.R.)-এব জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন একজন যোগ্য মানুষের সন্ধান করছিলেন। হুমায়ুন কবির মৌলানা আজাদকে মুজতবার নাম সুপারিশ করেন। বলা যায়,

আজাদ খুশি হয়েই I.C.C.R-এর সচিব পদে নিযুক্ত করলেন মুজতবাকে। ৩১শে অক্টোবর ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করেন।

অল ইন্ডিয়া রেডিও-র স্টেশন ডিরেক্টর পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করলেন মুজতবা। ইচ্ছে ছিল কলকাতা বেতারে কাজ কবার। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ২৯ এপ্রিল স্টেশন ডিবেক্টর পদে নয়া দিল্লি বেতারকেন্দ্রে চাকরি হল তাঁব। দু'মাস বাবো দিন কাটিয়ে এলেন কলকাতায। আবার ১৯৫৩-র ৭ ডিসেম্বর কটক বেতাব কেন্দ্রে বদলি। কটকে যেতে তাঁব আপত্তি ছিল না। ওড়িশাব মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন নবকৃষ্ণ চৌধুবী। যিনি একজন প্রাক্তন শান্তিনিকেতনী এবং মুজতবাব অভিন্নহৃদয বান্ধব। বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুবী তখন প্রতিটি বিকেলেই মুজতবাব সঙ্গে সময কাটাতেন। এই পর্বটা মুজতবাব পক্ষে বেশ সুখের কাল, স্বস্তিব কাল। এখানেই তাঁব প্রথম উপন্যাস 'অবিশ্বাস্য' লেখা হয। মাত্র তেব মাস সতের দিন পরে কটক থেকে। আবাব বদলি পাটনা কেন্দ্রে। পাটনায বছব খানেক কাটানোব পব আবাব ট্রাংককল। দিল্লিব ডাক। বাববাব এক একটা হীন চক্রান্তে মুজতবাব মন ভেঙে যায। স্টেশন ডিবেক্টব থেকে এবাবে অল ইন্ডিয়া বেডিও-ব মুখপত্র 'Indian Listener'-এব সম্পাদকেব দাযিত্ব পেলেন। জীবনেব ভাব সহ্য কবা তাঁব পক্ষে প্রায অসম্ভব। তাঁব এক অনুজপ্রতিমকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন এই সমযেব দুঃখবেদনাব কথা। ১৯৫৬ সালেব ৪ এপ্রিল তিনি লিখছেন-- "আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায দিনযাপন কবছি। চতুর্দিক অন্ধকাব। আমাব জন্য প্রার্থনা কবো।" দিল্লি পবিত্যাগেব অনিবার্যতা জেনেই তিনি তাঁব প্রিয় গাড়িটি বিক্রি কবে দিয়েছিলেন,যা ব্যক্তি মুজতবাব পক্ষে পরম বেদনাবহ ঘটনা বটে। মুজতবা মনে প্রাণে চাইতেন কলকাতা বেতারকেন্দ্রেব সঙ্গে কিছু কাজ কবতে, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কবতে। তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায তখন বাজ্যসভার সদস্য। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে জানিয়েছিলেন মুজতবাকে যাতে কলকাতায় আনা হয। কিন্তু যে কোনও কাবণেই হোক তা সম্ভব হযনি। জনৈক 'নন্দী'কে পাঠানো হল কলকাতা বেতারকেন্দ্রে। তারাশঙ্কবকে লিখেছিলেন মুজতবা সেই সময়ের নিদারুণ দুঃখানুভূতির কথা। "আমি ওদের কাছ থেকে চাই মাত্র একটি জিনিস—নিষ্কৃতি! আমি বলি, 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি!' কাজেই নন্দী কলকাতা গেল না আর কোনো ভেঙ্কটরমন বা কুঞ্চিতপদম্ গেল তাতে আমার কোনো interest

নেই। তুমি দরদ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছিলে বলেই তোমাকে সব কিছু সাত-কাহন কবে শোনালুম। অবশ্য এ-কথা ঠিক কলকাতায় কোনো উপযুক্ত বাঙালী গেলে আমি খুশী হই—আমার গলা কাট্যা ফালাইলেও আমি আব আকাশবাণীতে কাজ কোরব না, না, না। AIR এ ঢোকাব সময় আমি ভেবেছিলুম কোনো স্টেশনে নিবিবিলিতে কাজ কববো, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও কববো। কটকে সেটা খানিকটে হয়েও ছিল। কিন্তু তখনো বুঝিনি, কি সব Thug- দেব পাল্লায় পড়েছি। এদের সঙ্গে ঘর কবে আমাব জাত গেছে, ধর্ম গেছে।" আকাশবাণীব কর্মজীবন তাঁব কাছে এক বিষময় অভিজ্ঞতা।

১৯৫৮ সালে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে যান, সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত প্যাবী মুখার্জিব ছেলে। সেখানে বি বি সি-তে ভাষণ দেন। ১৯৫৬ সালে অল ইণ্ডিয়া বেডিওব চাকবি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। জার্মান ভাষাব অধ্যাপনা এব পবে ইসলামী সংস্কৃতিব বিভাগীয় প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে মুজতবা পুবোপুবি অবসব নেন কর্মজগৎ থেকে বোলপুরে বসবাস শুরু কবেন। এব মধ্যে 'আনন্দবাজাব পত্রিকা' প্রদত্ত সুবেশচন্দ্র মজুমদাব পুবস্কাব লাভ কবেন। ১৯৪৯ সালে 'দেশে-বিদেশে'ব জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েব নবসিংহ দাস পুবস্কাবে সম্মানিত হন। মুজতবাব প্রিয় লেখকদেব মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব বাজশেখব বসু সুকুমাব বায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বনবিহাবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিদেশি লেখকদেব মধ্যে তাঁর প্রিয়তম তালিকাটি আবও আকর্ষণীয়। ওমব খৈয়াম, হাইনে, টলস্টয়, আনাতোল ফ্রাঁস এবং শেখভকে পছন্দ কবতেন বেশি মাত্রায়। সুকুমাব বায়কে তিনি মনে কবতেন বাংলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ হিউমাবিস্ট। আনাতোল ফ্রাঁসেব বচনাবীতিকে তিনি তাঁব আদর্শ মনে কবতেন। শেখভকে বিশ্বসাহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকাব হিসেবে গ্রহণ কবেছিলেন।

অনেকেব কাছে মুজতবা শুধু হাস্যবসেব লেখক। কিন্তু তাঁর 'শবনম', 'পঞ্চতন্ত্র', 'কত না অশ্রুজল' পড়লে বোঝা যাবে করুন বসেব সৃষ্টিতেও তিনি আশ্চর্য একটি প্রতিভা।

১৯৭২-৭৩ সালে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'পূর্বদেশ' দৈনিক পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' নামে দুটি কলাম লেখেন। তাঁর লেখা 'পূর্ব পাকিস্তানেব রাষ্ট্রভাষা' গ্রন্থাকারে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর একমাত্র ইংরাজী গ্রন্থ 'The Origin of the Khojahs and their Religious life

to-day' ১২.৮.১৯৩৬ তারিখে জার্মানী থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তিনি পিতা খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

মুজতবার প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে 'বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য' -কে ধরা যায়; যা ১৩৪১ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবিত অবস্থায় শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'মুসাফির'। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'তুলনাহীনা'।

মুজতবার স্ত্রী রাবেয়া আলী ছিলেন পাবলিক ইন্সট্রাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মুজতবা চলে যান ঢাকায় এবং স্ত্রী, পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর বাসা ছিল পার্কসার্কাসে ৫ নম্বর পার্ল রোডে প্রিয় বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে। ঢাকা-কলকাতা আসা যাওয়া শুরু হয়। ক্রমশ শরীরের ভেতর নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। একটা সময় ডান হাতটি অবশ হতে থাকে। ডান হাতের উন্নতি না হলে লিখবেন কি করে? দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশ। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে গিয়ে ইলেকট্রিক রে নিতে থাকেন। ১৯৭৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে হারিয়ে ফেললেন চেতনা। অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার পি জি হাসপাতালে। সারাজীবন দাপটে মজলিসী মানুষ মুজতবার চেতনা আর ফিরে আসেনি। ১১ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে মুজতবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ তারিখেই বায়তুল মোকাররমে জানাজা পড়া হয় এবং রাত আটটা নাগাদ আজিমপুর কবরস্থানে সমাধি তৈরি করা হয় বাংলার প্রখ্যাততম এই সাহিত্যস্রষ্টার। মুজতবার কবরের পাশেই শুয়ে রয়েছেন ভাষা আন্দোলনের বিখ্যাত শহিদ বরকত এবং সালাম। সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন যেন এক ব্যথিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস। বিস্ময়কর এক প্রতিভা মুজতবা সেই অর্থে যথোপযুক্ত সমাদর না পেয়ে নিজেই যেন এক মূর্তিমান দীর্ঘশ্বাস।